"একজন আবু সুলাইমান"
সৃষ্ট সংশয় ও জবাব
مؤسسة الصوارم
As Sawarim Media
ASSAWARIM

“একজন আবু সুলাইমান”

সৃষ্ট সংশয় ও জবাব

পরিবেশনায়ঃ আস-সওয়ারিম মিডিয়া

“একজন আবু সুলাইমান” সৃষ্ট সংশয় ও জবাব

পরিবেশনায়ঃ আস-সওয়ারিম মিডিয়া

প্রথম প্রকাশঃ

জামাদিউল উলা ১৪৪৫ হিজরী

নভেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي رزقنا الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة بعد غيابها منذ زمن قرون، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي بشرنا بإعادة الخلافة على منهاج النبوة، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد؛

হিজরী রবিউল আউয়াল মাস, সোমবার। নবুওয়াতের সূর্য পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। চিরদিনের জন্য দুনিয়া ত্যাগ করেছেন আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ ﷺ - **فداك أبي وأمي يا رسول الله** - চতুর্দিক শোকের চাদরে ছেয়ে গেছে। শোকে মুহ্যমান সবাই। মদীনার অলিতে গলিতে কান্নার রোল পড়ে গেছে। শোকের তীব্রতায় ওমার رضي الله عنه বলেছিলেন, যে বলবে আল্লাহর রাসুল মারা গেছে আমি তার গর্দান ফেলে দিব। এমতাবস্থায় আবু বকর رضي الله عنه ওমার رضي الله عنه কে শান্ত করতে সক্ষম হন। সাকীফায়ে বনু সায়িদাহ'তে আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্য থেকে কয়েকজন নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে আবু বকর رضي الله عنه খলীফাতু রাসুলিল্লাহ হিসেবে মনোনীত হন। এদিকে এখনো আল্লাহর রাসুল ﷺ কে দাফন করা হয়নি। প্রিয় ভাই! আপনি সাহাবীগণের কর্মপন্থার দিকে লক্ষ্য করুন! তারা রাসুল ﷺ কে দাফনের পূর্বে একজন খলীফাহ নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর ইন্তেকাল পর এই বেদনা বিধুর পরিস্থিতিতে যে কাজটিকে তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন তা হল খলীফাহ নির্ধারণ করা। (খলীফাহ নির্ধারণের ব্যাপারে শারয়ী দিক-নির্দেশনার আলোচনা সামনে আসবে ইনশা'আল্লাহ।) সাহাবীগণ رضي الله عنهم আল্লাহ ও তার রাসুলের কথার পুঙ্খানুপুঙ্খানু বাস্তবায়ন করেছেন। আর একারণেই তারা ছিলেন সর্বোত্তম প্রজন্ম।

রাসুলুল্লাহর মৃত্যুর পর আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি চরম সংকটময় মূহুর্তে উপনীত হয়। হারবুর রিদ্দাহ'এ অনেক রক্ত ঝরে তথাপি আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه বিদ্রোহী, দ্বীন ত্যাগী এবং মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারদের দমন করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং তিনি মুসলিম সৈন্য সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও একই সাথে তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা

করেন। নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাসী পরিপূর্ণ ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান স্বল্পসংখ্যক মুসলিমের সামনে পারস্যের পতন হয়। আর রোম তার বিস্তৃত ভূমি হারায়। পৃথিবীর একটি পরাশক্তি পারস্য মুছে যায় ইতিহাসের পাতা থেকে। একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। খুলাফায়ে রাশিদাহ’র যুগেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামের বিজয় কেতন উড়তে থাকে। এরপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিমরাই পৃথিবী শাসন করেছিল। কাশগর থেকে মরক্কো আমরা শাসন করেছি। স্পেন আমাদের ছিল। এই হিন্দুস্থান আমাদের ছিল। কিন্তু দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার সমানুপাতে লাঞ্ছনা আমাদের উপর জেঁকে বসেছে।

ইসলাম উঁচুতে অবস্থান করে অন্য কিছু এর উপর অবস্থান করে না। ইসলামের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। মান-মর্যাদা আর শাওকার ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাস সোনালী ইতিহাস। সোনালী ইতিহাসের কোনো কোনো পাতায় রচিত হয়েছে কালো অধ্যায়। কালো অধ্যায়গুলোর অন্যতম একটি হল খিলাফাহ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটা। গত কয়েক শতাব্দী মুসলিম উম্মাহ খলীফাহ এবং খিলাফাহ বিহীন অতিবাহিত করেছে। ফলশ্রুতিতে এই উম্মাহ শতধা দলে বিভক্ত হয়েছে। মুসলিমদের ভূমিগুলো কুফফাররা দখল করে নিয়েছে। যে জাতি পৃথিবীর রাজত্ব করেছে তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। ঈমান-আক্বীদাহ, তাহযীব-তামাদ্দুন ও ইতিহাস-ঐতিহ্য সবকিছুতেই বিকৃতি সাধন করেছে কুফফার গোষ্ঠী। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে কাফিররা মুসলিমদের ভূমিগুলো নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নিয়েছে শোষণের জন্য। মনগড়া সীমানা এঁকে মুসলিমদেরকে সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছে। এভাবেই ওরা একটি শক্তিশালী জাতিকে বিভক্ত করেছে আমরা একজন ইমাম বা খলীফাহ’র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ না থাকার সুযোগ নিয়ে। কিছুকাল আগ পর্যন্তও মুসলিমরা ছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত। তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার মত ছিল না কেউ। এহেন পরিস্থিতিতে উম্মাহ দুর্দশার এই রাত্রি শেষে সুবহে সাদিকের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলো। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, অনেক কুরবানী, অনেক রক্ত, সম্ভ্রমহানি ও জীবন বিসর্জনের পর মহান রব্বুল আলামীন তার অনুগ্রহে উম্মাতে মুসলিমাকে আবার শক্তি-সামর্থ্য এবং যমীনে

কর্তৃত্ব দান করেছেন। দান করেছেন সুস্পষ্ট বিজয়। কুফফারদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার তাওফীক দিয়েছেন। আরো তাওফীক দিয়েছেন পুনরায় নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ ফিরিয়ে আনার–আলহামদুলিল্লাহ্।

দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর মুজাহিদগণ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। যে খিলাফাহ’র স্বপ্ন আমরা প্রত্যেকেই দেখতাম। আর এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিমদের দেশগুলোতে কুফফারদের আগ্রাসন চালানোর পর। এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চেচনিয়া (শিশান), বসনিয়া, আফ্রিকা, আফগানিস্তান, ইরাক, শাম, ইয়েমেন, হিন্দ, বার্মা, পূর্ব তুর্কিস্তান, মালী এবং আরো বহু স্থানে ভয়াবহ হত্যাজজ্ঞ, ধর্ষণ, জ্বালানো-পোড়ানো, বোমাবর্ষণ এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর। এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গুয়ান্তানামো, আবু গারীব, বুকা, বাগরাম, বাদুশ কারাগার এবং প্রত্যেক স্থানের তাগুতের কারাগারগুলোতে - যেগুলোর খবরও আমরা জানি না - অত্যাচার, নির্যাতন ও ধর্ষণ করার পর। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে তোমরা এই খিলাফাহ’কে এবং এর সত্যবাদী মুজাহিদগণকে সাহায্য করা বর্জন করেছো। বরং তোমরা এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো জবান দ্বারা এবং অপবাদ রটানোর মাধ্যমে!

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর কুফফাররা জোটবদ্ধ হয়েছে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য, একে নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য। বাদ যায়নি মুসলিমদের দেশগুলোর নামধারী তাগুত শাসকরাও। এই দাওলাতুল খিলাফাহ’র বিরুদ্ধে ৮০ টিরও অধিক পতাকা সমবেত হয়েছে। মুজাহিদগণের পরীক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। আর এই পরীক্ষা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যবাদী বান্দাদের জন্য ধারাবাহিক রীতির অন্তর্ভুক্ত। যুগে যুগে নাবী-রাসুলগণও এভাবেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন। একসময়ে মুজাহিদগণের দখলে সুবিশাল ভূমি - যা আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা পরিচালিত হত - তা কুফফার মুরতাদরা ছিনিয়ে নেয়। মুজাহিদগণ শহরগুলো থেকে মরুভূমিতে ফিরে যান। আল্লাহ ﷻ বলেন,

اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ

يَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ۝

"যদি তোমাদেরকে কোন আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর আমরা মানুষের মধ্যে পালাক্রমে এই দিনগুলো আবর্তন করি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না। আর যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরিশুদ্ধ (তামহীছ) করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।"[1] তামহীছ অবশ্যম্ভাবী। এটা আল্লাহর সুন্নাহ। আল্লাহর অনুগ্রহে যখন তিনি তার বান্দাদেরকে যমীনে তামকীন দান করেছেন তখন লোকজন দলে দলে মুজাহিদগণের কাতারে শামিল হয়েছেন। অবশ্যই আল্লাহ যাচাই বাছাই করবেন যেন জেনে নিতে পারেন যে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ সুবহানাহুর তামহীছের মোকাবিলায় অনেকের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়, অনেকেই ঝরে যায়– আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই। দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য যে, এমনই এক প্রেক্ষাপটে শত ব্যস্ততার মাঝে ভাঙা হৃদয় নিয়ে কলম ধরতে হয়েছে। সন্দেহ শুবুহাত দূরীকরণে আমাকে লিখতেই হবে। তাই আল্লাহর সাহায্য চেয়ে শুরু করছি...

কিছু লোক খিলাফাহ'র আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে পড়ে সংশয়-সন্দেহ ছড়াতে থাকে, যাদের একজন হল আবু সুলাইমান। বেঙ্গল অঞ্চলে যারা খিলাফাহ'কে শুরুর দিকে বাইআত দিয়েছে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খিলাফাহ'র হয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক কুরবানী পেশ করেছে। শত্রুর হাতে বন্দি হয়েছে এবং আজ অব্দি মৃত্যুদণ্ডের সাজা নিয়ে বন্দি অবস্থায় জীবন-যাপন করছে–আল্লাহ আবু সুলাইমানসহ আমাদের সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের শত্রুর বন্দিশালা থেকে মুক্ত করুন। আমীন!

দিন কয়েক আগে আমাদের হাতে আবু সুলাইমানের কয়েকটি চিঠি আসে। সে কিছু অভিযোগ তুলে খিলাফাহ'র আনুগত্য থেকে বেড়িয়ে পড়ে। আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করি, তিনি যেন আবু সুলাইমানের মনে বিদ্যমান সংশয়-সন্দেহগুলো

[1] আলে-ইমরানঃ ১৪০-১৪১

দূর করে দিয়ে তাকে সহ অন্যান্য দলে বিভক্ত মুসলিমদেরকে খলীফাহ'র নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। আমীন!

যেহেতু আবু সুলাইমান এই অঞ্চলে খিলাফাহ'কে প্রথম বাইআত দেওয়া দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই তার এই সকল সংশয় উত্থাপনের কারণে সরলমনা কোন কোন মুসলিম ভাই ধোঁকায় পড়তে পারেন। ফলে আমাদের উপর আবশ্যক হয়েছে আবু সুলাইমানের চিঠির জবাব দেয়াসহ কতিপয় সংশয় খণ্ডন করা এবং কিছু ধোঁয়াশাচ্ছন্ন বিষয় ক্লিয়ার করা। আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করি তিনি যেন আমাদের পূর্ণ তাওফীক্ব এবং পরিপূর্ণ ইনসাফ দান করেন।

وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ فَٱتَّقُونِ ۝ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ۝

"আর আপনাদের এ উম্মাত তো একই উম্মাত এবং আমিই আপনাদের রব; অতএব আমাকেই ভয় করুন। অতঃপর লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের এ বিষয় তথা দ্বীনকে বহুধা বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত।"[2]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সা'দী رحمه الله বলেন, "হে রাসুলগণ! আপনাদের জামাআত হচ্ছে এক জামাআত–যা এক দ্বীনের উপর স্বীকৃত এবং আপনাদের রব এক। 'অতএব আমাকেই ভয় করুন' অর্থাৎ আমার আদেশ পালন করার এবং আমার নিষেধ বর্জন করার মাধ্যমে। আল্লাহ মু'মিনদেরকে তাই আদেশ করেছেন যে আদেশ তিনি রাসুলগণকে করেছেন। কারণ তারাই অনুসরণীয় এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের পথেই চলে। কিন্তু বিভক্ত জালিমরা কেবল অবাধ্যই হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, 'অতঃপর লোকেরা তাদের নিজেদের মধ্যে তাদের এ বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করেছে।' অর্থাৎ নবীগণের অনুসারীরা বিভক্ত হয়ে যায়। 'তাদের এ বিষয়কে' অর্থাৎ তাদের দ্বীনকে। 'প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা

[2] সুরা মু'মিনুনঃ ৫২-৫৩

আছে’ অর্থাৎ তাদের নিকট যে ইলম এবং দ্বীনের অংশ রয়েছে ‘তা নিয়ে আনন্দিত’ অর্থাৎ তারা মনে করে তারাই হক্ব। আর অন্যরা বাতিলের উপর রয়েছে। তথাপি তাদের মাধ্য থেকে হক্ব তো হচ্ছে সে, যে রাসুলগণের তরীকার উপর চলে, পবিত্র খাবার আহার করে এবং সৎ আমলের উপর থাকে। আর তারা ব্যতীত বাদ বাকিরা হচ্ছে বাতিল।”[3]

নাবীগণের পরে মানুষেরা দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে। রাসুলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার নিকট নিজেকে পরিপূর্ণরূপে সমর্পণ করতে না পারার কারণেই মূলত বিভক্তি সৃষ্টি হয়। এই উম্মাহ’র মাঝেও মতানৈক্যের অন্যতম কারণ হল- আল্লাহ এবং রাসুলের কথার উপর কোন ব্যক্তি, কোন শাইখ বা বড় হুজুরের কথাকে প্রাধান্য দেওয়া। আর বিভিন্ন দলে বিভক্তরা নিজেদের ভ্রষ্টতামূলক যে বিষয়ের উপর রয়েছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট। মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র তারাই হক্বের উপর রয়েছে যারা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশনা মেনে চলে। আর যারা আল্লাহ এবং রাসুলের নির্দেশনার উপর অন্য কোন ব্যক্তি বা শাইখকে অথবা যে কোনো কিছুকে প্রাধান্য দিবে তারা বাতিলপন্থি। আর তারাই পথভ্রষ্ট।

এরপর আবু সুলাইমান বলেছে, “এই উম্মাহ অনেক দলে বিভক্ত হবে, হাদিসের ভাষ্যানুযায়ী এই অনেক দলের মধ্যে কেবলমাত্র একটি দল হক্বের উপর থাকবে, প্রতিটি দল-ই নিজেদেরকে ফিরকাতুন নাজিয়াহ’র অন্তর্ভুক্ত মনে করে বিশেষত মুজাহিদ দলগুলো নিজেদেরকে তইফাতুল মানসুরা মনে করে। কিন্তু এখন মুজাহিদ দলগুলোর উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে...”

প্রতিটি দল-ই নিজেদেরকে হক্ব মনে করে বিশেষত জিহাদপন্থী দলগুলোও। কিন্তু আল্লাহর রাসুল ﷺ হক্বপন্থী দলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে গেছেন। রাসুল ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! সে দল কোনটি? তিনি

[3] তাফসীরে সা’দী

বললেন, আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।"[4] সুতরাং এখানে মূল হচ্ছে রাসুল ﷺ এবং তার সাহাবীগণের পথের উপর চলা। তাই আমরা যদি প্রত্যেকেই নিজেদেরকে নিজেদের মনগড়া মানদণ্ড দিয়ে যাচাই না করে কুরআন ও সুন্নাহ'র আলোকে যাচাই করি, আমাদের কর্মগুলোকে সাহাবীগণের কর্মের উপর ক্বিয়াস করি তাহলে-ই আমরা নিজেদের অবস্থান এবং কর্মপদ্ধতি শাশ্বত ওহীর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিনা তা জানতে পারব। আমরা যদি আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরি তাহলে অবশ্যই আমাদের মধ্যে বিভক্তি আসবে না। রাসুল ﷺ বলেছেন, "নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে যে আমার পরে জীবিত থাকবে অচিরেই সে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। (সে সময়) তোমাদের উপর আবশ্যক হল আমার সুন্নাহ ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদাহ'র সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। দ্বীনের মাঝে নতুনত্ব (বিদআত) থেকে তোমরা সাবধান থাকবে! কেননা প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।"[5] সুতরাং প্রথমত আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে রাসুল ﷺ -এর সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা এরপর খুলাফায়ে রাশিদাহ'র সুন্নাহ'কে আঁকড়ে ধরা। আর তারা হলেন, মুরতাদদের সাথে অনমনীয় আচরণকারী আবু বকর সিদ্দীক, অর্ধ জাহান শাসনকারী ওমার, নিজের জীবন উৎসর্গকারী উসমান এবং চরমপন্থীদের দমনকারী আলী বিন আবী তালিব।

এই শতাব্দীর জিহাদী দলগুলো আদর্শিকভাবে ঐক্যবদ্ধই ছিল–যদিও একেক দলের আমীর ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন জন। তবে হ্যাঁ, মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তাওহীদের ভিত্তিতে এবং ঈমানের ভিত্তিতে। এমন ঐক্যবদ্ধতা ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না যার ভিত্তি হবে না তাওহীদ এবং ঈমান। আমরা দেখেছি, ৮০ এর দশকে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হটানোর জন্য আফগানিস্তানে থাকা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমরা সেকুলার,

4 তিরমিযীঃ ২৬৪১

5 আত-তারগীব ওয়াত-তারহীবঃ ৩৭

জাতীয়তাবাদী, কমিউনিস্টপন্থী দলগুলোর সাথে ঐক্য গড়ে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু দিনশেষে ফল ভোগ করেছিল মুহাম্মাদ নাজিবুল্লাহ'র মত কমিউনিস্ট মুরতাদ শাসকরা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিকই বিতাড়িত হল কিন্তু এর ফল মুসলিমরা ভোগ করতে পারেনি। তাই আমাদের ঐক্য কেবল ইসলাম, ঈমান, তাওহীদ ও আক্বীদাহ' র ভিত্তিতেই হতে হবে। নচেৎ তাওহীদবিহীন ঐক্য ঐক্য স্লোগানে আমরা যতই ঐক্যবদ্ধ হই তা ইসলাম ও মুসলিমদের কোন উপকারে আসবে না। বরং লাভের চেয়ে ক্ষতিই ডেকে আনবে। আফগান-সোভিয়েত যুদ্ধ পরবর্তী শিক্ষা নিয়ে মুজাহিদ দলগুলো এব্যাপারে সর্বদা সতর্ক ছিল। তাই তো আমরা দেখি, আমেরিকা ইরাকে হামলা চালানোর পর দখলদার বাহিনীর প্রতিরোধে বহু সশস্ত্র দল মাঠে নেমেছিলো। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আবু মুসআব, আবু ওমার ও আবু বকররা এই ধোঁকাপূর্ণ ঐক্য থেকে মুক্ত ছিলেন। যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে রাষ্ট্র দান করেছিলেন–যা বর্তমানে ইসলামী খিলাফাহ'এ পরিণত হয়েছে। সুতরাং মুজাহিদগণ তখন আদর্শিকভাবে ইসলাম ও ঈমানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। সবাই এক ও অভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং শাইখুল মুজাদ্দিদ উসামা বিন লাদিন رحمه الله -এর প্রত্যাশাকৃত পথেই এগোচ্ছিলো সবাই। তা হল আল্লাহর যমীনকে শিরক কুফরের শৃঙ্খল থেকে স্বাধীন করা, কোন নির্দিষ্ট তাগুত অপসারণ করা বা কেবলমাত্র দখলদার শত্রুকে বিতাড়িত করা নয় বরং পাশাপাশি ইসলামী হুকুমাত তথা খিলাফাহ'র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু কিছু লোক এই কণ্টকাকীর্ণ পথের সংকীর্ণতা দেখে মাঝ পথে এসে বেঁকে বসল। অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন, "জান্নাতকে অপছন্দনীয় বস্তু দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে।" আর যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবিচল ব্যক্তিরা পথের সব কাটা মাড়িয়ে সামনে এগোতে লাগল তখনই বেঁকে বসা ব্যক্তিরা মাসলাহার নামে বিভক্ত হতে থাকে। আর এই বিভক্তই ডেকে আনে তাদের অধঃপতন।

চিঠির বক্তব্যঃ "তবে আমরা বিশেষ করে মুজাহিদিনদের দল বা জামাআতকে তায়িফাতুল মানসুরাহ বলে গণ্য করি। এই মানহাজের দিকেই আহ্বান করি। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দাবি যেহেতু এক ও যেহেতু আমরা তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারার দিকে আহ্বান করি। তাই আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা

(দাওয়াত ও জিহাদ) একই হওয়া উচিৎ ছিল। কমপক্ষে আমাদের প্রচেষ্টা সমূহ এক ও অভিন্ন দিকে পরিচালিত হওয়া দরকার ছিল কিন্তু আমরা আমাদের দাবী ও কর্মসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারলাম না।"

প্রিয় ভাই আমার! আমি আপনার সামনে প্রথমেই যে বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি তা হল, মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ'র পরিচয় কী? আমরা আমাদের রবের কালামে পাক থেকে জানতে পারি যে, যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে আর কাফিররা লড়াই করে তাগুতের পথে। আমরা জানি যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট ঈমান হল, কথা, কাজ ও অন্তরের সত্যায়নের সমষ্টি। এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আমি বলব, যদি কেউ সালাত আদায় করে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে এর সাথে সাথে ঈমান ভঙ্গকারী কোন বিষয় সম্পাদন করে তবে তার উল্লেখিত আমলসমূহ কোন উপকারে আসবে না। কারণ সে ঈমান ভঙ্গকারী বিষয় সম্পাদন করেছে। যদিও সে জিহাদ করে তথাপি তার আমলনামায় শিরকের উপস্থিতির কারণে তাকে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ হিসেবে গণ্য করা হবে না। তাহলে চলুন এবার জেনে নেই রাসুলে কারীম ﷺ এব্যাপারে কী বলেছিলেন? যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো, "এক ব্যক্তি গনীমতের জন্য লড়াই করে, এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য লড়াই করে এবং এক ব্যক্তি বীরত্ব দেখানোর জন্য লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর পথে লড়াই করল? তিনি ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কলিমা বুলন্দ হওয়ার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহর পথে লড়াই করল।"

প্রিয় ভাই! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, আচ্ছা বলুন তো রাসুল ﷺ -এর বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী দেশাত্মবোধক জাতীয়তাবাদের চেতনায় লড়াইকারী বর্তমান তালেবান কি আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী? উত্তর আপনার জিম্মাহ'তে ছেড়ে দিলাম। ঐ সকল সাহওয়াত–যারা নিজেদের প্রবৃত্তি থেকে তৈরিকৃত বিধান দ্বারা অধিকৃত ভূমি শাসন করে তারা কি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ? যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তারা কি মুজাহিদ? যারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها কে গালি দেয়, আবু বকর, ওমারসহ ব্যাপকভাবে সাহাবীগণকে

তাকফীর করে–তাদেরকে যারা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, রাফিদীদের ধৃষ্টতাপূর্ণ শিরকী ইবাদাতে নিরাপত্তা দেয় তারা কি মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ?

অতঃপর আমি বলি, নিশ্চয়ই মুজাহিদগণই ত্বইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভুক্ত। কাবার রবের শপথ! মুজাহিদগণই ফিরক্বাতুন নাজিয়াহ’র অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যারা ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়সমূহে লিপ্ত তারা মুজাহিদ নয়। যারা রাষ্ট্রীয়ভাবে ICC ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলার অনুমোদন দেয়, অর্থ যোগান দেয় নিশ্চিতভাবেই তারা রাসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী মুজাহিদ নয়। আবু সুলাইমান তার বক্তব্য অনুযায়ী মুজাহিদীনদের দল দ্বারা কাদেরকে বুঝিয়েছে তা আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি। তারপরেও আমরা কুরআন ও সুন্নাহ’র আলোকে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ’র পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি–যাতে কারো নিকট অস্পষ্ট না থাকে। যদি আমরা মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ’র মাঝে এবং বাতিলপন্থীদের মাঝে পার্থক্য করতে না পারি তাহলে পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করা সহজ হবে না।

বর্তমানে বাস্তবতার আলোকে আমরা দেখি যে, জিহাদের দাবিদার ও সত্যিকারের মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ’র মাঝে আক্বীদাহ ও মানহাজগত একটা বড় পার্থক্য বিদ্যমান। যদিও তানযীম আল-কায়দার অনুসারীরা কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও তা (আক্বীদাহ ও মানহাজের পার্থক্যের ব্যাপারটা) স্বীকার করত না। কিন্তু আজ তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেছে–আলহামদুলিল্লাহ।

চিঠির বক্তব্যঃ “আমাদের দাবি যেহেতু এক ও যেহেতু আমরা তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ, আল ওয়ালা ওয়াল বারার দিকে আহ্বান করি।”

আমরাও বলি যে, দাবি এক, আমরাও তাওহীদে হাকিমিয়্যাহ’র দিকে, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’র দিকে আহ্বান করি। কিন্তু তাদের দাবি ও বাস্তবতার কোন মিল খুঁজে পাইনি। উদাহরণ স্বরূপ দেখাতে পারি লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা যা আনসারুশ শারীয়াহ নামে পরিচিত। যাদের বড় অংশটিই খিলাফাহ’র পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে কিন্তু যারা খিলাফাহ’র ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়নি তারা তাগুত খলীফা হাফতার ও অন্যান্য মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সাথে জোট বেঁধে দাওলাতুল

ইসলামের সাথে যুদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদী উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ এই সরকারের সাথে মিলে ক্ষমতায় গিয়েছে এবং শাসন করেছে। এটা কোন ধরনের ওয়ালা করা? কেউ কি আমাকে কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকে এমন ওয়ালার দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন? হায় আফসোস যদি তারা তাদের দাবি অনুযায়ী আমল করতো! এক কথায় বলতে পারি, প্রকাশ্যে দাবি এক হলেও আসলে বাস্তবতায় দেখা যায় আক্বীদাহ এবং মানহাজে রয়েছে বিস্তর ফারাক। যেহেতু জিহাদের দাবিদারদের মাঝে আক্বীদাহ এবং মানহাজের অনেক পার্থক্য রয়েছে তাই আমাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা এক হওয়া সম্ভবই না। কখনোই সম্ভব না। যারা জনগণের সন্তুষ্টির পেছনে দৌড়ায় তাদের প্রচেষ্টা ও আমরা যারা স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করি যদিও সৃষ্টি ক্রোধান্বিত হয় –আমাদের প্রচেষ্টা কি এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আক্বীদাহ-মানহাজের অনুসারী দলগুলোর এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়। আক্বীদাহ ভিন্ন হওয়ার কারণে লক্ষ্যও ভিন্ন হয়। আর দ্বীন ত্যাগী তালেবান - কারো কারো ধারণা অনুযায়ী তারা পুরো পৃথিবীব্যাপী জিহাদের নেতৃত্বদানকারী - কখনোই তাদের মানহাজ স্পষ্ট করেনি। বর্তমান তালেবানের কর্মকাণ্ড থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাদের আক্বীদাহ'তে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র কোন স্থান নেই। আবার তারা শিরকী সূফী আক্বীদায় বিশ্বাসী। অনৈসলামিক ইমারাতের আমীর হাইবাতুল্লাহ আখন্দজাদা ত্বরীকায়ে নকশাবন্দীয়ার একজন খলীফাহ। তালেবান প্রধান যে নকশাবন্দী ত্বরীকার খলীফাহ এব্যাপারটি জানিয়েছে কাবুলে উলামা পরিষদের সভাপতি খলীফা দ্বীন মুহাম্মাদ। এই খলীফাহ দ্বীন মুহাম্মাদই সিরাজ উদ্দিন হক্কানীর পীর ও মুরশিদ। দ্বীন ত্যাগী তালেবানের অনেক আলেমই হুলুলিয়্যাহ আক্বীদায় বিশ্বাসী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–তালেবান যাকে শামসুল মাশাইখ উপাধি দিয়েছে সে হল কাবুল উলামা পরিষদের সভাপতি খলীফা দ্বীন মুহাম্মাদ এবং আব্দুর রহীম প্রমুখ। আমরা তালেবানকে দেখি দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ওয়ালা করে– যেমন একজন মুসলিম যদি আফগানিস্তানে আসে তাহলে সে পরিপূর্ণরূপে একজন আফগান নাগরিকের অধিকার পাবে না। সে তালেবানের নিকট ভিনদেশী। আর এক রাফিদী মুশরিক যে আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তথায় বসবাস করে সে আফগানিস্তানের নাগরিক হিসেবে

গণ্য হবে। তার জন্য রাষ্ট্রের সকল অধিকার প্রযোজ্য হবে। প্রিয় ভাই! আমরা এই স্থানে আলোচনা দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না। কারণ আমরা আপনাদের কাছে তালেবানের যে কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করেছি এর উপর ভিত্তি করেই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, জিহাদের দাবিদার (যদিও তালেবানের দাবি অনুযায়ী তাদের জিহাদ শেষ) তালেবান এবং আমাদের (দাওলাহ) দাবী এক নয়। পরিবর্তিত এই তালেবান কখনোই আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দিকে আহ্বান করেনি। তাহলে তারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র দিকে আহ্বানকারী নয়। তারা শুধু আফগান থেকে বহিঃশত্রু হটানোর জন্য লড়াই করত। বিপরীতে আমরা যুদ্ধ করি পুরো পৃথিবীতে আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। তাহলে কি তাদের দাবি আর আমাদের দাবি এক? কস্মিনকালেও দাবি এক নয়। দাওলাতুল ইসলাম কি শিরকী সূফি মতবাদে বিশ্বাসী? দাওলাহ কি হুলুলিয়্যাহ আক্বীদায় বিশ্বাসী? তাহলে আমরা কিভাবে উল্লেখিত শিরকী, কুফরি ও ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী দলের সাথে এক হব? এক হওয়া তো সম্ভবই না বরং দ্বীন পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য না হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে লড়াই চালিয় যাওয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লহ ﷻ বলেন,

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ﴾

“আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।”[6]

সুতরাং এই দুই বিষয়কে একীভূত করা হক্ব এবং বাতিলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নামান্তর–আর তা কখনোই সম্ভব নয়। এখানে আবু সুলাইমান তার চিঠির বক্তব্যের মাধ্যমে জিহাদের দাবিদার সবাইকে একই আক্বীদাহ-মানহাজের অনুসারী হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে এবং এর দ্বারা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে।

চিঠির বক্তবঃ “কিন্তু আমরা আমাদের দাবি ও কর্মসমূহের মধ্যে ভারসাম্য

[6] সুরা আনফালঃ ৩৯

রক্ষা করতে পারলাম না।"

প্রকৃতপক্ষে তানযীম আল-কায়দা তাদের দাবি ও কর্মসমূহের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি। শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله -এর শাহাদাতের পর কিছু দিন যেতে না যেতেই তানযীম আল-কায়দা শাইখের রেখে যাওয়া মানহাজ থেকে বিচ্যুত হতে থাকে এবং দাবি ও কাজের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। বিপরীতে দাওলাতুল ইসলাম তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত একই মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। দাওলাতুল ইসলামের উমারাগণ কথায় এবং কাজে সত্যবাদী। দাওলাহ তার কথা এবং কাজে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। দাওলাহ'র উমারাগণ আল-কায়দার উমারা তালেবান নেতাদের মত জাতিসংঘের সদস্যপদ কামনা করে না। অথচ তালেবানের অনুগামী ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী তার বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, জাতিসংঘের সদস্যপদ চাওয়াও একটি কুফরি কাজ। প্রিয় ভাই! আপনি দাওলাহ'র মাঝে এমন ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করবেন না–ওয়ালিল্লাহিল ফাদলু ওয়াল মিন্নাহ। বিষয়টি একটু খেয়াল করেন, আমীর জাতিসংঘের সদস্যপদ চাচ্ছে আর অধীনস্থ ব্যক্তি জাতিসংঘের সদস্যপদ চাওয়া কুফরি (কুফরে আকবার) মনে করছে। একই বিষয় আমীরের কাছে বৈধ আর অধীনস্থ ব্যক্তির কাছে কুফর! আপনি কি চিন্তা করেছেন, কতটা বিপরীতমুখী, কতটা ভারসাম্যহীন আক্বীদাহ! এটা তানযীম আল-কায়দাতেই পাওয়া যায় নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ রাষ্ট্রের আক্বীদাহ-মানহাজে পাওয়া যায় না। তানযীম আল-কায়দার কর্মপদ্ধতিতে এই ধরনের অসংখ্য ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্য থেকে আরো একটি উল্লেখ করছি। গেল বছর কাতারে অনুষ্ঠিত ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সফলভাবে আয়োজন করতে পারার জন্য কাতারকে অভিনন্দন জানিয়েছে তালেবান। অপরদিকে আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ আয়োজনের জন্য নিন্দা জানিয়েছে। এখানেও চরম বৈপরীত্য লক্ষ্য করা গেল। তবে ব্যাপারটি এখানেই শেষ নয়। তানযীম আল-কায়দা তাদের উমারা তালেবানের মাঝে এ ধরনের বৈপরীত্য ও কুফরি কর্মকাণ্ড দেখেও তালেবানকে বর্জন তো করেইনি এমনকি তালেবানের এই কুকীর্তি উল্লেখ করে নিজেদেরকে এর থেকে মুক্ত ঘোষণাও করেনি। তালেবানকে

বর্জন ও তালেবানের কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত ঘোষণা করার বদলে তারা তাদের আনুগত্যে লেগে আছে এবং তাদের উচ্চপ্রশংসায় লিপ্ত আছে। প্রিয় পাঠক! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, কারা দাবি এবং কাজে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি? আমরা আশাকরি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, দাবি এবং কাজে তানযীম আল-কায়দা ভারসাম্য রক্ষা করেনি এবং তাদের মানহাজ বিকৃত হয়েছে। যেমনটা আমরা জানতে পারি আমাদের সম্মানিত শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﵀ -এর বক্তব্যেঃ তিনি বলেন, "অবশ্যই তানযীম আল-কায়দার নেতারা সঠিক মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আমরা এ ব্যাপারে বলছি অথচ কষ্ট আমাদের মর্মমূলে আঘাত করছে আর আমাদের অন্তর তিক্ততায় পূর্ণ। আমরা এটা বলছি সকল প্রকার মনোক্ষুণ্নতা নিয়ে, আর আমরা কতইনা চেয়েছিলাম একথা না বলতে, কিন্তু আমাদের উপর জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমরা সত্য বলব এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না। অবশ্যই (তাদের) বদলে যাওয়া ও পরিবর্তন হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে গেল, নিশ্চয়ই বর্তমানের আল-কায়দা জিহাদের আল-কায়দা নয়, সুতরাং এটি আর জিহাদের ভিত্তিও নয়, নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই এর প্রশংসা করে, তাগুতের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব দেখায়, অর্থ বিকৃতকারী ও পথভ্রষ্টরা এর সাথে নরম নরম কথা বলে। আল কায়দা এখন জিহাদের ভিত্তি নয়, সাহওয়াত ও ধর্মনিরপেক্ষরা এর সাথে একই সারিতে রয়েছে, অতীতে যারা তাদের বিরোধী ছিল, অথচ তারা এখন এর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদের ফাতওয়া অনুযায়ী মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। নিশ্চয়ই বর্তমানে আল-কায়দা জিহাদের ভিত্তি হিসেবে স্থগিত হয়ে গেছে, বরং এর নেতৃত্ব এমন একটি কুড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে যা দাওলাতুল ইসলাম এবং আগত খিলাফাহ'র ধ্বংসকারী পরিকল্পনাকে সহায়তা করছে। তারা তাদের মানহাজ পরিবর্তন করেছে, তারা সন্দেহজনক হয়ে পড়েছে, তারা বিদ্রোহীদের বাইআত গ্রহণ করেছে, তারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভক্তি এনেছে, তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে যা মুওয়াহহিদদের রক্ত ও খুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, যে দাওলাহ'র প্রশংসা ও সমর্থন করেছে সকল জিহাদের নেতারা, এবং তারা এর বৈধতা বছরের পর বছর বজায় রেখেছে গোপনে ও প্রকাশ্যে, এমনকি তারাও যারা এর বিরুদ্ধে আজকের দিনে যুদ্ধ করছে। এটা এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যখন তারা দাওলাহ'র

আমীর ও সৈনিকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করত এবং এর উপকারিতা স্বীকার করত এবং নিকট অতীতকে স্বীকৃতি জানাতো যা প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে ঋণ হয়েছিল। কী পরিবর্তন হয়েছে? আমীর একই, নেতৃত্ব একই, সৈনিক একই এবং মানহাজও একই!”[7]

চিঠিতে উল্লেখ রয়েছেঃ “ফলে আমরা জিহাদীরাও বহু দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে গেলাম। আর ফলাফল-ও কুরআনের ওয়াদা (বা ওয়াইদের) অনুরূপ হল।”

আমরা পূর্বেই বলেছি, যারাই জিহাদ করার দাবি করে অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে মুজাহিদ হিসেবে পরিচয় দেয় তারা সবাই কিন্তু শারীয়াহ’র আলোকে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ না। হতে পারে তাদের কেউ বা কোন গোষ্ঠী যখন যুদ্ধ শুরু করেছিলো তখন আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়াই তাদের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেছে যা তাদের বক্তব্য দ্বারাই প্রমাণিত। তাই যারা পদস্খলিত হয়েছে এবং যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বা যারা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে লড়াই করে তারা কিন্তু সত্যিকারের মুজাহিদ বা জিহাদী নয়। তবে আমরা বলতে পারি– জিহাদের দাবিদাররাও দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলাম। একটি ভাগে রয়েছেন সত্যপন্থী মুজাহিদগণ এবং অন্য ভাগে রয়েছে জিহাদের দাবিদার বিভিন্ন দলসমূহ যারা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লড়াই করে। তাই এই বিভক্তি হওয়ারই ছিল। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

“যাতে আল্লাহ পৃথক করেন মন্দকে ভাল হতে। আর মন্দের কতককে কতকের উপর রাখবেন এবং সেগুলোকে একসাথে স্তূপ করবেন। এরপর তা জাহান্নামে

[7] এটা আমাদের মানহাজ নয় এবং কখনো ছিলও না।

নিক্ষেপ করবেন। তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।”[8]

আল্লাহ ﷻ ভালো থেকে মন্দকে পৃথক করেন। অতএব জিহাদরত দলগুলোর মধ্যে যারা পদস্খলিত হয়েছে তাদের পৃথক হওয়াটাও আবশ্যক হয়ে যায়। এই পৃথকীকরণ আসমান যমীনের সৃষ্টকারীর পক্ষ থেকে। এই ‘তাময়ীঝ’ এর মাধ্যমে সারিসমূহ নির্ভেজাল হয়। মুজাহিদগণের সারিসমূহ নির্ভেজাল হওয়ার পর আমাদের রব ﷻ খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ দান করলেন–আলহামদুলিল্লাহ। এটাই হল ভালো থেকে মন্দকে পৃথকীকরণের ফলাফল। আল্লাহ ﷻ বাছাই করে যামানার উত্তম ব্যক্তিদেরকে এই মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য কবুল করেছেন। প্রিয় ভাই! আপনি কিন্তু লক্ষ্য করেছেন যে, ফলাফলও কুরআনের ওয়াদার অনুরূপ হয়েছে। আমাদের রব বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْـًٔا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক্ব।”[9]

আল্লাহ তার সৎ বান্দাদেরকে যমীনে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন। আল্লাহ ﷻ রাসুলে কারীম ﷺ -এর কথার বাস্তবায়ন করেছেন নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ

[8] সুরা আনফালঃ ৩৭

[9] সুরা নুরঃ ৫৫

প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আবু সুলাইমান একটি আয়াত নিয়ে এসেছে, আল্লাহর বাণীঃ "আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা দূর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[10] সে এই আয়াত উল্লেখ করার মাধ্যমে হয়তো বুঝাতে চেয়েছে যে, দাওলাতুল ইসলামের কারণে জিহাদের ময়দানে মতপার্থক্য এবং বিভক্তি তৈরি হয়েছে। মুসলিমরা দূর্বল হয়ে গেছে, মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর হয়ে গেছে।

আল্লাহর বাণীঃ "আর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা দূর্বল হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" এই আয়াতের নিকট আমাদের অবস্থান পরিপূর্ণ আল্লাহ ﷻ যেমন আদেশ করেছেন তেমনই। আমরা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালন করি। যেমন আল্লাহ ﷻ অন্য আয়াতে বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ
وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

"হে মু'মিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসুলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।"[11]

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের আদেশ পালনার্থে আমরা ওলীল-আমর তথা খলীফাতুল মুসলিমীনের আনুগত্য করি। বিপরীতে তানযীম আল-কায়দা অহংকার

---

[10] সুরা আনফালঃ ৪৬

[11] সুরা নিসাঃ ৫৯

এবং একগুঁয়েমির কারণে শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিপূর্ণ বৈধ একজন খলীফাহ'র আনুগত্য করেনি। তারাই বিভেদ সৃষ্টি করেছে। ফলে তারা দূর্বল হয়েছে বিভিন্ন ময়দানে। প্রিয় ভাই! আল-কায়দা তিউনিসিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। লিবিয়াতে আল-কায়দার শাখা আনসারুশ শারীয়াহ খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিভিন্ন মুরতাদ মিলিশিয়া গোষ্ঠীর সাথে জোটগঠন করেছে পরে তারা মিলিশিয়াদের সাথে একীভূত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে আল-কায়দার লিবিয়া শাখা বলতে আর কিছু বাকি থাকেনি। বহুল আলোচিত শামেও আল-কায়দার শাখা নামে মাত্র আছে। কোন কার্যক্রম নেই বললেই চলে। যেহেতু তানযীম আল-কায়দা বিভেদ সৃষ্টি করেছে তাই তারাই আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও এর মধ্যে পড়েছে। তাদের দুইটি শাখা পরিপূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। অপর একটি নিশ্চিহ্ন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। দৃশ্যত তারাই দূর্বল হয়েছে ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও চলে গেছে। বিষয়টি খোলাসা করে বলি, লিবিয়ায় একপক্ষে দাওলাতুল ইসলাম অন্য দিকে দাওলাহ'র বিপক্ষে আমেরিকার নেতৃত্বে ক্রুসেড জোট এবং বিভিন্ন মিলিশিয়া গ্রুপ ও এর সাথে আল-কায়দা যোগ দিয়েছে। সাধারণত দূর্বল কয়েক পক্ষ মিলে শক্তিশালী কোন এক পক্ষের বিরুদ্ধে জোটগঠন করে। তাই লিবিয়ার ঘটনায় আল-কায়দা দূর্বল হওয়ার মত তিক্ত সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি চলে যাওয়ার আরেকটি জ্বলন্ত প্রমাণ দেই। প্রিয় পাঠক! আপনি আবশ্যই জানেন যে, তালেবানের নেতাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য অর্ধনগ্ন মহিলাগুলো প্রায়শই তাদের কাছে আসে। এ কেমন প্রভাব যে, অর্ধনগ্ন মহিলাগুলো একটু শালীন কাপড় পড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না! আযাবুল উযাব!

আলহামদুলিল্লাহ্ মুসলিমদের জামাআত আঁকড়ে থাকা এবং খলীফাহ'র আনুগত্যে লেগে থাকার ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন নতুন ময়দানে জিহাদ বিস্তৃত হয়েছে যেমন– মধ্য আফ্রিকা, মোজাম্বিক। গোটা দুনিয়াতেই আজ কুফফারদের মোড়ল এবং স্থানীয় তাগুত এজেন্টরা ত্রাসের স্বাদ আস্বাদন করছে। এক্ষেত্রে আমি উদাহরণ হিসেবে নিয়ে আসতে পারি– যেমন ধরুন শামের উলায়াত বারাকায় গোওয়াইরান কারাগারে খিলাফাহ'র সিংহদের হামলা। কুফফার মিডিয়া প্রচার করেছিল যে, প্রায় দুইশত যোদ্ধা আক্রমণ করেছে। কোন কোন মুরতাদ সামরিক

বিশ্লেষক মনে করেছে খিলাফাহ'র সৈন্যরা পুরো শহর দখলে নিতে এসেছে। আল্লাহু আকবার! কতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছে তারা। প্রিয় পাঠক! আপনি কি লক্ষ্য করেছেন? আল্লাহর অনুগ্রহে মুজাহিদগণ শত্রুর অন্তরে কতটা বেশি রু'ব এর সঞ্চার করতে সক্ষম! আপনারা তো অবগত আছেন যে, মাত্র বারো জন ইসলামের সিংহ এই বরকতময় হামলা চালিয়েছেন। ঐ হামলা প্রতিহতের জন্য আমেরিকা স্থল এবং আকাশ উভয় স্থানেই অংশ নিয়েছে। মুজাহিদগণের হামলায় ক্ষয়ক্ষতি এবং এর ফলাফল সবাই জানেন। এই ঘটনা থেকেই আপনি হয়তো বুঝে গেছেন মুজাহিদগণের প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর হয়ে গেছে কিনা। নিশ্চয়ই দাওলাহ'র প্রভাব বাকি আছে আর বিভক্তি সৃষ্টিকারীদের প্রভাব চলে গেছে। দাওলাতুল ইসলাম টিকে থাকবে এবং কুফফার মুরতাদদের অন্তরে আতঙ্ক ও ত্রাসের সৃষ্টি করবে–বি-ইযনিল্লাহ।

চিঠির বক্তব্যঃ "আল্লাহর ওয়াদা তো মিথ্যা হবার নয়। মু'মিনরা এক হয়ে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় যুদ্ধ করলে সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পরাশক্তির পতন হতে মাত্র দশ বছর লাগে। মু'মিনরা এক হয়ে পরিকল্পনা মোতাবেক জিহাদ করলে আমেরিকার মত সুপার পাওয়ার খোলসে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়।"

নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হওয়ার নয়। আমাদের রব বলেন,

﴿وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ﴾

"আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে?"[12]

আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। কারণ, আল্লাহ ﷻ তার সৎ বান্দাদেরকে যমীনে তামকীন দান করেছেন। দীর্ঘ কষ্টের পর আবার স্বস্তি দান করেছেন–"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।"[13] আমি পূর্বের কথাই আবার বলছি, মু'মিনরা ঐক্যবদ্ধ হবে ঈমান এবং তাওহীদের ভিত্তিতে। অন্য কোন ধারণা

[12] সুরা তাওবাঃ ১১১

[13] সুরা আলে-ইমরানঃ ০৯

প্রসূত মাসলাহার ভিত্তিতে নয়। কারণ একজন মু'মিনের জন্য তাওহীদের মাসলাহাই সবচেয়ে বড় মাসলাহা। তাওহীদ পরিপন্থি এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজের মাঝে কোন মাসলাহা থাকতে পারে না। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে আফগানিস্তান থেকে হটানোর ব্যাপারে সবাই একমত ছিল–এটা ঠিক, কিন্তু একটি বিষয় আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল - আমরা কেন লড়াই করি? আমাদেরকে এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝা দরকার যে, আমরা কেন লড়াই করি? আমাদের লড়াই করার উদ্দেশ্য কী? আমরা লড়াই করি যেন দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয় এবং শিরক বাকি না থাকে। আমরা শিরক নির্মূল করা এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে লড়াই করি। আমরা শুধুমাত্র কোন দখলদার বাহিনীকে হটানোর উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করি না। বরং আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দখলদার কুফফার বা মুরতাদ বাহিনীকে হটানো ব্যতীত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই তাদের বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করি। ধরুন, আমাদের লড়াইয়ের ফলে দখলদার বাহিনী থেকে কোন ভূমি দখলমুক্ত হল কিন্তু দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হলো না। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কী? যেহেতু দেশ দখলদার মুক্ত হয়েছে তাই আমরা কি লড়াই বন্ধ করে দিব? না-কী করব? আমরা আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তার আদেশ অনুসারে লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দখলদার বাহিনী প্রতিবন্ধক হোক বা স্বদেশী মুরতাদ শাসক এবং এর সৈন্যরা–যে প্রতিবন্ধক হবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে। যে কেউ আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে তার বিরুদ্ধেই লড়াই চলবে। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনই শুধুমাত্র আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানযীল আরো উঁচুতে, তা হল - আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদি দখলদার বাহিনী চলে যায় কিন্তু শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা না হয়, তবে কি আমাদের লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হাসিল হবে? আল্লাহর কসম! কখনোই আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। এবার চলুন দখলদার রুশ বাহিনী চলে যাওয়ার পরবর্তী অবস্থা জেনে নেই। রুশরা চলে যাওয়ার পর আফগানিস্তানের ক্ষমতায় কে এসেছিলো জানেন? আফগানিস্তানের ক্ষমতায় এসেছিলো কমিউনিস্টপন্থি নাজিবুল্লাহ সরকার। সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! এখানে আমাদের লড়াই করার উদ্দেশ্য কিন্তু অর্জিত হয়নি।

সুতরাং ফলাফল শূন্য। এক তাগুতের স্থানে অন্য তাগুত প্রতিস্থাপন হয়েছে–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্।

বিপরীতে আরেকটি চিত্র দেখুন, আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাকে আক্রমণ করার পর বিভিন্ন মুজাহিদ দল আগ্রাসী কুফফারদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুজাহিদগণ যার যার জায়গা থেকে সামর্থানুযায়ী লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। ইরাকে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ এবং বিশুদ্ধ মানহাজের অধিকারী দূরদর্শী মুওয়াহহিদগণ ঐক্যবদ্ধ হন। তারা দূরদর্শিতা অর্জন করেছেন বিশুদ্ধ তাওহীদের জ্ঞানের আলোকে। তারা দূরদর্শিতা সম্পন্ন হয়েছেন সালফে সালেহীনগণের পথে চলার মাধ্যমে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাজলিসে শুরাল-মুজাহিদীন গঠন করেন। মুজাহিদগণের নেতৃবৃন্দ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাদের লক্ষ্য ছিল উঁচুতে। এব্যাপারটি আমরা শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﷀ -এর এক বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি। তিনি বলেন, **"إننا نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس"** “আমরা লড়াই করি ইরাকে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি হচ্ছে বায়তুল মাক্বদিসে।” ইরাকে মুজাহিদগণের ঐক্যবদ্ধতা ৮০ এর দশকে আফগানিস্তানের যোদ্ধাদের ঐক্যের মত ছিল না। আফগানিস্তানকে দখলদার মুক্ত করার মত শুধুমাত্র ইরাক থেকে দখলদার আমেরিকাকে হটানোই উদ্দেশ্য ছিল না তাদের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত আমেরিকাকে ইরাকের ভূমিতে পরাজিত করা এবং একটি দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যমীনে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা। দ্বিতীয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল, আমেরিকাকে শুধু ইরাক থেকে হটানো নয় বরং স্পেন থেকে নিয়ে মুসলিমদের প্রতিটি দখলকৃত ভূমি থেকে দখলদার কুফফার বা তার মুরতাদ তাগুত এজেন্টদেরকে বের করে দেওয়া এবং সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর বান্দাদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা যেন শিরক কুফর নির্মূল হয় এবং দ্বীন হয় পরিপূর্ণ আল্লাহর জন্য। মাজলিসে শুরা গঠন হওয়ার কিছুদিন পরই হিলফুল মুত্বইয়্যিবীন গঠিত হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে এভাবেই আকাশচুম্বী লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মুজাহিদগণের পথ চলা সফলতার একেকটি ধাপ অতিক্রম করতে থাকে। অনিবার্য ফলস্বরুপ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামীয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালে। এই দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে

পরবর্তীকালে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়। এই দাওলাহ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে ইমাম আনওয়ার আল-আওলাক্বী رحمه الله -বলেন, "অতি সম্প্রতি, ইরাকে বাগদাদে একটি দাওলাতুল ইসলামের ঘোষণা করা হয়েছে যা ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় যাবৎ শাসনকারী খিলাফাহ'র রাজধানী ছিল। বাগদাদ ছিল রাসুল ﷺ -এর চাচা আব্বাস رضي الله عنه -এর উত্তরসূরীদের শাসনাধীন। কারণ আমরা জানি যে, বাগদাদ আব্বাসীদের হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– আল-খিলাফাহ আল-আব্বাসিয়্যাহ এবং তারা বাগদাদকে তাদের খিলাফাহ'র রাজধানী বানিয়েছিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরে বাগদাদ-ই রাজধানী থেকে যায়। তাই ইরাকে দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তা বাগদাদে প্রতিষ্ঠা হওয়া, যা ছিল আব্বাসী খিলাফাহ'র রাজধানী। উপরন্তু সেই দাওলাহ'র প্রধান হচ্ছেন হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিবেরর বংশধর যা অনেক গুরুত্ব রাখে। এই ঘটনা তত্ব থেকে বাস্তবের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রায়োগিক চিন্তাধারাকে তুলে ধরে। ইসলামী শারীয়াহ এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারা এখন আর শুধু বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা এখন বাস্তব। এই ঘটনা প্রকাশ করে যে, এখন আর মুজাহিদগণ শুধু কাজ-ই করবে না এবং লড়াইয়ের পর লড়াই করবে না–এই জন্য যে, অন্যরা তাদের কাজের ফল ভোগ করবে। এখন তাদের নিয়ত শুধু দখলদার বাহিনীকে তাদের ভূমি থেকে বের করে দেয়া নয়, এই জন্য যে, অন্য এক মুনাফিক্ব এসে তাদের জায়গা দখল করবে। বরং এখন তারা দাওলাতুল ইসলামের প্রকল্প নিয়ে এগুচ্ছে, যা খিলাফাহ'র দিকে অগ্রসর হবে। ভাই ও বোনেরা! আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছি রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সেই হাদিসের চুরান্ত অংশেঃ ستكون خلافة على منهاج النبوة অচিরেই নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ আসবে।"

প্রিয় পাঠক! আপনি জানেন যে, ইরাকে আমেরিকার হামলার তিন বছর যেতে না যেতেই একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়। আপনি কি ভেবেছেন–এর কারণ কী? আপনি কি ভেবেছেন তৎকালীন আফগানে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এবং ইরাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈচিত্র্য ফলাফল নিয়ে? এখনো গল্পের অনেক বাকি! ইরাকে যুদ্ধের আট বছর পেরুতেই আমেরিকার মত সুপার পাওয়ার পরাজয়ের গ্লানি

নিয়ে ইরাক ছাড়তে বাধ্য হয়। আট বছরের তীব্র যুদ্ধে আমেরিকা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। আমেরিকা পরাজিত হয় এবং দূর্বল হয়ে যায়। কোন রকম চুক্তি ছাড়াই লাঞ্ছিত অবস্থায় ইরাক ছেড়ে চলে যায়–আলহামদুলিল্লাহ। আফগানিস্তানে ১০ বছর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর তাগুত সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হলো ঠিকই কিন্তু তার স্থলাভিষিক্ত হলো স্থানীয় তাগুত নাজিবুল্লাহ সরকার। অন্যদিকে আমেরিকা ইরাকে হামলার তিন বছর শেষে ইরাকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলো এবং হামলার মোট আট বছর পর দাওলাতুল ইসলামের কাছে আমেরিকা পরাজিত হয়ে ইরাক ছাড়ল। এ দু’টির মধ্যে কোনটি আসল সফলতা?[14] আমি শুধু পাঠকের বিবেকের কাছেই প্রশ্ন রেখে যেতে চাই!

আবু সুলাইমান আবেগতাড়িত হয়ে বাস্তবতা বিবর্জিত তথ্য উপস্থাপন করেছে। সে বলেছে, আমেরিকা খোলসে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়। আমেরিকা সুস্পষ্ট পরাজিত হওয়ার পরেও কেন সে আমেরিকার ‘পরাজিত হওয়া’ উল্লেখ করতে চয়নি তা আমার বোধগম্য নয়। আমার মনে হয় অন্য কোন ভ্রান্ত মতাদর্শের নিকট নিজের বিবেক বন্ধক রেখে কোন কিছু চিন্তা করলে এর থেকে ভালো ফলাফল কি-বা আশা করা যায়! "أللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه"

চিঠির বক্তব্যঃ “আর মু’মিনরা বিচ্ছিন্ন হলে ও পরস্পর লড়াই করলে এসডিএফ এর মত এক নগণ্য ও রাষ্ট্রহীন দলের কাছে মুজাহিদরা পরাজিত হয়, হুরমত লজ্ঘিত হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীদের (মুহাজির ও আনসার) কে আল-হাওল, আল-রুসাফার মত বন্দিশিবির ও কারাগারে কাটাতে হয়। আল্লাহ তাদেরকে দ্রুত ও কল্যাণকর মুক্তি দান করুন। আমিন!”

আসলে আবু সুলাইমান তার চিঠিতে অন্তঃসারশূন্য, বাস্তবতা বিবর্জিত প্রোপাগান্ডা মূলক অনেক কথা নিয়ে এসেছে। হয়তো সে বাস্তবতা জানে না অথবা সে প্রকৃত বাস্তবতাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চাইছে, যেন

[14] এখানে আফগানিস্তানে মুজাহিদগণের বরকতময় জিহাদকে আমাদের ছোট করা উদ্দেশ্য নয় । বরং আমাদের উদ্দেশ্য হল মূল বাস্তবতা তুলে ধরা।

সে তার ভণ্ডামি এবং প্রতারণাকে আড়াল করতে পারে। কিন্তু আমরা তার এহেন ন্যক্কারজনক উদ্দেশ্য সাধন করতে দিতে পারি না। এ লক্ষ্যেই আমরা আপনাদের সামনে যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব–বিইযনিল্লাহ। এবার আলোচনায় প্রবেশ করছি, আবু সুলাইমান বুঝাতে চেয়েছে, মু'মিনরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পর লড়াই করেছে এবং নগণ্য শত্রু এসডিএফ এর কাছে দাওলাহ পরাজিত হয়েছে। সে এই কথার মাধ্যমে মু'মিনদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং পরস্পর লড়াইয়ের ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামকে দোষারোপ করার চেষ্টা করেছে। দোষারোপের ক্ষেত্রে সে সরাসরি দাওলাহ'র নাম উল্লেখ করেনি, কিন্তু তার চিঠির এই বক্তব্য পড়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তিই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, সে দাওলাতুল ইসলামকেই বুঝাতে চেয়েছে। সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, দাওলাতুল ইসলামই কি মু'মিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে নাকি অন্য কেউ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে? প্রকৃত ঘটনা আপনাদেরকে জানানোর মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস চালাবো ইনশা'আল্লাহু তা'আলা।

আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী ﷫ -এর নেতৃত্বে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ ইরাকের অনেক ভূমির কর্তৃত্ব লাভ করে আল্লাহর অনুগ্রহে। শামের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পর দুর্দশাগ্রস্ত মাজলুম মুসলিমদেরকে সাহায্য করার জন্য আবু বকর আল-বাগদাদী ﷫ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র মুজাহিদদের একাংশকে শামে প্রেরণ করেন। এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয় 'জাবহাতুন নুসরাহ'। জাবহাতুন নুসরাহ'র নেতৃত্ব দেওয়া হয় আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷫ -এর অধীনস্ত সৈনিক আবু মুহাম্মাদ জুলানীর হাতে। একদিকে ইরাকে আল্লাহর বান্দাদের হাতে বিস্তীর্ণ ভূমি বিজয় হতে থাকে, অপরদিকে শামেও অনেক ভূমি মুসলিমগণের করতলগত হয়। তথাপি দাওলাতুল ইসলামের আক্বীদাহ-মানহাজ অনুযায়ী শামে বিজয়সমূহের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আবু বকর আল-বাগদাদী ﷫ -এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী এবং তার আশেপাশের লোকজন দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আবু মুহাম্মাদ জুলানী শিরক,

রিদ্দাহ'র দলগুলোকে এবং তাদের মন্দ পরিচালনা কমিটি ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীর শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য জোড় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো। সারির অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রকারী ও খিয়ানতকারী একদলের পক্ষ থেকে কার্যত বিজয় নষ্টকরণ ও ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকি আসছিল। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আবু বকর আল-বাগদাদী ﷺ তার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মূল বাস্তবতা উন্মোচন এবং বিষয়গুলো সংশোধন করতে চাইলেন। তাই বাগদাদী ﷺ শাইখুল মুজাহিদ আবু আলী আল-আনবারী ﷺ কে শামে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন।

প্রিয় ভাই! আপনি কি জানেন, এই আবু আলী আল-আনবারী কে? তিনি হলেন ঐ ব্যক্তি আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী যাকে খোরাসানে আল-কায়দার কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গের কাছে পাঠিয়েছিলেন দুই নদীর দেশে তানযীম আল-কায়দার বাস্তব পরিস্থিতি ও কর্মকাণ্ড খোলাসা করার জন্য, যখন আনসারুস সুন্নাহ নামক একটি দল আল-কায়দার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তৎকালীন ইরাকে আল-কায়দার ব্যাপারে অভিযোগ করে। খোরাসানে শাইখ আবু আলী আল-আনবারী ﷺ আবু ইয়াহয়া আল-লিব্বী ﷺ এবং আতিয়াতুল্লাহ আল-লিব্বী ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর তিনিই ঐ ব্যক্তি যিনি মাজলিসে শুরাল-মুজাহিদীনের আমীর ছিলেন। সুতরাং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রবীণ যোগ্য মহান এক শাইখকে নির্বাচন করেছিলেন দাওলাহ'র উমারাগণ। শাইখ আবু আলী আল-আনবারী ﷺ পুরো শাম জুড়েই সফর করেন। তিনি শামের প্রতিটি অঞ্চলেই যান। সেখানে তিনি জাবহাতুন নুসরাহ'র নেতৃবৃন্দ এবং সৈনিকদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করেন এবং সংশোধনের চেষ্টা করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি জুলানীর সাথে থেকে যান এবং তাকেও সংশোধনের চেষ্টা করে যান। কারাগারে এক সাথে থাকার কারণে শাইখ আবু আল-আনবারী ﷺ আবু মুহাম্মাদ জুলানীকে আগে থেকেই চিনতেন। সেখানে থাকা অবস্থাতেই শাইখ আবু আলী আল-আনবারী ﷺ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷺ কে চিঠি লিখে আবু মুহাম্মাদ জুলানীর ব্যাপারে অবহিত করেন। তিনি চিঠিতে লিখেনঃ "একজন প্রতারক দ্বিমুখী লোক, যে নিজেকেই পছন্দ করে এবং নিজের সৈনিকদের দ্বীনদারিত্বের ব্যাপারে কোন পরোয়া করে না। সে তার

সৈনিকদের রক্ত বিসর্জন দিতে উদ্যত হয় যেন মিডিয়াতে তার আলোচনা নিশ্চিত হয়। আর যখন মিডিয়াতে তার নাম আলোচিত হয় তখন সে শিশুদের মত খুশিতে উড়তে থাকে।"[15]

দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র বিচক্ষণ নেতৃবর্গের নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী প্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে, এমনকি বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত সময় খুঁজছে। তখনই দাওলাহ'র নেতৃবর্গ ঠিক করেন, তারা দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যেন জুলানীকে সরিয়ে জাবহাতুন নুসরাহ'র জন্য নতুন নেতৃত্ব নির্ধারণ করা যায়। যেহেতু জুলানী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এবং দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। তাই দাওলাহ'র নেতৃত্ব অনুভব করল, যদি তারা জুলানীকে সরিয়ে অন্য নতুন কোন নেতৃত্ব নির্ধারণ করে তাহলে বিষয়টি ব্যাপক মাসলাহার পরিপন্থি হবে। আর একারণেই শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী حفظه الله তড়িৎ গতিতে জাবহাতুন নুসরাহ'র নাম বিলুপ্ত করে দেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন যে, জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইসলামের অনুগামী একটি শাখা। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শাইখ বাগদাদী حفظه الله কে শাইখ আবু আলী আল-আনবারী حفظه الله সাহায্য করেন। আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী حفظه الله ইরাক এবং শামের মুজাহিদগণ ও আহলুস সুন্নাহ'কে উদ্দেশ্যে করে একটি বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাতে বলেন, "জাবহাতুন নুসরাহ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র সম্প্রসারণ এবং এরই একটি অংশ। আর আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তেখারা করার পর এবং আমরা যাদেরকে দ্বীনের ও প্রজ্ঞার ব্যাপারে বিশ্বস্ত মনে করি তাদের সাথে পরামর্শ করার পর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি সবকিছুর ঊর্ধ্বে–এর কারণে আমাদেরকে যা গ্রাস করার করুক। তাই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে 'দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ' নাম বাতিল করার ও 'জাবহাতুন নুসরাহ' নাম বাতিল করার ঘোষণা দিচ্ছি এবং আমরা আরো ঘোষণা দিচ্ছি, এ দু'টিকে একই নামে অন্তর্ভুক্ত করার, তা হল দাওলাতুল ইসলামীয়্যাহ ফীল ইরাক ওয়াশ

[15] লুমহাতুন মিনান-নাশআতি ইলাত-তামাদ্দুদ

শাম।”

যখন আবু মুহাম্মাদ জুলানী এই বিষয়টি জানতে পারল তখন তড়িৎ গতিতে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করল। আর সে দাবি করল যে, তার জানামতে কারো সাথেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়নি। তাই সে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র বাইআত ভঙ্গ করল এবং ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা দিল। প্রিয় ভাই! আপনি অবশ্যই খেয়াল করেছেন যে, আবু মুহাম্মাদ জুলানী দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র আমীর শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ -এর অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতারণামূলকভাবে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা দেয় এবং এর মাধ্যমেই প্রথম মু’মিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। মু’মিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করে জুলানী আর এই বিভক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী। হ্যাঁ, তিনি-ই মু’মিনদের মধ্যে এই বিভক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীকে দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে জুলানীর বাইআত গ্রহণ না করতে বারংবার অনুরোধ করা হয়েছে তথাপি তিনি কর্ণপাত করেন নি। তালেবানের তৎকালীন ইমারাহ যেমন একটি স্বাধীন ইমারাহ ছিল ঠিক তেমনি ইরাকের দাওলাহও একটি স্বাধীন ইমারাহ ছিল–কোন রাষ্ট্র বা গোষ্ঠীর আনুগত্যে বা অধীনে ছিল না। আর ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী নিজে তালেবানের অধীনস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অন্য আরেকটি স্বাধীন ইমারাহ’র বাইআত ভঙ্গকারী জুলানীর বাইআত গ্রহণ করা এবং জাবহাতুন নুসরাহ’কে শামে আল-কায়দার শাখা হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে তিনি-ই মু’মিনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করেন–ওয়াল-ইয়াযুবিল্লাহ্। দাওলাহ’র নেতৃবর্গের পক্ষ থেকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি খিয়ানতকারী জুলানীর বাইআত গ্রহণ করার দ্বারা উম্মাহ’র মাঝে বিভক্তির এক দেয়াল টানলেন। সাথে সাথে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। হে ডাক্তার! আপনি উম্মাহ’কে এক অপূরণীয় ক্ষতির মুখে ঠেলে দিলেন, ঠেলে দিলেন এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে। এই প্রবাহিত রক্তের সব দায়ভার আপনারই, আপনার নির্বুদ্ধিতার কারণেই এসব ঘটেছে।

প্রিয় পাঠক! আপনি অবশ্যই জানেন যে, ডাক্তার সাহেবকেও ফাঁকি দিয়েছে জুলানী। খিয়ানতকারী মুরতাদ জুলানীর মুখোশ উম্মাহ'র সামনে আরেকবার উন্মোচিত হয়েছে। যেভাবে দাওলাহ'র সাথে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘতকতা করেছে ঠিক সেভাবেই ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যুগে যুগে খিয়ানতকারীরা এমনই ছিল। এ ক্ষেত্রেও ইতিহাস তার পুনরাবৃত্তি করেছে। সুতরাং মু'মিনদের মাঝে বিভক্তি তৈরি করেছে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী এবং আবু মুহাম্মাদ জুলানী। দাওলাতুল ইসলাম কখনোই মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি তৈরি হোক তা চায়নি এবং দাওলাহ কখনোই বিভক্তি তৈরি করেনি। দাওলাহ-ই পৃথিবীর আনাচেকানাচে অবস্থানরত মুজাহিদগণকে এক ইমাম এবং এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য আহ্বান করে। শুধু তাই নয় বরং দাওলাহ'র নেতৃবৃন্দ নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের ঐক্যের পথ আরো সুগম করে দিয়েছেন–আলহামদুলিল্লাহ। এ পর্যায়ে আমরা আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি– আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণা করার পর জুলানী বিশ্বাসঘাতকতা করলেও জুলানীর অধীনস্ত সবাই জুলানীর অনুসরণ করেনি। বরং তারা দাওলাহ'র কেন্দ্রীয় আমীরের আদেশের অনুসরণ করে এবং জুলানীকে ত্যাগ করে। যেমন– রাক্কাহ'র প্রায় সবাই জুলানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হালাবে ৮০% জুলানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ইরাক শামের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সবাই জুলানীকে ত্যাগ করে। দামেস্ক এবং দামেস্কের পল্লী অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। কেউ দাওলাহ'র কেন্দ্রের অধীনে থেকে যায় আর কেউ জুলানীর সাথে যোগ দেয়। দার'আ অঞ্চলের সবাই জুলানীর সাথে যোগ দেয়। দেইরায-যোর এ দামেস্কের মত অবস্থা হয়। 'জাইশুল মুহাজিরীন ওয়াল আনসার' এর আমীর শাইখুল মুজাহিদ আবু ওমার আশ -শিশানী ﷾ তার অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে দাওলাহ'কে বাইআত দেন। এছাড়াও অন্য অনেকে দাওলাহ'তে যোগদান করেন।

প্রিয় ভাইগণ! আমি বুঝাতে পেরেছি যে, এই ফুরক্বাত তথা বিভক্তির জন্য নিরঙ্কুশভাবে জুলানী এবং ডাক্তার যাওয়াহিরী দায়ী। দাওলাহ এর থেকে মুক্ত।

কারণ তারা শুধু বিভক্তি সৃষ্টি করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং দাওলাহ’কে খারিজি ফাতাওয়া দিয়ে সবাইকে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেছে। বস্তুত আমরা দেখতে পাই, সাহওয়াতরা হালাবের পল্লী এলাকার আতারিবে দাওলাহ’র ঘাটিতে হামলা করে। অনেক আনসার এবং মুহাজিরগণকে হত্যা করে। আর এই হামলা করার মাধ্যমেই সাহওয়াতরা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। আর যে প্রথমে শুরু করে সেই অধিক জালিম। তারাই উম্মাহ’র মাঝে পরস্পর লড়াইয়ের সূচনা করে। ঐ সময়টাতে দাওলাহ নুসাইরিদের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আর এর সুযোগ নিয়ে সাহওয়াতরাই বিভিন্ন স্থানে দাওলাহ’র উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। এই সমস্ত হামলাগুলোতে দাওলাহ’র ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির নারী-পুরুষদেরকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করে–ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ্। এভাবে তারা দিনের পর দিন নিকৃষ্ট সব অপরাধ সংঘটিত করতে থাকে। এই ঘটনা প্রবাহগুলোর আলোকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, একটি পরস্পর লড়াই অবশ্যম্ভাবী। কারণ যেহেতু শামে মুসলিমদের প্রধান শত্রু নুসাইরী বাহিনী এবং এর মিত্ররা। আর দাওলাহ নিরবিচ্ছিনভাবে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছিল। অপরদিকে শামের সাহওয়াতরা বারবার দাওলাহ’র উপর অতর্কিতে হামলা করছিল। সাহওয়াতদের হামলার কারণে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে দাওলাহ’র যুদ্ধ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই বিষয়টি সময়ের দাবি যে, সাহওয়াতদেরকে দমন করা হবে যেন নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোনিবেশ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে দাওলাহ সাহওয়াতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আর এই পরস্পর লড়াইয়ের দায়ভারও কোনভাবেই দাওলাহ’র উপর বর্তায় না। খলীফাতুল মুসলিমীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ -এর বক্তব্য আমাদের দাবির ব্যাপারে সত্যায়ন করে। তিনি তার এক বক্তব্যে দাওলাহ’র সৈনিকদের উদ্দেশ্যে করে বলেন, “আপনারা এমন ব্যক্তিদের থেকে বিরত থাকুন যারা আপনাদের থেকে বিরত রয়েছে। আপনাদের অস্ত্র তাদের দিকে তাক করুন বিভিন্ন দলের মধ্য থেকে যারা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর ক্ষমা এবং নম্রতাকে প্রাধান্য দিন যেন আহলুস সুন্নাহ’র জন্য ওঁৎপেতে থাকা এক শত্রুর প্রতি আপনারা মনোযোগ দিতে পারেন।” সুবহানাল্লাহ্! যে সাহওয়াতরা প্রথমে

দাওলাহ’র উপর আক্রমণ করল তাদের ব্যাপারে যেন ক্ষমা ও নম্রতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় দাওলাহ’র আমীর তার সৈনিকদেরকে সেই আদেশ দিচ্ছেন। আহা! কতইনা বড় মহানুভবতা! কতইনা উদারতাপূর্ণ আহ্বান! এই সাহওয়াতরা দাওলাহ’কে খারিজি, তাকফীরী ও জাহান্নামের কুকুর বলে আখ্যায়িত করত। এরপরেও দাওলাহ’র আমীর তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, “আপনারা আপনাদের হিসাব পুনরায় কষে নিন এবং আপনাদের রবের নিকট তাওবা করুন। আপনারা তো আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আক্রমণ করেছেন এবং পিছন থেকে গাদ্দারি করে আমাদের আঘাত করেছেন যখন অল্পসংখ্যক ছাড়া আমাদের সকল সৈন্য ময়দানে ও রিবাতে ছিল। এরপরেও আপনারা আমাদের অল্প শক্তি দেখেছেন এবং আজকের ও অতীতের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আর আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে নিরাপদে ঘুরাফেরা করতেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন। কিন্তু আপনারা যে ভয় আর আতঙ্ক তৈরি করেছেন এর জন্য আপনারা রাত্রি জেগে থাকবেন এবং পাহারা বসাবেন। সুতরাং এই দাওলাহ আপনাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন আপনারা এর থেক দূরে থাকেন। তাহলে দাওলাহও আপনাদের থেকে দূরে থাকবে যেন আমরা সকলে রাফিদী নুসাইরীদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। তবে এটা জেনে রাখুন! এই দাওলাহ’র এমন পুরুষ রয়েছে যারা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকে না, যাদেরকে দূরের কাছের সকলেই চিনে।” কিন্তু আবু বকর আল-বাগদাদীর এই আহ্বানের পরেও সাহওয়াতরা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বন্ধ করেনি– اللهم أشكوا إليك بثي وحزني

চিঠির বক্তব্যঃ “এসডিএফ এর মত এক নগণ্য ও রাষ্ট্রহীন দলের কাছে মুজাহিদরা পরাজিত হয়।”

আল্লাহর কসম! যে বলবে ‘দাওলাহ এসডিএফ এর কাছে পরাজিত হয়েছে’ বিশ্বে চলমান যুদ্ধের ব্যাপারে তার কোন ধারণা নেই অথবা সে স্পষ্ট মিথ্যুক। আবারো বলছি যে এমনটা মনে করে, সে বৈশ্বিক রাজনীতি, স্ট্রাটেজি কিছুই বুঝে না। যে বলে, ‘দাওলাহ এসডিএফ এর কাছে পরাজিত হয়েছে’ আসলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কুফফার এবং মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধের ব্যাপারে নুন্যতম

কোন খবরাখবর তার কাছে নেই। অজ্ঞতার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এমন বিষয়ে আমি কী উত্তর দিব যে ব্যাপারে শত্রুও প্রশ্ন তোলে না। আমার মনে হয় না আবু সুলাইমান এগুলো জানে না কিন্তু আল্লাহ যদি কারো বোধশক্তি ছিনিয়ে নেন আমরা আর কি-বা করতে পারি!

প্রিয় পাঠক! আপনি অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, ৮০ টিরও অধিক দেশ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে সমবেত হয়েছে–চিঠির লেখক কি তা জানে না? নিশ্চিতভাবেই জানে। কিন্তু কেন এই মিথ্যাচার?! আমেরিকা এবং রাশিয়ার নিজেদের মাঝে শত্রুতার ব্যাপারে সবাই জানে তথাপি এই দুই পরাশক্তি শত্রু দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে একত্রিত হয়েছে। শুধু কি এই দুই পরাশক্তি দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে নাকি আরব-অনারবের সকল তাগুতগোষ্ঠী দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত? পৃথিবীর মধ্যে ৮০ টিরও অধিক দেশ দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। ভূপৃষ্ঠে আর কোন দেশ, জামাআত বা দল আছে যাদের বিরুদ্ধে কুফফাররা এতটা আগ্রাসী? যাকে মূলোৎপাটন করার জন্য কুফফার গোষ্ঠী এতো বেশি উঠেপড়ে লেগেছে? এর কারণ কী? খারিজিদের একটা অন্যতম গুণ তারা কাফিরদের ছেড়ে মুসলিমদের হত্যা করে। আর কিছু অবুঝ লোক আমাদেরকে খারিজি বলে বেড়ায় তবে কুফফাররা কেন আমাদের বিরুদ্ধে এতো কঠোর? কেন কয়েকশ বছরের পুরানো শত্রুতা পেছনে ঠেলে আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা রাশিয়া একমত হয়? কেন এতো শত্রুতা? কেন এতো বিদ্বেষ? আজ দাওলাতুল ইসলামের উপর কুফফাররা একযোগে যেভাবে হামলে পড়েছে ইসলামের ইতিহাসে এর আগে কখনোই এভাবে একযোগে মুসলিমদের উপর হামলে পড়েনি। আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ পাহাড়সম দৃঢ় মনোবল নিয়ে বৈশ্বিক কুফফারদের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। কথিত এই পরাশক্তিগুলোর নিকট মাথা নত করেন নি, হিনমন্যতায় ভোগেন নি এবং ক্লান্ত অথবা দূর্বলও হয়ে পড়েন নি–আলহামদুলিল্লাহ। দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসিত ভূমি প্রতিরক্ষায় ত্যাগ এবং কুরবানীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামের ইতিহাসে বীরত্ব আর সাহসিকতার

নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন। দাওলাতুল ইসলামের সিংহশাবকেরা স্থানীয় ও বৈশ্বিক কুফফারদের ন্যক্কারজনক হামলাগুলো নস্বাৎ করতে যেভাবে নিজেদের জীবন অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন তা বর্ণনা করার মত ভাষা আমার জানা নেই। কোন ভাষা এই কুরবানী ও বীরত্বগাথা ইতিহাস বর্ণনার জন্য যথেষ্ট নয়। যে ইতিহাস রক্ত দ্বারা লেখা হয় তা কি কলমের কালি দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব? আপনি জানেন যে, উলায়াত নিনাওয়ার অন্তর্গত মাসুল শহরে দীর্ঘ ৯ মাস অবরোধে কয়েকশ ইস্তিশহাদী নিজেদের উৎসর্গ করেছেন ইসলাম এবং মুসলিমদের ভূমি রক্ষায়। এই মাসুল শহরে এমনভাবে বোম্বিং করা হয়েছে যে, তা পশু-পাখি বসবাসেরও অযোগ্য হয়ে গেছে। তারপরেও মুজাহিদীনে ইসলাম নিজেদের ধমনীতে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন। এমনই ছিল দাওলাতুল ইসলামের কর্তৃত্বে থাকা শহরগুলোর অবস্থা। সিরত, রাক্কা, দামেস্ক সবখানে একই চিত্র–কুফফারদের বর্বর হামলা, খিলাফাহ'র সৈনিকদের পাহাড়সম অবিচলতা এবং কুরবানী–এগুলো মাকদিসীর অনুসারীর চোখে পড়ে না!!

এবার আসি উলায়াত বারাকায় অবস্থিত দৃঢ়তা, সাহসিকতাপূর্ণ, ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কুরবানীর ঐতিহাসিক ছোট্ট ভূমি বাগুজের আলোচনায়–বাগুজ একটি নাম। বাগুজ একটি ইতিহাস যা রচনা করেছিল উম্মাতে মুসলিমাহ'র গুটিকয়েক আত্মত্যাগী বীর সন্তানেরা। দৃঢ়তার অপর নাম বাগুজ। বীরত্বের অপর নাম বাগুজ। সাহসিকতার অপর নাম বাগুজ। আত্মত্যাগ ও কুরবানীর অপর নাম বাগুজ। উম্মাতের ভূলে যাওয়া এক ক্ষতের নাম বাগুজ। মু'মিনীনদেরকে পরিত্যাগ করা এবং সাহায্য বর্জন করার দৃষ্টান্তের নাম বাগুজ।

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! কিছুক্ষণের জন্য আপনাদেরকে নিয়ে যাই দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের ভূমি বাগুজে। ভূপৃষ্ঠের ছোট একটুকরো স্থান বাগুজ–যা ফুরাতের অববাহিকায় অবস্থিত। যুদ্ধের থাবায়ও এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য একেবারে বিলীন হয়ে যায়নি। তবে এর কোন কিছুই অন্য আর দশটা স্থান থেকে আলাদা নয়। তবে যে ক্ষেত্রে আলাদা তা হল - একদা ইরাক, শামের বিস্তৃত অঞ্চল খিলাফাহ'র অধীনে আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসিত হত কিন্তু পরবর্তীতে তা কুফফারদের নজিরবিহীন

বর্বর হামলার মুখে সংকুচিত হয়, আর সংকুচিত হওয়া স্থানগুলোর একটি বাগুজ। আর এই বিষয়টিই একে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কয়েক বর্গকিলোমিটার এলাকায় উম্মাতের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণকে অত্যাধুনিক সব সমরাস্ত্রে সজ্জিত আমেরিকার প্রক্সি যোদ্ধারা অবরোধ করে রেখেছে। স্থলে ওরা আর আকাশে আমেরিকার বিমানবাহিনী। খাদ্য ও অন্যান্য রসদ সামগ্রীর চরম সংকট। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে থাকা সত্ত্বেও মুজাহিদগণ আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসনকৃত ভূমি ছেড়ে পালিয়ে যাননি। ইসলামের সিংহগণ দৃঢ়পদ থেকেছেন, লড়াই চালিয়ে গেছেন। তালেবানের মত লাঞ্ছনাদায়ক চুক্তির কথা মাথায় আনেন নি। দ্বীনের ব্যাপারে কোন আপস করেন নি। স্রষ্টাকে অসন্তুষ্ট করে সৃষ্টির সন্তুষ্টির পিছনে ছুটেন নি। আক্বীদাহ-মানহাজ হতে এক চুলও বিচ্যুত হননি। তারা তাদের কৃত ওয়াদার ব্যাপারে অটল থেকে লড়াই চালিয়ে গেছেন–আলহামদুলিল্লাহ। এরপর এক পর্যায়ে কোন এক রাতে অনাহারী, অর্ধহারী মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর আমেরিকা নির্বিচারে ফসফরাস বোম নিক্ষেপ করে। দৃঢ়পদ মুসলিমদের মধ্য থেকে প্রায় তিন হাজারেরও অধিক নারী-পুরুষ ও শিশু নিহত হয়। সেদিন কুফফার মোড়ল আমেরিকার এই বর্বর হামলার মুখে কেউ এই স্বল্প সংখ্যক মুসলিমকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। না কেউ তাদের পক্ষ থেকে আওয়াজ পর্যন্ত তুলেছে। মু'মিনীনদেরকে পরিত্যাগ করার নিকৃষ্ট উদাহরণ তৈরি করেছে। সেদিন দাওলাহ পরাজিত হয়নি বরং পরাজিত হয়েছিল সাহায্য বর্জনকারীরা এবং পরিত্যাগকারীরা। কারণ আমরা কোন ধ্বংসশীল ভূমির জন্য যুদ্ধ করি না।

দাওলাতুল ইসলাম পরাজিত হয়নি, কারণ তা আজও শত্রুর হৃদয়ে বিদ্ধ খঞ্জর হয়ে টিকে আছে। দাওলাতুল ইসলাম পরাজিত হয়নি, কারণ কুফফারদের বিরুদ্ধে এর লড়াই চলমান। দাওলাতুল ইসলাম পরাজিত হয়নি, কারণ তা বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজের উপর টিকে আছে–আল্লাহর অনুগ্রহে। প্রকৃতপক্ষে পরাজয় হল যুদ্ধের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলা। দাওলাতুল ইসলাম কি তালেবানের মত যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণা করেছে? নাকি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেই বিলাদ আল-মাগরিব থেকে নিয়ে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত এর সৈনিকরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে? আমরা সবাই 'আসহাবুল উখদুদ'

এর ঘটনা জানি। একটি স্থানে থাকা সকল মুওয়াহহিদগণ নিহত হয়েছিলেন। এরপরেও আমাদের দয়ালু রব তার কুরআনে এটাকে মহা সফলতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে নিহত হওয়া মূলত বিফলতা, সমাপ্তি, পতন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু এটাকে মহা সফলতা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। কারণ কী? কারণ একটা হল দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ অপরটি মহাজ্ঞানী আল্লাহ ﷻ -এর দৃষ্টিকোণ। দুনিয়াবি দিক থেকে আসহাবুল উখদুদের ঘটনাকে তাদের পতন বা সমাপ্তি মনে হবে। কিন্তু আল্লাহ ﷻ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে তারা তাদের দ্বীনের উপর অবিচল থেকে মৃত্যুবরণ করতে পারাকে মহা সফলতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং হে মুওয়াহহিদ! আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বাগুজের ঘটনাকে দেখবেন তা আপনিই নির্ধারণ করুন!

প্রিয় পাঠক! আমরা আপনার সামনে কিছু পরিসংখ্যান পেশ করছি–যেন ময়দানের চিত্রগুলো আপনার স্মৃতিপটে স্পষ্ট হয়। কুফফার মিডিয়ার কারণে প্রাতারিত হবেন না। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِيۡبُوۡا قَوۡمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰى مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِيۡنَ﴾

“হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।”[16] যদি ফাসিক্বের ব্যাপারেই করণীয় এমন হয় তবে কাফির-মুরতাদদের ক্ষেত্রে কী করা উচিৎ!! যখন কায়সার আবু সুফিয়ানকে রাসুল ﷺ -এর মাঝে এবং কাফিরদের মাঝে সংঘটিত যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন তিনি বলেছিলেন, **"الحرب سجال والأيام دول"** যুদ্ধে কখনো এক পক্ষ কখনো অপর পক্ষ জয়ী হয় আর দিনসমূহ পরিবর্তিত হয়। আর দাওলাতুল খিলাফাহ’র যুদ্ধ চলছে যা আজ মধ্যগগনের সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। শত্রুর আধিক্যতা এবং নিজেদের উপায়-উপকরণের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও দাওলাহ দমে যায়নি। আল্লাহর রাস্তায় দাওলাহ’র সৈনিকগণ

16 সুরা হুজুরাতঃ০৬

যে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছেন–এর কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে যাননি এবং দূর্বলও হয়ে পড়েন নি। বিগত ২০১৬ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কেবল ইরাক ও শামের যুদ্ধে ৫৯৩০৯ জন কাফির মুরতাদ হতাহত হয়।

আর ১৪৩৯ থেকে ১৪৪৪ হিজরী তথা সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অর্থাৎ বিগত ছয় বছরে দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়ালি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন ‘আন-নাবা’ এর সূত্রমতে পৃথিবীব্যাপী দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের হামলা ও হতাহতের চিত্র নিম্নরূপঃ

১৪৩৯ হিজরী– হামলা: ২৯৮১

হতাহত: ১৯৯০০ জন

১৪৪০ হিজরী– হামলা: ৩৬৬৫

হতাহত: ১৫৮৪৫ জন

১৪৪১ হিজরী– হামলা: ৪৭২২

হতাহত: ১৫৫২২ জন

১৪৪২ হিজরী– হামলা: ২৯৪৪

হতাহত: ৮০৫২ জন

১৪৪৩ হিজরী– হামলা: ২১৭৯

হতাহত: ৭৫৯৭ জন

১৪৪৪ হিজরী– হামলা: ১০৯৭

হতাহত: ৩৭৭৮ জন

এতো গেল বস্তুগত কিছু পরিসংখ্যান যার মাধ্যমে আপনারা ইসলাম এবং কুফরের মিল্লাতের মাঝে চলমান যুদ্ধের একটি বাহ্যিক দিক সম্পর্কে অবহিত হলেন।

এই যুদ্ধের ভিতরগত অনেক দিক রয়েছে যার কিঞ্চিত আলোকপাত করব যদি আল্লাহ সহায় হোন।

দাওলাতুল ইসলামের যুদ্ধের মা'নাওয়ী পরিসংখ্যানঃ

১. দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ যে সমস্ত ভূখণ্ডে আল্লাহর অনুগ্রহে তামকীন লাভ করেছেন বিশেষভাবে ঐ সমস্ত অঞ্চলে এবং ব্যাপকভাবে পুরো পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজের প্রচার-প্রসার পেয়েছে। বিষয়টি বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেইঃ ইরাকী বাহিনী মাসুল শহরের দখল নেওয়ার পর সেখানে রাস্তায় ছোট এক বাচ্চা ছেলেকে এক ইরাকী আর্মির রাফিদী অফিসার বলেছিল, “তুমি আলীর নামে কসম কর।” তখন ঐ ছোট ছেলেটি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চোখের পানি মুছতে মুছতে বলেছিল, “আমি কিভাবে আলীর নামে কসম করব অথচ তিনি তো ইলাহ নন। আল্লাহ বাদে কারো নামে তো কসম করা যায় না।” একটি ছোট ছেলে কিন্তু বিশুদ্ধ আক্বীদাহ'র মজবুত শেকড় ওর হৃদয় ও মন-মস্তিষ্কের কতটা গভীরে পৌঁছে গেছে! একটি আগ্রাসী শত্রুর সেনা অফিসারের সামনেও ছোট ছেলেটি গাইরুল্লাহ'র নামে কসম করতে সম্যত নয়! প্রিয় ভাই! এটাই দাওলাতুল ইসলামের বড় সফলতা। এটাই মানুষের মাঝে দাওলাতুল ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজ প্রচার-প্রসারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন গল্প দাওলাহ'র ভূমিতে একটি দু'টি নয় হাজার হাজার রচিত হয়েছে—ওয়ালিল্লাহিল হামদু ওয়াল-মিন্নাহ।

২. খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের এবং বিশেষভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে। মালি, বুরকিনাফাসো, নাইজার, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, কঙ্গো, উগান্ডা, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, সিনাই, ক্বওক্বাজ, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাশ্মীর ও ফিলিপাইনের মুজাহিদগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইরাক-শামে দাওলাতুল খিলাফাহ'র অধীনে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। এছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ আছেন যারা খলীফাতুল মুসলিমীনের নেতৃত্বে একই লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছেন।

৩. পৃথিবীব্যাপী কুফফাররা নিরাপত্তাহিনতায় ভুগছে–আলহামদুলিল্লাহ। লাসভেগাস, প্যারিস, ব্রাসেলস, ম্যানচেস্টার এবং অস্ট্রিয়া–এ ধরনের প্রতিটি হামলাগুলোই একথা জানান দেয় যে, পৃথিবীর কোথাও তারা নিরাপদ নয়। এমনকি তাদের দেশেও নয়।

৪. ক্বিতালের মাধ্যমে যে মুসলিমদের জন্য গৌরব এবং বিজয় ফিরিয়ে আনা সম্ভব তা উম্মাহ'র সামনে আরেকবার প্রমাণ করেছে।

৫. কুফরের জাতিগোষ্ঠীর হুমকী-ধমকি, আক্রমণ, অবরোধ সত্ত্বেও নবুওয়াতের আদলে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা যায় তা উম্মাহ'কে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে। বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ মুসলিম উম্মাহ পরাজয়ের গ্লানি টানতে টানতে বিজয়ের স্বপ্ন দেখতেও ভুলে গিয়েছিল। যদিও কিছু কিছু জায়গায় উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে মুসলিমরা অস্ত্র ধরেছিল কিন্তু মুসলিমরা এর ফল ভোগ করতে পারেনি। প্রতিটি জায়গায় উপনিবেশিক শক্তি চলে যাওয়ার পর কাফির ও মুরতাদরা সেই ফল ভোগ করেছে। যেমন বাংলাদেশ, হিন্দ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়াসহ অন্যান্য স্থানে। এরপর আল্লাহর কিছু প্রকৃত বান্দা এই সমস্যা বুঝতে পেরে আবার যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে মোল্লা ওমার رحمه الله -এর নেতৃত্বে যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানিস্তানে ইসলামী সালতানাত প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া মুসলিমদের প্রতিটি ভূমিতে মুসলিমরা নির্যাতিত নিপীড়িত হতে থাকে হয় মুরতাদ কাফির নতুবা আসলী কাফিরদের হাতে। কিছু মানুষ সেই অবস্থা থেকে বেড়িয়ে আসতে কাফিরদের দেখানো পদ্ধতি গণতন্ত্রের দিকে দৌড়াতে থাকে। তারা চেষ্টা ও প্রচার-প্রচারণা চালাতে থাকে গণতন্ত্রের মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। আর বাদবাকি যারা জুলুম শোষণ থেকে মুক্তির জন্য অস্ত্রধারণ করে তারা সমাধানের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা, সংলাপ এবং সমঝোতাকেই একমাত্র পথ মনে করে। গেল কিছু বছর যাবৎ তালেবানের নেতাদের অনেকের বক্তব্য থেকে বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা মনে করে, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, আলোচনা, সমঝোতা করা ব্যতীত আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকে

হটানো সম্ভব নয়। কিন্তু এর বিপরীতে দাওলাতুল ইসলাম গোটা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, আলোচনার টেবিলে বসা, সমঝোতা করা ছাড়াই আমেরিকাকে হটানো এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। এটি একটি বিরাট অর্জন।

প্রিয় পাঠক! আপনি কি মনে করেন, একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কুফফাররা সন্তুষ্ট হবে? অথচ জাতিসংঘ সৃষ্টির অন্যতম একটি লক্ষ্য হল পৃথিবীর বুকে যেন আর কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হতে পারে সে লক্ষ্যে জোড় চেষ্টা চালানো! পরাজিত মানসিকতার লোকদের কাছে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা এক দিবা স্বপ্ন। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে ইরাকের মুজাহিদরা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদের জন্য একটি আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া সেই গৌরব। আর মুসলিমদের জন্য এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় দাওলাতুল ইসলাম। আমেরিকার মত এক পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিন বছরের শেষে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা–যা ছিল মুসলিমদের জন্য এক গৌরবের বিষয়। ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম ছিল পরিপূর্ণ নববী মানহাজের উপর। এই দাওলাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শামে তাদের রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ ঘটায়। শামের বিস্তৃত অঞ্চল মুজাহিদদের দখলে আসে। শামের প্রায় ৭০ শতাংশ মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। দাওলাতুল ইসলাম যতটুকু জায়গা দখল করেছে তা কেবলই যুদ্ধের মাধ্যমে দখল করেছে। আমরা বর্তমানে জিহাদের দাবিদার অনেককে দেখি, কেবল যুদ্ধের মাধ্যমে তামকীন প্রতিষ্ঠাকে তারা অসম্ভব বলে মনে করে। তালেবান যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে লাঞ্ছনাদায়ক শর্ত মেনে নিয়ে সরকার গঠন করেছে। যেহেতু তারা মনে করে, আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে আফগানিস্তান দখলে নেওয়া সম্ভব নয় তাই তারা গৌরবময় যুদ্ধকে পিছনে ফেলে আমেরিকার সন্তুষ্টমূলক শর্তের ভিত্তিতে আফগানিস্তানের ক্ষমতা নেয়। আপনি জানেন যে, দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অব্দি প্রতিবেশী কোন রাষ্ট্রের সাথে হাত মিলানো থেকে বিরত থেকেছে। আমরা দেখেছি, আরব-অনারবের তাগুত সরকাররা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে

কিভাবে যুদ্ধ করেছে। দাওলাহ’র প্রতিটি শহর কাফিররা অবরোধ করে রেখেছিল। কিন্তু তাতে দাওলাহ’র আমীর-উমারা ও সৈনিকদের হিম্মতে কোন প্রকার চিড় ধরেনি। বরং এই হুমকী-ধমকি ও অবরোধ তাদের ঈমানকে আরো বৃদ্ধি করেছে। তাদের জবানে প্রতিধ্বনিত হয়েছে মহান রবের এই বাণীঃ

﴿هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ ۫ وَ مَا زَادَهُمۡ اِلَّاۤ اِیۡمَانًا وَّ تَسۡلِیۡمًا ﴾

“আল্লাহ ও তার রাসুল আমাদের এরই ওয়াদা দিয়েছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসুল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।”[17] এতো কিছু সত্ত্বেও তারা শারীয়াহ’র কোন বিষয়ে চুল পরিমাণ ছাড় দেননি–প্রকাশ্যে হুদুদ বাস্তবায়ন, আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকার, কাফিরদের উপর জিযয়া আরোপ, মদ, জুয়া ও ধুমপান নিষিদ্ধকরণ, শারয়ী হিজাবের বাধ্যবাধকতা এবং মু’মিনদের প্রতি ওয়ালা ও কাফিরদের প্রতি বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ করাসহ শারীয়াহ’র প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন করেছেন। দাওলাহ’র তামকীনের অবস্থা তালেবানের অনৈসলামিক ইমারাতের মত নয়–যারা মনে করে, পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়নের কারণে প্রতিবেশী কাফির ও মুরতাদ সরকারদের পক্ষ থেকে সাহায্য সমর্থন বন্ধ হয়ে যাবে। অথচ রব্বে কারীম তার কালামে পাকে বলেন,

﴿وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ﴾

“আর যদি সে সব জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত তবে অবশ্যই আমরা তাদের জন্য আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।”[18]

তাই আমরা বর্তমানে তালেবানকে দেখি, আইসিসি টুর্নামেন্টের মত বিশ্ব জুয়ারি ক্রিকেটকে তারা নিষিদ্ধ করতে ভয় পায়, শারয়ী হিজাব বাদ দিয়ে মডারেটপন্থী হিজাবের অনুমোদন দেয়, মুসলিমদের উপর নির্যাতনকারী চীন,

[17] সুরা আহযাঃ ২২

[18] সুরা আরাফঃ ৯৬

রাশিয়া ও ভারতের[19] সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে, আন্তর্জাতিক আইন মানার ঘোষণা দেয় এবং জাতিসংঘের মত নিকৃষ্ট, ইসলাম ধ্বংসকারী জোটের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে ও জাতিসংঘের সংস্থাগুলোকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে কাজের সুযোগ দেয়। কারণ তালেবান মনে করে, যদি তারা এই ধরনের নিকৃষ্টতর কাজগুলো না করে তাহলে তারা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তাগুত সরকারদের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পাবে না, আর না পাবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি। কিন্তু দাওলাহ'র শাসনাধীন অঞ্চলে আপনি এরকম চিত্র পাবেন না। সম্মিলিত কুফফারদের বর্বরোচিত হামলা অবরোধ সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলো আল্লাহর নাযিলকৃত শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে চলেছে যা বর্তমান যামানার মুসলিম উম্মাহ'কে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছে খুলাফায়ে রাশিদাহ'র সোনালী যুগের কথা। কতই না মহান দাওলাহ'র শাসনাধীন শহরগুলোর চিত্র!

৬. জিহাদের ভুয়া দাবিদারদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বিশুদ্ধ আক্বীদাহ এবং সালফে-সালেহীনের মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত দাওলাতুল ইসলামের জিহাদের মাধ্যমে হক্ব উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই যারা ব্রিটিশদের অঙ্কিত মানচিত্র স্বাধীন করার জন্য লড়াই করে, জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়াই করে, এক তাগুতকে অপসারণ করে অন্য আরেক তাগুতকে প্রতিস্থাপন করার জন্য লড়াই করে অথবা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ হওয়া উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য যেকোনো উদ্দেশ্যে লড়াই করে অথচ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র দাবি করে তাদের দাবির অসাড়তা এবং হাকীকত প্রকাশিত হয়েছে। আমভাবে আল-কায়দা এবং তালেবানের পদস্খলন মুসলিমদের সামনে একদম স্পষ্ট। বিশেষভাবে শামে আল-কায়দা ও তার মিত্রদের এবং আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার বিচ্যুতি আজ সবারই জানা। আর এব্যাপারে অনেক ঘটনা ও প্রমাণাদি আছে যা উল্লেখ করার স্থান এটা নয়। বিচ্যুতি ও পদস্খলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী আল-কায়দার আমীর-উমারা তালেবান।

[19] একদিকে তালেবান বন্ধুত্ব করে ভারতের সাথে অপরদিকে বাঙ্গালী আল-কায়দা ভারত বিরোধী ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালায়।

এসব ঘটনা প্রবাহগুলো সবার সামনেই রয়েছে। আজ সবাই জানে তালেবানের শারীয়াহ বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের কথা–অনৈসলামিক ইমারাতের ক্রিকেট টিম তালেবানের পৃষ্ঠপোষকতায় খেলে যাচ্ছে! জাযিরাতুল আরব থেকে মুশরিকদের বের করে দিতে বলেছেন রাসুলে কারীম ﷺ আর তালেবান কাতারকে সফলভাবে ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করার জন্য অভিনন্দন জানায়।[20] এসব কারণেই আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে কারা ইসলামী শারীয়াহ'র প্রতিরক্ষা করে, কারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها -এর ইজ্জত রক্ষায় নিজেদের জান কোরবান করে, কারা নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে? আজ মুসলিম উম্মাহ'র সামনে স্পষ্ট– কারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها কে যিনার তুহমত দানকারী - ওয়াল ইয়াযুবিল্লাহ - রাফিদী শিয়াদেরকে রক্ষা করে, কারা আমাদের কলিজার টুকরা প্রিয় রাসুল ﷺ কে নিয়ে ব্যঙ্গকারী ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়, কারা উইঘুরে, হিন্দে মুসলিমদের নির্মম নিপীড়নকারীর সাথে হাত মেলায়?? আল্লাহর অনুগ্রহে এই বিষয়গুলো আজ একেবারেই স্পষ্ট।

প্রিয় পাঠক! আমরা দাওলাতুল ইসলামের চলমান যুদ্ধের বস্তুগত পরিসংখ্যান সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়ে এসেছি। সাথে সাথে স্বল্প বিস্তর কিছু মা'নাওয়ী পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছি। এখন আপনিই বলুন, দাওলাতুল ইসলাম কি পরাজিত হয়েছে? দাওলাতুল ইসলাম কি যুদ্ধ পরিত্যাগ করেছে? দাওলাতুল ইসলাম কি কুফফারদের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছে? আল্লাহর কসম! না, এর কোনোটি-ই হয়নি। প্রিয় ভাই! পরাজিত হওয়ার মানে কী? আপনি অবশ্যই জানেন আমাদের পূর্বসূরী শাইখুল মুজাহিদ ইউসুফ আল-উআইরী رحمه الله তার কিতাব **"ثوابت على درب الجهاد"** এ পরাজয়ের ৮টি ধরন উল্লেখ করেছেন। তা হল-

- ১। কুফফারদের পথ অনুসরণ করা।
- ২। কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া।

20 মোনাসেব জায়গায় তালেবানের রিদ্দাহ'মূলক কর্মকাণ্ড ও অপকর্ম উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

- ৩। কুফফারদের প্রতি ঝুঁকে পড়া।
- ৪। কুফফারদের আনুগত্য করা।
- ৫। হতাশ হয়ে পড়া।
- ৬। জিহাদের পতাকা ছেড়ে দেওয়া।
- ৭। সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেওয়া।
- ৮। শত্রুকে ভয় পাওয়া।[21]

বলুন তো পরাজয়ের এই ৮টি ধরনের মধ্যে কোনটি দাওলাহ’র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? যখন আমরা বিজয়কে ওহীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখব তখন আমরা অনুধাবন করতে পারব, যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে তারা কখনোই পরাজিত হবে না। বরং তারা সর্বদাই বিজয়ী হবে। তবে এক্ষেত্রে সব সময় শারীরিকভাবে বিজয়ী হওয়া শর্ত নয়। যেমনটা আমরা জেনেছি ‘আসহাবুল উখদুদ’এর ঘটনায় আল্লাহ সুবহানাহুর মূল্যায়ন থেকে। সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম পরাজিত হয়নি যেমনটা আবু সুলাইমান বুঝাতে চেয়েছে। বরং পরাজিত হয়েছে মুরতাদ তালেবান এবং এর মিত্ররা। কারণ যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার আদর্শ পরিবর্তন করে তাহলে সেটাই হল তার পরাজয়। আর তালেবান বদলে গেছে, এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল- মোল্লা ওমার رحمه الله -এর নেতৃত্বাধীন তালেবান ছিল মূর্তি ধ্বংসকারী। আর বদলে যাওয়া তালেবান হল মূর্তি প্রতিরক্ষাকারী। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله -এর তালেবানের কাছে একজন মুসলিমের মূল্য একটি ইসলামী ইমারাতের চাইতেও বেশি ছিল। এজন্যই তারা শাইখ উসামা رحمه الله কে আমেরিকার হাতে তুলে দেয়নি। আর বর্তমান তালেবান মূলত ক্ষমতায় এসেছে জিহাদের দাবিদার কোন দল যেমন- আল-কায়দা এবং দাওলাহ’কে আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করতে দেবে না ও এদেরকে পরিপূর্ণরূপে নিধন করবে এই শর্ত মেনে নিয়ে। যেহেতু তালেবান বদলে গেছে এবং তালেবানের আদর্শ পরিবর্তন হয়েছে তাই

---

21 বিস্তারিত "ثوابت على درب الجهاد" কিতাব থেকে দেখে নিতে পারেন।

তালেবানই পরাজিত হয়েছে। ইউ.এস রিপোর্ট এবং ওয়ার্ল্ড রিপোর্টের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, ইউ.এস গভর্নমেন্ট মুসলিম বিশ্বের হৃদয় ও মন জয় করতে কতখানি তৎপর যা সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের একটি অখণ্ড অংশ। বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধের এই অদৃশ্য অংশ যুদ্ধক্ষেত্রের মত একই রকমভাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ অথবা তার চেয়ে কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ? এটা প্রকাশ করে আমেরিকার সরকার মুসলিম মৌলবাদীদের সাথে একই সাথে বসতে ও কাজ করতে আগ্রহী, যদি তারা দু’টি বিষয় মেনে নেয়ঃ গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী চলতে রাজি হয় এবং সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে তাদের একটি অংশ হিসেবে কাজ করে। আমেরিকা সবসময়ই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে চলমান জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ নাম দিয়ে এর বিরুদ্ধে সবাইকে তাদের সাথে কাজ করতে বলে থাকে। অনেক মুসলিম এবং নামধারী ইসলামিক সংগঠন আছে যেমন- তালেবান–যারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তারা আমেরিকার সরকারের সাথে কাজ করার ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। তাদের পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তি হল তারা (কথিত) ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠার জন্য এমন করছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাধারণ উক্তি ছাড়া কিছুই না যা যেকোনো উপলক্ষে ব্যবহার করা যায়, এমনকি যদি তা ইসলামের নামেও হয়। তথাপি তালেবান কুফফারদের তরফ থেকে কী অর্জন করেছে তা কোন বিষয়ই না। তা নিতান্তই মূল্যহীন। আল্লাহর এমন মানুষের প্রয়োজন নেই যারা নিজ দ্বীন নিয়ে ক্ষমতা এবং সম্মান লাভ করার জন্য কুফফারদের সাথে আপোষ করে।

প্রিয় পাঠক! আমেরিকা ২০০১ সালে কেন আফগানিস্তানে হামলা চালিয়েছিল? কারণ কি এটা ছিল না যে, শাইখ উসামা ﵀ কে আমেরিকার কাছে তুলে দিতে মোল্লা ওমার ﵀ -এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা? তখন আমেরিকার চাহিদা ছিল আফগানিস্তান যেন তাদের ভাষায় সন্ত্রাসীদের[22] ঘাটিতে পরিণত না হয় এবং শাইখ উসামা বিন লাদেন ﵀ কে যেন ওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার ﵀ কি ওদের দাবি পূরণ করেছিলেন? তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। যে দাবি মানতে বাধ্য করার জন্য আমেরিকা ও তার ন্যাটোজোট

[22] সন্ত্রাসীদের অর্থাৎ হক্বপন্থী মুজাহিদদের।

আজ থেকে ২২ বছর আগে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালিয়েছিল সেই দাবিই বর্তমান তালেবান মেনে নিয়েছে। শুধু লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানমূলক এই শর্ত মেনেই নেয়নি বরং তারা তা কাজে বাস্তবায়ন করে আমেরিকা ও এর মিত্রদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছে। মোদ্দাকথা যে দাবি না মানার কারণে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, ২০ বছর পর তা মেনে নেওয়া কি পরাজয় নয়? জি হ্যাঁ! এটাই প্রকৃতার্থে সুস্পষ্ট পরাজয়। যতই মোহনীয় কণ্ঠে একে ফাতহে মুবীন বলে প্রচার চালিয়ে এই সুস্পষ্ট পরাজয়কে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করুক না কেন আসলে তা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়।

কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া কি পরাজয় নয়? অবশ্যই কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়া মানে পরাজিত হওয়া। তাই তালেবান পরাজিত হয়েছে। কারণ তালেবান জাতিসংঘ নামক কুফরি সংঘের সদস্য হতে চেয়েছে। আর এটা কাফিরদের প্রাধান্য মেনে নেওয়ার নামান্তর।

জিহাদ ছেড়ে দেওয়া কি পরাজয় নয়? নিশ্চিতভাবেই জিহাদ পরিত্যাগ করা মানে পরাজিত হওয়া। শত্রুরা আমাদের কাছে কী চায়? তারা চায় আমরা যেন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দেই। তাই নয় কি? কাফিররা চায় আমরা যেন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করি আর আমরাও ওদের চাওয়া মত কাজ করলাম। তাহলে এটাই তো পরাজয়। আর আমরা জেনেছি যে, তালেবানের এক মুফতী ফাতাওয়া দিয়েছে - আফগানিস্তানের বাইরে জিহাদ করা বৈধ নয়। তাহলে তালেবানের ফাতাওয়া অনুযায়ী আফগানিস্তানের বাইরে কোন জিহাদ নেই। আর তাদের নেতা জবিহুল্লাহ মুজাহিদ কাবুল দখলের পরই ঘোষণা করেছিল, আমাদের যুদ্ধ শেষ। অথচ রাসুল ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মাতের একদল লোক হক্বের উপর দৃঢ় থেকে বিজয়ীরূপে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকবে।” যুদ্ধ ক্বিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। অপরদিকে তালেবানের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু তালেবান যুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছে তাই তারা পরাজিত হয়েছে। তালেবান পরাজিত হয়েছে, কারণ শাইখুল মুজাহিদ ইউসুফ আল-উআইরী رحمه الله বলেছেন সামরিক বিজয়ের আশা ছেড়ে দেওয়াটাও এক ধরনের পরাজয়। তালেবান ক্বিতালের মাধ্যমে বিজয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা, আলোচনা, সমঝোতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং এর মাধ্যমেই সমাধান

খুঁজছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আফগানের শিরকী জাতীয়তাবাদী ১০৪ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেওয়া মৌলভী আব্দুল কাবীরের (উপ প্রধানমন্ত্রী) বক্তব্যে। সুতরাং তালেবান পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আবু সুলাইমানের চক্ষুদ্বয়ের সামনে পর্দা থাকার কারণে এই সুস্পষ্ট পরাজয় দেখতে সক্ষম হয়নি।

দাওলাতুল ইসলামের যুদ্ধের মানা'ওয়ী পরিসংখ্যানের আরো একটি হল-

৭. দাওলাতুল ইসলাম একটি সোনালী প্রজন্ম গড়ে তুলেছে–যাকে আমরা 'তামকীনের প্রজন্ম' হিসেবেও উল্লেখ করতে পারি। তামকীনের প্রজন্ম সম্পর্কে আপনাদের ধারণা দিতে উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকার একজন সিংহশাবকের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি– "আমাদের এই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমরা নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত এ বরকতময় খিলাফাহ'র অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবো এবং সমগ্র কাফির জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" কথাগুলো কোন সিরাত ও মাগাযী সংক্রান্ত কিতাব থেকে চয়নকৃত নয়, কিংবা ইসলামী ইতিহাস থেকে বাছাইকৃত কোন দিগবিজয়ী কমান্ডারের বক্তব্য নয়। কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে দিগবিজয়ীদের বংশধর এবং অগ্রগামীদের উত্তরাধিকারী এক সিংহশাবকের মুখে, যে উলায়াত পশ্চিম আফ্রিকায় খিলাফাহ'র সিংহশাবকদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্প্রতি পাশ করে বের হয়েছে। দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমদের ইতিহাসের গৌরবময় ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে এবং স্মৃতির জগৎ থেকে বের করে হুবহু প্রথমবারের মতোই একে বাস্তবায়িত করেছে। এসব তারই ফসল। ক্রুসেডাররা ভেবেছিল, ইরাক ও শামসহ অন্যান্য উলায়াতে খিলাফাহ'র সিংহশাবকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে টনে টনে বোমা বর্ষণ করে সেগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তারা মুজাহিদগণের হৃদয়ে থাকা তাওহীদের অগ্নিশিখা নিষ্প্রভ করে ফেলেছে এবং খিলাফাহ'র সৈনিক ও কমান্ডারগণের রক্ত ও ছিন্নভিন্ন দেহখণ্ড দ্বারা নির্মিত তাক্বওয়ার ভিত্তি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয়েছে। তারা ধারণা করেছিল যে, তারা সেই শরিয়াহ'র আলো নিভিয়ে দিয়েছে, যার জন্য ঈমান ও কুফরের শিবিরের মাঝে এ যাবৎকাল শতশত যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তার

আলো পূর্ণ করেই ছাড়বেন; যদিও কাফির, ক্রুসেডার, মুরতাদ ও মুনাফিকরা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ ﷻ বলেন:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

“তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তা হতে দিবেন না, তিনি তার আলো পূর্ণ করেই ছাড়বেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।”[23]

সাম্প্রতিক সময়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কাফির জোট এক তীব্র যুদ্ধ পরিচালনা করে। এতে তারা বর্বরোচিত বিমান হামলা চালিয়ে বসতবাড়ি ও দালানকোঠা সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং নারী-পুরুষ ও শিশুদের লাশে আকাশ-বাতাস ভারি করে তোলে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহে ঈমান ও তাক্বওয়ার ভিত্তিকে ভেঙ্গে দিতে তারা ব্যার্থ হয়েছে। কেননা তাদের শক্তি-সামর্থ্য, জুলুম-অত্যাচার ও ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র শুধুমাত্র শারিরীক কষ্টই দিতে পারে। তাওহীদের দুগ্ধ পানে হৃষ্ট-পুষ্ট ও ঈমানদীপ্ত আত্মার কাছে পরাজিত হয় প্রতিটি ক্রুসেডার সমরাস্ত্র। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের শরীর ভেদ করে যায় কিন্তু তাদের অন্তরে অবস্থিত আক্বীদাহ’র দূর্গ ভেদ করতে পারে না। এমনই ইস্পাত -দৃঢ় দূর্গসমূহের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দাওলাতুল ইসলাম। ফলশ্রুতিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর অঙ্কিত রেখাপথ ধরেই অবিচলভাবে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে এ রাষ্ট্র। যে পথে চলেছেন খুলাফায়ে রাশিদীন, এবং সমস্ত সাহাবা ও তাবেঈগণ—আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন। সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, “রাসুলুল্লাহ একটি সরল রেখা টেনে আমাদেরকে বললেন, এটা হল আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর রেখাটির ডানে ও বামে আরও কতগুলি রেখা টেনে বললেন, আর এগুলো হলো অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা; এসকল রাস্তার প্রত্যেকটির উপর একটি করে শয়তান রয়েছে, তারা লোকদেরকে এর দিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি পাঠ করলেনঃ “এবং এটি আমার (আল্লাহর) সরল-সঠিক পথ।

23 সুরা তাওবাঃ ৩২

সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।"[24]

খিলাফাহ'র সৈনিক ও কমান্ডারগণ আজ রাসুলের অঙ্কিত সেই সরল পথেই চলছেন। তাদের পর তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে খিলাফাহ'র সিংহশাবক ও ঈমানের মুকুলেরাও এ পথে চলবে। তারা হলো উৎকৃষ্ট বীজ হতে সৃষ্ট উৎকৃষ্ট তামকীনের প্রজন্ম, যাদের পরিচর্যা করা হয়েছে তাওহীদের স্বচ্ছ ঝর্ণার পানি দ্বারা।

আমরা কথা বলছি সেই তামকীনের প্রজন্মকে নিয়ে, যাদেরকে নির্মূল করে দিতে উদ্যত হয়েছিল দাম্ভিক পশ্চিমা গোষ্ঠী আর তাদের ইহুদী সাঙ্গপাঙ্গরা। এই লক্ষ্যে তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায় একাধারে মসুল, ফাল্লুজা, রাক্কাহ, বারাকাহ, খায়ের, মারাওয়ী, সিরত, সিনাই ও বাগুজসহ আরো বহু জায়গায়। আর এ তালিকা এখনও দীর্ঘায়িত হচ্ছে। কিন্তু অপরদিকে যমীনের অন্য প্রান্তে একই বীজের অঙ্কুরোদগম দেখা গেলো এবং তা ডালপালা গজিয়ে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হলো।

খিলাফাহ'র সৈনিকদের সাম্প্রতিক যুগের মহাযুদ্ধগুলোতে, বিশেষ করে ঈমান ও অবিচলতার ভূমি বাগুজের যুদ্ধে তামকীনের প্রজন্ম ও খিলাফাহ'র চারাসমূহের নিদর্শন চমৎকারভাবে উদ্ভাসিত হয়। সম্মানের বংশধর ও গৌরবের অবশিষ্টাংশ এই সিংহশাবকদের মাঝে ইয়াসিরের পরিবারের ন্যায় সাহসীকতা, দৃঢ়তা ও অবিচলতার পুনারাবৃত্তি হতে দেখে জ্ঞানীরা বার বার ফিরে তাকায় অবাক বিস্ময়ে।

ক্যামেরায় ধারণকৃত বাগুজের কিছু দৃশ্যে দেখা যায়, যুদ্ধের চরম বিভীষিকাময় পরিস্থিতির মধ্যেও খিলাফাহ'র আরব-অনারব সিংহশাবকেরা ভরপুর উদ্দীপনার সাথে জামাআতে সালাত কায়েম করছে এবং সুস্পষ্ট ভাষায় তাওহীদের ঘোষণা দিচ্ছে—যার শিক্ষা তারা পেয়েছে খিলাফাহ'র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলোতে। আমাদের যামানায় এগুলো এতই বিরল ও অস্বাভাবিক যে, ভিডিও প্রমাণ না থাকলে বহু মানুষ এগুলোকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উড়িয়ে দিত। যেভাবে সাহাবী

[24] ইমাম তিরমিযী হাদিসটি বর্ণনা করে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ও তাবেঈদের প্রজন্মের বহু ঘটনা তারা অবাস্তব আখ্যায়িত করে উড়িয়ে দেয় কিংবা সেগুলোর সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, এখানে আল্লাহর পরিকল্পনা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে তার সুকৌশল পরিলক্ষিত হয়। কেননা দৃশ্যগুলো বেশির ভাগ স্বয়ং কাফিরদের মিডিয়া কর্তৃক ধারণকৃত। কাফিরদের মিডিয়াসমূহের মাধ্যমেই আল্লাহ বিশ্ববাসীকে এই ভীতিপ্রদ দৃশ্যগুলো দেখালেন, যেখানে ফুটে উঠে এই অনুপম প্রজন্মের বিরত্ব ও সাহসীকতাপূর্ণ অবস্থান। ফলে তাদের ধারণকৃত দৃশ্যগুলো তাদেরই বিপক্ষে সত্যের সাক্ষী হয়ে থাকলো। এটিই হলো সেই তামকীনের প্রজন্ম, আল্লাহর ইচ্ছায় যে প্রজন্ম সমস্ত ক্রুসেডার রাষ্ট্র ও মুরতাদ সরকারগুলোর ঘুম কেঁড়ে নিয়েছে। এই প্রজন্মকে তারা নাম দিয়েছে ‘টাইম বোম’। এই প্রজন্ম শুধু কুরআন-সুন্নাহর নির্মল ঝর্ণার পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করেনি। আল্লাহর ইচ্ছায় এই প্রজন্মের হাতে কাফিররা যে করুণ পরিণতি ভোগ করতে যাচ্ছে, হয়তো তারই পূর্বাভাস বহন করে এই ‘টাইম বোম’ বিশেষণটি।

তীব্র যুদ্ধ ও সংঘাত সত্ত্বেও মহান আল্লাহর তাওফীক্ব ও হিদায়াতে দাওলাতুল ইসলামের আমীরগণ এই প্রজন্ম তৈরী করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতঃপর তামকীনপ্রাপ্ত প্রতিটি ভূখণ্ডে তারা খিলাফাহ’র সিংহশাবকদের জন্য ইনস্টিটিউট ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু করেন। ফলে তৈরী হলো এমন এক প্রজন্ম, বিকৃতিকারীদের বিকৃত মানহাজ, বিদাআতীদের বিদআত, আইন প্রণেতাদের গণতন্ত্র কিংবা উদভ্রান্ত জঞ্জালদের বাতিল আহ্বানে যাদের ফিতরাত কলুষিত হয়নি। এমন এক প্রজন্ম, যারা বেড়ে উঠেছে আল্লাহর জন্য মিত্রতা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা তথা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা’র উপর। এই প্রজন্ম সুরা তাওবাহ ও সুরা আনফালের প্রজন্ম। বহু পাহাড় যেখানে ধ্বসে গেছে, বহু পুরুষ যেখানে হার মেনেছে, সেখানেই দৃঢ়পদে অবিচল দাঁড়িয়ে ছিলো এ প্রজন্ম। এটি এমন এক প্রজন্ম, যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে প্রস্তুত করছেন বাতিলের শিবিরের বিরুদ্ধে সত্যিকার যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, সে যুদ্ধ বিশ্বের যে প্রান্তেই হোক না কেন। কোন মেকি-কপটাচারী যুদ্ধের জন্য নয়, যা মাটির টান ও সীমানাপ্রাচীরে আবদ্ধ ও শিথিল হয়ে

যায়। এটি এমন এক প্রজন্ম, যা কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এটি এমন এক প্রজন্ম, যারা বলে: "বন্দীদের মুক্ত করা, মাসজিদুল আকসা ও হারামাইন পুনরুদ্ধার করা এবং রোম ও আন্দালুস বিজয়ের একমাত্র পথ হলো জিহাদ।"...এটি এমন এক প্রজন্ম, যা প্রথম দিন থেকেই কথায় ও কাজে পরিপূর্ণ তাওহীদের উপর বেড়ে উঠেছে। ফলে দেশাত্মবোধ জাতীয়তাবাদ, গোত্রীয় জাতীয়তাবাদ, শান্তিবাদ কিংবা কোনো অসাড় চিন্তা-চেতনার কালো ধোঁয়া তাদেরকে স্পর্শ করেনি। এ প্রজন্ম বিশ্বাস করে, তাওহীদ-ই হলো সবচেয়ে বড় স্বার্থ (মাসলাহা)। আর শির্ক-ই হলো সবচেয়ে বড় অনিষ্টতা (মাফসাদা)। এ প্রজন্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাদেরই এক কর্ণধার বলেন: "হে ক্রুসেডাররা! তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো, যারা তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে এমন এক প্রজন্ম, যারা লাঞ্ছনা ও বশ্যতার অর্থ জানে না। যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বুঝে না; হয় বিজয় নয়তো শাহাদাহ।"

ইরাক ও শামসহ বহু অঞ্চলে ক্রুসেডাররা ইয়াসির, আম্মার ও সুমাইয়াদের - আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন- বংশধরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং বিভীষকাময় ক্যাম্পসমূহে তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেননি। তাদের কুরবানীর ফল ধরেছে সুদূর আফ্রিকাতে। সেখানে বিলাল ইবনে রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর উত্তরাধীকারীরা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছেঃ "আমাদের পূর্ব পুরুষরা যার উপর বেঁচে ছিলেন, আমরাও তা-ই আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবো। আর তা হলো- দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং ইসলামী খিলাফাহ বিনির্মাণ। তারা যার উপর মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা তার উপরই মৃত্যুবরণ করবো। আমাদের ক্ষতবিক্ষত দেহাবশেষ দ্বারা যেন তৈরি হয় এই খিলাফাহর অবকাঠামো।" এটাই দাওলাতুল ইসলামের চলমান যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উৎকৃষ্ট ফলাফলসমূহের মধ্যে অন্যতম।

হে আমার সম্মানিত ভাই! আপনি জেনে রাখুন, তামকীনের প্রজন্মের এই তুফান আফ্রিকার সীমান্তের মধ্যেই থেমে যাবে না। ইতিপূর্বে যেমন ইরাক ও শামের সীমানায় তা থেমে যায়নি। এই তুফান বিশ্বের এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে, এক

অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে আঘাত হানবে। এই অভিজাত সিংহশাবকেরা তাওহীদের কুঠারাঘাতে তাগুত ও উলামায়ে সূ'দের রোপনকৃত শিরকের বৃক্ষরাজির মূলোৎপাটন করবে। ইসলামের সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকবে এর বীর সৈনিকদের হাত ধরে, যারা এর জন্য উৎসর্গ করেছেন নিজেদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি। দ্বীনের কোনো ধরনের সম্ভ্রমহানি তারা মেনে নেননি। অতঃপর গোটা দুনিয়া তাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে। কেননা তারা আঁকড়ে ধরেছেন আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর মানহাজ ও তার শিক্ষাসমূহ। এর উপর ভিত্তি করেই তারা মিত্রতা ও শত্রুতা করেছেন। এর নির্দেশ মোতাবেক যুদ্ধ করেছেন এবং এর নির্দেশিত সরল পথে চলেছেন। অতঃপর তাদের অগ্রবাহিনী ইরাক ও শামের ভূমি থেকে পৌঁছে গেছে আফ্রিকা ও পূর্ব এশিয়ায়। এবং “এ দ্বীন সম্প্রসারিত হবে ততদূর পর্যন্ত, যতদূর পর্যন্ত রাত ও দিন পৌঁছায়।” এই হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সুসংবাদ। এই হলো মু'মিন বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা। আর আল্লাহ স্বীয় ওয়াদার খেলাফ করেন না।

আল-হোল ও অন্যান্য ক্যাম্প এবং কারাগারসমূহে অবস্থানরত হে ঈমান ও অবিচলতার মূর্ত প্রতীক বোনেরা! আপনারা সবর করুন! হে জ্বলন্ত অঙ্গার আঁকড়ে ধারণকারিণীগণ! আপনারা সবর করুন! আল্লাহ-ই আপনাদের জন্য যথেষ্ট। হে ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিপালনকারীণীগণ! আপনারা সবর করুন এবং বিপদাপদে দৃঢ়তা অবলম্বন করুন! হে আম্মারের মা ও সাফিয়্যাহ'র বোন! আপনারা সবর করুন আপনাদের প্রতিদান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে! আল্লাহ আপনাদেরকে ইজ্জত ও কল্যাণের সাথে মুক্তি দান করুন! আমীন! দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ আপনাদের মুক্ত করতে চেষ্টার কোন কমতি করছেন না। আল্লাহর কসম! আপনাদের ভাইগণ আপনাদের ভুলে যাননি। কিভাবেই আপনাদেরকে ভুলে যাবেন, আপনারা তো আমাদের-ই হৃদয়ের গভীরের একটি ক্ষত। আপনারা বরাবরের মতই আল্লাহর ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবেন। আমাদের রব বলেন, “নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে রয়েছে স্বস্তি।” যারা নিজেদেরকে উম্মাহ দরদী হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করে তারা আপনাদের উপর দিয়ে ঘটে যাওয়া বর্বর জুলুম এবং নির্যাতনের ব্যাপারে

একটি বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি। আর না আপনাদের নির্যাতনের সংবাদগুলো তারা প্রচার করেছে, কেমন যেন মনে হয় তাদের নিকট আপনারা উম্মাহ’র অংশ-ই না। আপনাদেরকে এমন পরিত্যাগ করার কারণ শুধুমাত্র একটাই; আপনারা যে দাওলাতুল ইসলামের শাসনে শারীয়াহ’র ছায়াতলে বসবাস করতেন! তাই আপনাদের নিয়ে কেউ কথা বলে না! তাই আপনাদের ব্যাপারে কেউ প্রতিবাদ করে না! হায় এ কেমন পরিত্যাগ!! এ কেমন সাহায্য বর্জন করা!! যে সমস্ত শাইখদের অন্তর ব্যথিত হয় কিসাস হিসেবে মুরতাদ পাইলটদের দাওলাহ কর্তৃক পুড়িয়ে মারার কারণে, তারা মুসলিমদের হত্যাকারীদের ব্যাপারে মায়াকান্না করে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে তাদের বিবেক কোথায় হারিয়ে গেল?! কোথায় মিডিয়ায় তাদের চেঁচামেচি? শুধু কি তাই! যে ভয়াবহ রাতে আপনাদের মধ্য থেকে তিন হাজারেরও বেশি জনকে হত্যা করা হয়েছে তখন উম্মাহ’র কথিত দরদীরা ব্যাপক উৎফুল্ল হয়েছিল তাদের ভাষায় খারিজীদের রাষ্ট্র(!!) পতন হওয়ার কারণে। আপনারা আমাদের দুর্বলতা। এজন্যই উম্মাহ’র কথিত এই দরদীরা সাহায্য বর্জন করার সাথে সাথে আমাদের হৃদয়ের পুরাতন ক্ষততে আঘাত দিয়ে আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। পরিশেষে, হে আমাদের মাজলুম মা ও বোনেরা! আপনারা সবর করুন! অচিরেই আল্লাহ আপনাদের জন্য কল্যাণকর মুক্তির ব্যবস্থা করবেন।

চিঠির বক্তব্যঃ “সুবহানাল্লাহ। কি হওয়ার ছিল, কি স্বপ্ন ছিল, আর কি হল?”

ডাক্তার সাহেব ভোল পাল্টানোর পূর্বে যে বক্তব্যগুলো দিয়েছিলেন তা সম্পর্কে আবু সুলাইমান ভালোভাবে ওয়াকিফ হাল না–এটা তার কথা থেকেই বুঝা যায়। সে ডাক্তার যাওয়াহিরী সাহেবের

- ست سنوات على غزو العراق
- حقيقة الصراع بين الإسلام والكفر
- اللقاء المفتوح-الحقة الثانية
- اللقاء الرابع مع مؤسسة السحاب

এই বক্তব্যগুলোর ব্যাপারে জানে না। হয়তোবা আবু সুলাইমান ইরাকে আমেরিকার

আক্রমণের ফলাফল নিয়ে ইমাম আনওয়ার আল-আওলাক্বী ﵀ কী বলেছিলেন তা জানে তথাপি তার বিবেক আচ্ছাদিত হয়েছে। তাই দ্বিপ্রহরেও যারা সূর্যের উদিত হওয়ার ব্যাপারে বে-খবর তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলতে চাই, যা হওয়ার ছিল, যা স্বপ্ন ছিল, তাই হয়েছে অর্থাৎ খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হওয়ার ছিল এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিল মুসলিম উম্মাহ আর সেই বহুল কাঙ্ক্ষিত খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হল– আল্লাহর অনুগ্রহে।

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হওয়ারই ছিল কারণ ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী حقيقة الصراع بين الإسلام والكفر শিরোনামের বক্তব্যে বলেছেন, “এই দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ-ই ফিলিস্তিন মুক্ত করার দ্বার উন্মোচন করবে এবং ইসলামী খিলাফাহ’র রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করবে।” তাহলে ডাক্তার সাহেব যা হওয়ার আশা করেছিলেন দাওলাহ’র ব্যাপারে তাই কিন্তু হয়েছে–আলহামদুলিল্লাহ! খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিল উম্মাহ– পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুজাহিদগণ এ স্বপ্নকে বুকে লালন করেই ক্বিতাল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যার প্রমাণ মেলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা আসার সাথে সাথেই মাশরিক্ব থেকে মাগরিবের সকল মুজাহিদদের খিলাফাহ’র কাফেলায় শরীক হওয়ার মাধ্যমে। আনওয়ার আল-আওলাক্বী ﵀ এই দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র ব্যাপারে বলেছিলেন, “এখন তারা দাওলাতুল ইসলামের প্রকল্প নিয়ে এগুচ্ছে, যা খিলাফাহ’র দিকে অগ্রসর হবে। ভাই ও বোনেরা! আমরা ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছি রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সেই হাদিসের চুরান্ত অংশেঃ ستكون خلافة على منهاج النبوة অচিরেই নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ আসবে।” অবশেষে অপেক্ষার দীর্ঘ প্রহর শেষে লাঞ্ছনা আর বঞ্চনার কালো রাত্রি পেড়িয়ে ১৪৩৫ হিজরীর ১লা রমাদানে উম্মাহ’র ভাগ্যাকাশে খিলাফাহ’র সূর্য উদিত হয়েছে–সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

যেকোন মানুষ যেকোন কিছু আশা করতে পারে, স্বপ্ন দেখতে পারে এটা নিছক ঐ ব্যক্তির ব্যাপার। ব্যক্তি যে মানের হবে তার চাওয়া পাওয়া এবং স্বপ্ন ঐ মানেরই হবে। তাই আবু সুলাইমান কোন মরীচিকার স্বপ্নে বিভোর ছিল তা আল্লাহই ভালো জানেন। প্রিয় পাঠক! আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না যে, আমাদের পথ

আলোকিতকারী অগ্রজ আনোয়ার আল-আওলাক্বী রহিমাহুল্লাহ দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ-ই খিলাফাহ’র দিকে অগ্রসর হবে–এমন স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন। আজ সেই নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত।

চিঠির বক্তব্যঃ “২০১৩ সালের শুরুটাও কতইনা চমৎকার ছিল।”

আবু সুলাইমানের উপরোক্ত কথা থেকেই বুঝা যায় যে, সে তামকীন আর প্রভাব-প্রতিপত্তির ধোঁকায় পড়ে গিয়েছিলো এবং যেখানে দুনিয়াবি সফলতা চোখে পড়েছে সেখানে যোগ দিয়েছে। দাওলাহ’র আক্বীদাহ-মানহাজ না বুঝেই দাওলাহ’কে বাইআত দিয়েছিল, আক্বীদাহ-মানহাজ তাকে টানেনি বরং বাহ্যিক চাকচিক্যই মনে ধরেছে আবু সুলাইমানের। তাই যখন বাহ্যিক চাকচিক্য বিলীন হয়ে গেছে এবং আমরা ইবতিলার মারহালায় উপনীত হয়েছি তখন ঘোরের মধ্যে থাকা ব্যক্তিদের যা হওয়ার ছিল তাই হল। যারা এই পথের হাকীকত জানে না তারা পদস্খলিত হবে এটাই স্বাভাবিক। অদূরদর্শী ব্যক্তিরা সাময়িকভাবে আপতিত দুঃখ কষ্টের পিছনে লুকায়িত বাস্তবতা দেখতে পায় না। আর এ কারণেই তারা প্রাতারিত হয়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, “মূর্খের দৃষ্টি প্রাথমিক অবস্থা ভেদ করে এর ভিতরের মূল লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছায় না। অপরদিকে বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি, সবসময় প্রাথমিক পর্দার আড়ালে থাকা মূল লক্ষ্যের দিকে খেয়াল করে। ফলে পর্দার অন্তরালে বহু দূরের পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় লক্ষ্যগুলো সে তখনই দেখতে পায়।... তবে এই অবস্থা তৈরির জন্য প্রয়োজন এমন ইলম–যা প্রাথমিক অবস্থাতেই এর পিছনে থাকা লক্ষ্যকে বুঝতে সাহায্য করে এবং এমন ধৈর্য শক্তি থাকা প্রয়োজন–যা সেই লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে পথের কষ্ট সহ্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাই ইয়াক্বীন আর সবর না থাকলে এটা সম্ভব নয়। যদি তার ইয়াক্বীন সুদৃঢ় হয় এবং সবর শক্তিশালী থাকে, তাহলে কল্যাণ অর্জনের পথে যে কোন কষ্ট সহ্য করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়।”[25]

আর পরীক্ষা–এটা তো নাবীগণের-ই সুন্নাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যুগে যুগে প্রত্যেক

[25] আল-ফাওয়াইদ

নাবীকে পরীক্ষা করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَيۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَآءُۖ وَلَا يُرَدُّ بَأۡسُنَا عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ ۝

"অবশেষে যখন রাসূলগণ (তাদের সম্প্রদায়ের ঈমান থেকে) নিরাশ হলেন এবং লোকেরা মনে করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের কাছে আমাদের সাহায্য আসল। এভাবে আমরা যাকে ইচ্ছে রক্ষা করি। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না।"[26] ইমাম সা'দী رحمه الله বলেন, "আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সম্মানিত রাসুলগণকে প্রেরণ করেন। অতঃপর পাপিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দেন তারা যেন হক্বের নিকট ফিরে আসে। তিনি তাদেরকে অবকাশ দিতেই থাকেন যতক্ষণ না তাদের পক্ষ থেকে রাসুলগণ চূড়ান্ত কষ্টে পৌঁছায়। এমনকি রাসুলগণ - তাদের পূর্ণ ইয়াক্বীন এবং আল্লাহর ওয়াদা ও হুমকীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস সত্ত্বেও - কখনো কখনো তাদের অন্তরে হতাশা এবং ইলম ও বিশ্বাসের দুর্বলতা উদয় হয়। অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে "তখন তাদের নিকট আমাদের সাহায্য আসে। ফলে যাকে ইচ্ছা আমরা তাকে রক্ষা করি" আর তারা হলেন রাসুলগণ এবং তাদের অনুসারীগণ। "আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি প্রতিরোধ করা হয় না" অর্থাৎঃ আমার আযাব ফিরিয়ে নেওয়া হয় না যে অপরাধ করে এবং আল্লাহর উপর স্পর্ধা দেখায়। আর তাদের জন্য কোন শক্তি ও সাহায্যকারী নেই।"[27]

জেনে রাখুন, ইবতিলা (পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া) লম্বা ইতিহাসেরই অংশ। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দুনিয়াতে নাযিল হওয়ার পর থেকেই নাবী, সিদ্দীক, মুওয়াহহিদদের ইমামগণ পরীক্ষিত হয়ে এসেছেন। আর যে কেউ 'লা ইলাহা

[26] সুরা ইউসুফঃ ১১০

[27] তাফসীরে সা'দী

ইল্লাল্লাহ’ বহন করতে এগিয়ে আসবে, সমর্থন করবে এবং দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করবে তাকে অবশ্যই এই সম্মানের দাম দিতে হবে–যা হল চরম পরিশ্রান্তি, ক্লান্তি আর ইবতিলা। তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনার অবস্থান কোথায়? এই পথ চরম ক্লান্তির, এই পথেই আদম عليه السلام ক্লান্ত হয়েছিলেন, নুহ عليه السلام হয়েছিলেন শোকার্ত, ইবরাহীম عليه السلام কে নিক্ষেপ করা হয়েছিল অগ্নিকুণ্ডে, ইসমাইল عليه السلام কে শোয়ানো হয়েছিল জবাই করার জন্য, ইউসুফ عليه السلام কে বিক্রি করা হয়েছিল স্বল্পমূল্যে ও কারাবন্দী হয়েছিলেন কয়েক বছরের জন্য, যাকারিয়া عليه السلام কে করাত দিয়ে চিরে করা হয়েছিল দুই টুকরা, ইয়াহিয়া عليه السلام কে করা হয়েছিল শিরচ্ছেদ, আইয়ুব عليه السلام হয়েছিলেন চরম ক্ষতির শিকার, দাউদ عليه السلام কেঁদেছিলেন অঝোরে, ঈসা عليه السلام হেঁটেছিলেন বন্য জন্তুদের সাথে, মুহাম্মাদ ﷺ সহ্য করেছেন চরম দারিদ্র্য ও সব ধরনের কষ্ট… আর আপনি বিনোদন আর খেলা-ধুলায় মত্ত থেকে কল্যাণ হাসিল করবেন?! আর যারা কেবলমাত্র সফলতায় আর বিজয়ে বিশ্বাসী তাদের সম্পর্কে আল্লাহ عز وجل বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ اطْمَاَنَّ بِهٖ ۚ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿۱۱﴾

“আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপদ আসলে সে তার পূর্ব চেহারায় ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে এবং আখিরাতে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।”[28]

সাইয়্যিদ কুতুব رحمه الله বলেন, “সত্যের সংগ্রামে অটল থাকার পরীক্ষায় নফসকে প্রস্তুত করতে হবে, যে সংগ্রাম বিপদ, কষ্ট, ক্ষুধা আর জীবন, সম্পদ ও ফসলহানী দিয়ে পরিপূর্ণ। আক্বীদাহ’র চাহিদা পূরণ করতে মু’মিনের জন্য এই পরীক্ষা অনিবার্য, যাতে সেই আক্বীদাহ’র দাবি অনুযায়ী দাসত্ব পরিপূর্ণ করতে পারে। দাসত্বের সমানুপাতে তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রোথিত হবে এবং এর ফলে বিপদের প্রথম আঘাতে সে মুষড়ে পড়বে না। হৃদয়ে আক্বীদাহ’র ভালবাসা ও নৈকট্যের জন্য এই দাসত্বের মূল্য দিতে হয়। আর এর কারণে যখন তারা কষ্টের

[28] সুরা হাজ্জঃ ১১

স্বীকার হয়, এর প্রতি তাদের ভালবাসা আরো বেড়ে যায়, আর একে ধারণের যোগ্যতা বাড়তে থাকে। একইভাবে ইবতিলা ও ইবতিলার সময়কার ধৈর্যধারণ ছাড়া অন্যরা এর মূল্য বুঝবে না আর বালা-মুসিবত অনবরত চলতে থাকে। সাহাবীদের আক্বীদাহ'র দৃঢ়তা এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়, কারণ দুঃখ-কষ্টে রয়েছে এক গোপন শক্তি। মু'মিনের অন্তরে অনেক গোপন ক্ষেত্র থাকে যা কেবল সেই দুঃ-কষ্ট ভোগের ফলে প্রকাশিত হয়।"

তাই যারা লড়াই করে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের পথ পাড়ি দেয়, তাদের লড়াইয়ের এই রূপটি এবং এর লক্ষ্যে পৌঁছাতে যা যা দরকার, তা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে–এই পথ সালেহীনদের রক্তসিক্ত হতে হবে, এই পথে অনেককে তাদের প্রিয়জন, সাথী-বন্ধু ও বাসভূমি হারাতে হবে। এমনটিই করেছেন নাবীর সাহাবাগণ, যারা নাবীগণের পরে ছিলেন সৃষ্টির সেরা। হিজরতের কষ্ট সয়েছেন, আর সয়েছেন সম্পদ, পরিবার ও বাড়িঘর হারানোর বেদনা, সবই আল্লাহর রাহে... এই প্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান কোথায়?

এই দলের যা করতে হবে তা হল, এই বাছাইকৃত পথে অটল থাকা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বালা-মুসিবতে পুরস্কার তালাশ করা, তা যেমনই হোক–নেতার মৃত্যু বা কর্মীদের প্রাণহানি, আর এই পথে অটল থাকা; জেনে রাখা এটা আল্লাহর রীতি। আর আল্লাহ এই উম্মাহ থেকে সালেহীন বান্দাদের বাছাই করে নেন। তারা নুসরাতের জন্য তাড়াহুড়ো করবে না, কারণ এর আগমন অনিবার্য।

দ্বীনে আপোষ করতে না চাওয়ায় আসহাবে উখদুদকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা আল্লাহর রাহে মৃত্যুকেই বেছে নিয়েছিলেন। তাগুত বিশাল গর্ত খনন করে এবং অগ্নিসংযোগ করে তার রক্ষী ও সেনাদেরকে মু'মিনদের আগুনে নিক্ষেপ করতে আদেশ করেছিল। কিন্তু এতে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল; তাদের কেউই দুর্বল হননি বা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি, তাদের ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন রিওয়ায়াত পাওয়া যায় না। বরং একজনের পর আরেকজন সাহস ও বীরত্বের সাথে আগুনের দিকে যেতে লাগলেন, যেন সেই বালক তাদের মাঝে সাহস ও বীরত্ব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা তার সাথে যোগ দিতে তুষ্ট ছিলেন, তারা তাদের দ্বীনের

মুক্তিপণ হিসেবে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন। সুতরাং তারা অবশ্যই সফল– আল্লাহ এটাকে "এক বিশাল সফলতা" হিসেবে উল্লেখ করেন,

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ﴾

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।"[29] তাই তো কবি বলেন,

গৌরবকে এক টুকরো খেজুর মনে কর না, যা তুমি খেতে পারবে

কখনোই গৌরবের স্বাদ পাবে না, যতক্ষণ না সবরের আস্বাদন করবে।

আল্লাহ ﷻ তার মু'মিন বান্দাদেরকে নিআমত স্বরূপ বিজয় এবং তামকীন দান করেন। অতঃপর তিনি নিআমতের ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করেন। শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সত্যিই আল্লাহ, তার সামার্থ্য চমকপ্রদ, তার মহিমা পরাক্রমশালী, তিনি মু'মিনদের কখনো বিজয় দান করেন, আবার কখনো কখনো পরীক্ষা করেন, তার নিআমত সীমিত করেন। যাতে তারা দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। এর হিকমা তিনিই জানেন এবং তার দ্বারাই নিরূপিত।" বাস্তবিকপক্ষে দাওলাতুল ইসলামের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আজ অব্দি দাওলাহ এই রীতির উপরেই চলছে। যখন আমেরিকা ইরাকে হামলা চালিয়েছিল তখন মু'মিন মুওয়াহহিদগণ দখলদার আমেরিকা এবং তার পদলেহনকারী সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে ক্বিতাল চালিয়ে যেতে থাকেন। আল্লাহর অনুগ্রহে যারকাওয়ী রহিমাহুল্লাহ -এর সময় মুজাহিদগণ ফাল্লুজা এবং দিয়ালায় আমেরিকার সৈনিকদের লক্ষ্য করে উপর্যুপরি আঘাত হানতে থাকেন। এর ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই মু'মিনদের উপর আসে ইবতিলার মারহালা। এভাবেই কিছুদিন যাওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে আবার যমীনে তামকীন দান করেন। ফলে তারা দাওলাহ তথা রাষ্ট্র গঠন করেন। দাওলাহ'র অগ্রাভিযান ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আল্লাহ আবু ওমারের নেতৃত্বে মু'মিনদেরকে

---

29 সুরা বুরূজঃ ১১

দিয়ালা, আনবার, বাগদাদ এবং মসুলে তামকীন দান করেন। কিন্তু আল্লাহর রীতির তো পরিবর্তন হয় না। তিনি মু'মিনদেরকে পুনরায় পরীক্ষায় ফেলেন। মু'মিন মুওয়াহহিদ বান্দারা শহর ছেড়ে মরুভূমিতে চলে যান। সেখানে আসমানি তরবিয়তে মু'মিনরা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন। সেই সময় দাওলাহ'র অবস্থা এতটাই সংকটাপূর্ণ হয়েছিল যে, দাওলাহ'র আমীর আবু ওমার, যুদ্ধ মন্ত্রী আবু হামজা নিহত হয়েছিলেন, এর কয়েক মাসের মধ্যে দিয়ালা, আনবার, বাগদাদ এবং মসুলে ব্যাপক হারে মু'মিনরা বন্দি এবং নিহত হন, সাহওয়াতরা অনেক অঞ্চল দখল করে নেয় আহলুস সুন্নাহ'র খিয়ানতকারীদের খেয়ানতের পর–তবে আল্লাহ যাকে রহম করেছেন সে ব্যতীত। সে সময় ইরাকের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিয়েছিল দাওলাহ'কে তারা নিঃশেষ করে দিয়েছে। কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের অবিচল সৈনিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ ﷻ এই কষ্ট, ইবতিলার পর আবার বিজয় দান করবেন। তাই তারা ইবতিলার সময়টাতে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে হারানো ভূমি আবার ফিরিয়ে আনার শপথ গ্রহণ করলেন। আর ঐ সময়টাতে যেহেতু অনেক মু'মিন মুওয়াহহিদ বন্দি হয়েছিলেন তাই দাওলাতুল ইসলামের আমীর আবু বকর আল-বাগদাদী কারাগার ভাঙ্গার অভিযান পরিচালনা করেন। এরপর আল্লাহ তার বান্দাদেরকে তার ওয়াদা বাস্তবায়নার্থে অনেক ভূমি বিজয় করার তাওফীক্ব দেন। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে সেই মরুভূমিতে তরবিয়ত নেয়া মু'মিনগণ ইরাকের অর্ধেকের মত ভূমি বিজয় করেন। তারা শামের প্রায় ৭০ শতাংশ ভূমি দখল করেন। আল্লাহ-ই মু'মিনদেরকে বিজয় দান করেন। তারা খিলাফাহ ঘোষণা করেন। মুসলিম উম্মাহ'র জন্য নির্ধারণ করা হয় একজন খলীফাহ। আল্লাহর অনুগ্রহে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুহাজিরগণ খিলাফাহ'র ভূমিতে হিজরত করেন যেমনটি হয়েছিল মাদীনাতু রাসুলিল্লাহ'এ। মুসলিমরা আবার তাদের সম্মান ও গৌরব ফিরে পায়। মুসলিমরা স্বচক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন হতে দেখে। মুসলিমরা এতোদিন ছিল নির্যাতিত নিপীড়িত। কিন্তু আল্লাহ ১৪৩৫ হিজরীতে মুসলিমদের হারানো খিলাফাহ ফিরিয়ে দেন। আর এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় রাসুলে আরাবী ﷺ -এর ভবিষৎবাণীঃ "এরপর আবার আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ।" খিলাফাহ ঘোষণার পর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাওহীদবাদী মু'মিনরা এর

পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হোন। আর এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কুফরি শক্তি একজোট হয়ে মু’মিনদের উপর হামলে পড়ে। মুজাহিদগণ ভালোকরেই জানতেন যে, এ বিজয় ও তামকীন লাভের পর আল্লাহ আবারো তার প্রিয় বান্দাদেরকে তামহীছ করবেন। সেজন্য তারা এর প্রস্তুতি নিয়ে সামনের দিনগুলো পার করছিলেন। এজন্যই শাইখ আবু মুসআব আয-যারকাওয়ী رحمه الله বলেছিলেন, “ব্যর্থ তো তারাই যারা সকল ইবতিলার জন্য সবরের প্রস্তুতি নেয় না, যারা নিআমতের শুকুরিয়া জ্ঞাপন করে না এবং যারা জানে না কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে।” আর মু’মিনগণ বিপাদপদের মাধ্যমে পরীক্ষিত হবেন এটা হাদিসে নববীর-ই সত্যায়ন। রাসুল ﷺ বলেছেন, “মানুষের মাঝে নাবীগণের বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়, তারপর যারা নেককার তাদের, এরপর যারা নেককার তাদের। **মানুষকে তার দ্বীনের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশি দ্বীনদার তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহলে তাকে সে অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়।”[30] আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে বর্তমানে দাওলাতুল ইসলাম-ই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হক্ব আঁকড়ে ধারণকারী।** এব্যাপারে শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله বলেন, “আমি মনে করি, দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ’র মুজাহিদগণের উপর এই সকল তীব্র হামলার মূল কারণ হল তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হক্ব আঁকড়ে ধারণকারী এবং রাসুল ﷺ -এর মানহাজের অনুগামী।”[31] সুতরাং এই দাওলাহ যেহেতু মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হক্বের নিকটবর্তী তাই তারা বেশি পরীক্ষিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। দাওলাতুল ইসলামের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অব্দি ইবতিলার এ রীতি ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। তাই আমরা দেখি, আবু মুসআব থেকে শুরু করে আবু ওমার, আবু বকর, আবু মুহাম্মাদ, আবু আলী, আবু আব্দুর রহমানসহ দাওলাহ’র অধিকাংশ আমীর-উমারা বিভিন্ন সময় কারাবন্দী ছিলেন। আল্লাহ তাদেরকে নিআমত দান করেছেন ফলে তারা প্রথমে দাওলাহ এরপর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাসুল ﷺ এক

[30] তিরিমিযীঃ হাসান

[31] আস-সাবীল লি-আহবাতিল মুআমারাত

হাদিসে বলেন, "আমার পূর্বে এমন কোন নাবী অতিবাহিত হননি যার উপর এ দায়িত্ব বর্তায়নি যে, তিনি তাদের জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা উম্মাতকে নির্দেশনা দেননি এবং তিনি তাদের জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করেন নি। আর তোমাদের এ উম্মাত (উম্মাতে মুহাম্মাদ)-এর প্রথম অংশে তার কল্যাণ নিহিত এবং এর শেষ অংশ অচিরেই নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমন সব ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। এমন সব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে যে, একটি অপরটিকে ছোট প্রতিপন্ন করবে। একটি বিপর্যয় আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে- এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে তখন মু'মিন ব্যক্তি বলবে, আমি তো শেষ হয়ে যাচ্ছি ইত্যাদি। সুতরাং, যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায় তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমামের হাতে বাইআতবদ্ধ হয়ে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, সে যেন সাধ্যমত তার আনুগত্য করে। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তী জনের গর্দান উড়িয়ে দেবে।"[32] সুতরাং ফিতনা, বালা-মসিবত ও পরীক্ষা দেখে মু'মিন কখনোই বিচলিত হবে না। কী হয়েছিল যখন শাইখ উসামা رحمه الله -এর আমেরিকায় টুইনটাওয়ারে হামলা করার ফলে আমেরিকা আফগানিস্তানে এসে মোল্লা ওমার رحمه الله কে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল? কী হয়েছিল খোরাসানে যখন শাইখ উসামা رحمه الله এক বরকতময় মহা সাফল্যের কাজ করেছিলেন তাই এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আল্লাহও তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। তাই ভূমি হারানো অথবা আহত-নিহত বা বন্দি হওয়া পরাজয়ের বা বাতিল হওয়ার কোন মাপকাঠি না। সুতরাং যা হওয়ার ছিল তাই হয়েছে। খিলাফাহ আলা মিনহাজিনহ-নবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে, মুসলিম উম্মাহ একজন অভিভাবক পেয়েছেন, মুওয়াহহিদ

---

32 সহীহ মুসলিম

মুজাহিদরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ইমামের অধীনে ও এক লক্ষ্যে জিহাদ-ক্বিতাল চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে বড় বিষয় যা হয়েছে তা হল মুনাফিক্বদের মুখোশ উন্মোচন হয়েছে এবং মুজাহিদদের সারি থেকে নিফাক্ব দূর হয়েছে। অতএব হে আবু সুলাইমান! আল্লাহ যা করার তাই করেছেন। আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত এই যমীনে কিছুই হয় না।

এতো গেল আল্লাহ ﷻ -এর পক্ষ থেকে পরীক্ষা সম্বন্ধে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দাওলাতুল ইসলামের অগ্রাভিযানে দৃষ্টিপাত করি তাহলে আমরা দেখি, আলহামদুলিল্লাহ, দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে দামেস্কের উপশহরে পৌঁছে গিয়েছিল। নুসাইরী বাহিনী দাওলাহ’র সৈনিকদের সামনে হয় কচুকাটা হচ্ছিল নতুবা পালানোর পথ খুঁজছিল। কিন্তু বরাবরের মতই মুসলিম নামধারী গাদ্দাররা পিছন হতে ছুরি মেরে দিল। শামে একে অপরকে আঘাত করার বীজ দাওলাহ রোপণ করেনি এবং সেটা দাওলাহ’র থেকেও শুরু হয়নি–যা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। বরং ইরাকের সাহওয়াতদের ন্যায় একই নিকৃষ্টতার পুনরাবৃত্তি করেছিল শামের সাহওয়াতরা। সাহওয়াত ও বিভিন্ন দলের ব্যাপারে দাওলাহ’র পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। তথাপি তারা নিশ্চিতভাবেই জানতো যে, কোন কারণ ছাড়াই সাহওয়াতরা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেননা ইরাকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসলামের নামে কিছু সাহওয়াত গ্রুপ সেখানেও ছিল। যারা সর্বদাই মুজাহিদদেরকে খারিজি, তাকফীরী অপবাদ দিয়ে এসেছে। দাওলাহ তখনো পরিপূর্ণরূপে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে অভিযানে ব্যস্ত। নুসাইরীদের নিকট দাওলাহ ছিল এক আতঙ্কের নাম–আল্লাহর অনুগ্রহে এখনো তা বাকি আছে। দাওলাহ যখন নুসাইরীদের উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন সাহওয়াতরা হালাবের পল্লী এলাকা আতারিবে দাওলাহ’র সাথে গাদ্দারি করে। তারা দাওলাহ’র ঘাটিগুলোতে আক্রমণ করে সকল প্রকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং ব্যারিকেড দিয়ে দেয়। আর তখন বহুসংখ্যক মুজাহিদদের হত্যা করা হয়। এই গাদ্দারির পরিপ্রেক্ষিতে দাওলাহ নিজেদের ঘাটিগুলোর প্রতিরক্ষা করার উদ্দেশ্যে নুসাইরীদের বিরুদ্ধে সকল অপারেশনের পরিকল্পনা স্থগিত করে। সাহওয়াতদের গাদ্দারির গল্প শুনুন খোদ দাওলাহ’র সেনাপ্রধান আবু ওমার আশ-শিশানী رحمه الله -এর থেকে। তিনি

বলেন, "আমরা হালাবের উত্তরাঞ্চলের পল্লী এলাকায় আমাদের ঘাটিসমূহ খালি রেখে নুসাইরীদের কাছ থেকে এলাকাসমূহ মুক্ত করতে গিয়েছিলাম। তারা বিশ্বাসঘাতকের মত আমাদের উপর হামলা করেছে। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আল-খাইরে অভিযান বন্ধ করতে হয়েছে।" তাদের এ বিশ্বাসঘাতকতার জবাবে দাওলাহ'র সেনাপ্রধান আবু ওমার আশ-শিশানী দেইরায-যোর থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার পথ সফর করে এসে আল-বাব শহর সাহওয়াতদের থেকে মুক্ত করেন। এই ঘটনার পর দাওলাতুল ইসলামের আমীর শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ শামে অবস্থানরত তার সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আপনারা এমন ব্যক্তিদের থেকে বিরত থাকুন যারা আপনাদের থেকে বিরত রয়েছে। আপনাদের অস্ত্র তাদের দিকে তাক করুন বিভিন্ন দলের মধ্য থেকে যারা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর ক্ষমা ও নম্রতাকে প্রাধান্য দিন যেন আহলুস সুন্নাহ'র জন্য উঁৎপেতে থাকা শত্রুর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন।" দাওলাহ নুসাইরীদের থেকে শামের ভূমি মুক্ত করতে ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে গাদ্দার সাহওয়াতরা দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

সুতরাং মুজাহিদদের অগ্রাভিযানের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে শামের সাহওয়াতরা। দাওলাহ বাধ্য হয়ে যুদ্ধের মোড় নুসাইরীদের দিক থেকে সাহওয়াতদের দিকে ঘুরিয়েছে। কারণ সাহওয়াতরা দাওলাহ'র ঘাটিগুলোতে হামলা চালানো শুরু করে। আর দাওলাহ তখন ইক্বদামী অভিযান বন্ধ করে নিজেদের প্রতিরক্ষায় মনোযোগী হয়। অতএব ইরাক শামে দাওলাহ'র অগ্রাভিযান শিথিল হওয়ার জন্য শামের আল-কায়দা এবং এর মিত্ররা দায়ী। লিবিয়াতে আল-কায়দা ও তার সাহওয়াত জোট দায়ী। ইয়েমেনেও একই অবস্থা। এমনিভাবে খোরাসানেও মুরতাদ তালেবান আমেরিকার সাথে মিলে যৌথ অভিযান চালিয়ে দাওলাহ'কে বাধাগ্রস্ত করেছে। তাই আমরা আবু সুলাইমানকে বলি, যুদ্ধে ভূমি হারানো মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হচ্ছে বিশুদ্ধ আক্বীদাহ ও মানহাজের উপর টিকে থাকা এবং এর উপর মৃত্যুবরণ করা। এমন ভূমির কী-বা মূল্য আছে যদি সেখানে গায়রুল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়! কাফিরদের তাবেদারী করে ভূমি টিকিয়ে রাখার চেয়ে ভূমিহীন

অবস্থায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। আর যারা ভূমির মরীচিকায় পড়ে যায় তাদের নিকট যুদ্ধ হচ্ছে দুধ ভর্তি গ্লাসের ন্যায়। দুধ শেষ হয়ে গেলে যেমন গ্লাসের কোন মূল্য থাকে না তেমনি যুদ্ধের ময়দানে বিজয় না আসলে তাদের নিকট সেটা আর যুদ্ধ হয় না।

আবু সুলাইমান বলেছে, শাইখ উসামা ﷺ এই উম্মাহ’কে আসল পরিচয় শিখিয়েছেন। বিশুদ্ধ তাওহীদবাদী মুজাহিদগণ হলেন পশ্চিমা সভ্যতার মূলে আঘাতকারী...

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! শাইখ উসামা ﷺ ছিলেন এই শতকে উম্মাহ’র পুনর্জাগরণকারী। তিনি ছিলেন একজন মহান অগ্রপথিক। তিনি কুফফার মুরতাদদের বিরুদ্ধে জবান এবং তরবারি দ্বারা জিহাদ চালিয়ে গেছেন। তিনি উম্মাতে মুসলিমাকে নির্যাতন নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে নিজের আয়েশি জীবন ত্যাগ করেছিলেন। তার মত উম্মাহ’র মহান বীর সেনানীর কীর্তি এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আজ আমরা ডাক্তার সাহেবকে দেখি, তিনি শাইখ উসামা ﷺ -এর পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো দূরের কথা বরং সেগুলোকে নষ্ট করছে। নষ্ট করেছে তিলেতিলে গড়ে তোলা শাইখ উসামা ﷺ -এর আল-কায়দার চিন্তা-চেতনাকে। আল-কায়দার মানহাজকে কলুষিত করেছে বৈপ্লবিক চিন্তা-ধারায় পরিবর্তিত করার মাধ্যমে। ডাক্তারের কথিত হিকমতের কারণেই আল-কায়দার দুইটি ফ্রন্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তারই অদূরদর্শিতার কারণে উম্মাহ’র মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। ডাক্তার সাহেব হিকমতের নাম দিয়ে কত কী-ই না করেছে!! আর হ্যাঁ, তাওহীদবাদী মুজাহিদগণই পশ্চিমা সভ্যতার মূলে আঘাত করতে নাইনইলেভেন ঘটিয়েছিলেন। আর সর্বোত্তম পূর্বসূরির সর্বোত্তম উত্তরসূরিরাই ব্রাসেলসে পশ্চিমাদের আঘাত করেছেন, লাসভেগাসে আমেরিকাকে হতবিহ্বল করে দিয়েছেন। নাইনইলেভেনে হামলার মুওয়াহহিদগণের উত্তরসূরী তো তারা নয় যাদের সর্বোচ্চ নেতারা পশ্চিমা পোশাকে সজ্জিত নারীদের সাথে বিলাসবহুল হোটেলে বসে আলাপচারিতা করে। মুজাহিদরা তো সেই উসামার উত্তরসূরী যিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ -এর মত

উম্মাহ'কে তাওহীদ শিখিয়েছেন। চিনিয়ে দিয়েছেন কে শত্রু আর কে মিত্র। শিক্ষা দিয়েছিলেন আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মত মহান আক্বীদাহ। তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজের অধিকারী, কাফির ও কুফরের ব্যাপারে আপসহীন এক মহান অগ্রনায়ক। শাইখ উসামা رحمه الله এই শতকে উম্মাহ'কে শিখিয়েছেন আল্লাহর যমীনে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার একমাত্র উপায় হল জিহাদ ও ক্বিতাল। তিনি ইসলামী লেবাসধারী কাফিরদের ব্যাপারে গোলোক ধাঁধায় ছিলেন না। তিনি জানতেন ইসলামের নাম বলে বেড়ানো এই সকল শাসকরা ইসলামের কোনই উপকার করবে না। পক্ষান্তরে এরাই মুসলিমদেরকে কাফিরদের গোলামে পরিণত করেছে। তাই তিনি তাদের থেকে মুসলিম উম্মাহ'কে সর্বদাই সতর্ক করতেন। আজ দাওলাতুল ইসলাম শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله -এর মানহাজের উপর চলছে। তাই আপনি এ দাওলাহ'কে দেখবেন না কোন কাফিরের চাটুকারিতা করতে–হোক সেটা আসলী কাফির অথবা মুরতাদ কাফির। শাইখ উসামা যেমন পশ্চিমাসহ সকল কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন ঠিক একইভাবে দাওলাহ আজ কাফিরদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করছে। শাইখ উসামা কাফিরদের সাথে যে কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করতেন দাওলাহ কাফিরদের সাথে আজ একই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করছে। তাই আল্লাহর অনুগ্রহে দিনকে দিন দাওলাহ বিস্তৃত হচ্ছে ঠিক যেমন শাইখ উসামা رحمه الله -এর জীবদ্দশায় আল-কায়দা বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরীর হিকমার স্রোতে আজ আল-কায়দা সংকুচিত হচ্ছে। লিবিয়ার আল-কায়দা আজ হাকীমের হিকমার কারণে বিলুপ্ত, তিউনিসিয়ায় ইসলামী দাবিদার সরকার দলের প্রতি ডাক্তার সাহেবের গোলোক ধাঁধার কারণে সেখানে আল-কায়দা নিশ্চিহ্ন, সবশেষে তার হিকমার কল্যাণে শামে নিজেরা একে অপরের সাথে মারামারি করে আজ বিলুপ্তির পথে–আল্লাহ এদের হিদায়াত দান করুন নতুবা এদের বিলুপ্তি তরান্বিত করুন আমীন!

চিঠির বক্তব্যঃ "কিন্তু হারিছ-হায়দার মুছান্নার এই উত্তরসূরীরা খেই হারিয়ে ফেললেন। তামকীন, প্রভাব প্রতিপত্তি ও গনিমাতের ধাধায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে ফেললেন।"

প্রিয় পাঠক! হারিছ-হায়দার আর মুছান্নার উত্তরসূরীরা কখনোই খেই হারিয়ে ফেলেন না। কেনইবা তারা খেই হারিয়ে ফেলবেন অথচ মুছান্নার উত্তরসূরীরা তো মুছান্নার জীবন থেকে নিজেদের কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন। মুছান্নাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কালামে মাজীদে বলেছেন,

﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

“আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি অধিক কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সদয়।” তাই মুছান্নার উত্তরসূরীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা কখনোই কাফিরদের প্রতি নমনীয় হবে না–হোক সেটা আসলী কাফির অথবা মুরতাদ কাফির তা সমান। মুছান্নাদের কর্মপদ্ধতির মধ্যে ছিল, তারা লড়াই করতেন আল্লাহর কালিমা বিজয়ী করার জন্য এবং আল্লাহর যমীনকে দাওলাতুল ইসলামে পরিণত করার জন্য। মুছান্নাদের উত্তরসূরীরা কখনোই এক কাফিরের বদলে অন্য আরেক কাফিরকে প্রতিস্থাপন করার জন্য লড়াই করবে না, আর না লড়াই করবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিপরীতে নাগরিক রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। মুছান্নাদের মানহাজ তো ছিল, কাফিরদের থেকে দখলকৃত বীজিত ভূমি আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা, হুদুদ বাস্তবায়ন করা, আসলী কাফিরদের প্রতি জিযয়া আরোপ করা এবং মুরতাদ কাফিরদের কোন ধরনের নিরাপত্তা না দেওয়া। কিন্তু মুছান্নাদের উত্তরসূরীরা কখনোই নিয়ন্ত্রণাধীন বীজিত ভূমি নাগরিক আইন অথবা গোত্রীয় আইন বা প্রাচীন রাজার প্রণয়নকৃত সংবিধান দ্বারা শাসন করবে না–যেগুলো আল্লাহ ﷻ -এর আইনের বিরোধী। মুছান্নাদের উত্তরসূরীরা কখনোই জিযয়ার বিধানকে এক পার্শ্বে সরিয়ে রাখবে না, আর না মুরতাদ কাফিরদের নিরাপত্তা দিবে। মুছান্নাদের উত্তরসূরীরা জনগণের সন্তুষ্টি ধরে রাখার জন্য হুদুদের বিধানকে জরিমানা বা কারারুদ্ধ করার বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপন করে না। মুছান্নারা তো দখলকৃত ভূমিতে শিরকী স্থাপনা, উঁচু কবর বা গম্বুজ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন এবং প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয় এমন কোন স্থাপনা বহাল তবিয়তে রাখতেন না। কিন্তু মুছান্নার উত্তরসূরীরা কখনো তাদের মত নয় যারা ঐতিহাসিক শিরকী স্থাপনা, মাজার ও কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি

দেয় এবং নিশ্চিহ্ন না করার ঘোষণা দেয়। তাই মুছান্নার মানহাজ থেকে যারা বিচ্যুত হয়ে শয়তানের মানহাজ ধারণ করে তারা কখনোই মুছান্নার উত্তরসূরী নয়। আবু সুলাইমান অতি উদারতা দেখাতে গিয়ে নাগরিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইকারী, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইকারী, জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইকারী এবং ডাকাত ও ছিনতাইকারী–সবাইকে মুছান্নার উত্তরসূরী বানিয়ে ফেলেছে যা এই উম্মাতে মুসলিমার প্রতি চরম অবিচার। কিভাবে আরব তাগুতদের সাহায্য নিয়ে নাগরিক রাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নুসাইরীদের বিরুদ্ধে লড়াইকারীরা মুছান্নার উত্তরসূরী হয়?!

মুছান্নার উত্তরসূরীরা খেই হারিয়ে ফেলেন নি বরং এখন পর্যন্ত মুছান্নার কর্মপদ্ধতির উপরেই রয়েছেন। এশিয়া থেকে আফ্রিকা–প্রতিটি জায়গায় তারা মুছান্নাদের আছার কর্মে বাস্তবায়ন করছেন। মুছান্নার উত্তরসূরীরা খেই হারিয়ে ফেলেন নি। খেই হারিয়েছে মুরসীর প্রশংসাকারী, খেই হারিয়েছে জনমতের পূজারী আল-কায়দা, খেই হারিয়েছে ওরা যারা মুওয়াহহিদদের উপর নির্যাতনকারী তাগুত সাইদীকে 'মাজলুম আলেমে দ্বীন' ও 'কুরআনের পাখি' হিসেবে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করে, খেই হারিয়েছে আল-কায়দার আমীর-উমারা তালেবান। মুরতাদ তালেবান তামকীন, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গনিমতের ধাঁধায় পড়ে আফগানিস্তানের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক স্বাধীনতা সৌধে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়–পূর্বের ক্ষমতাসীন তাগুতদের অনুসরণ করে। প্রিয় পাঠক! একেই বলে খেই হারিয়ে ফেলা। একেই বলে ক্ষমতার ধাঁধায় পড়া। মুছান্নার উত্তরসূরীরা খেই হারিয়ে ফেলেন নি; কারণ তারা আল্লাহর নির্দেশিত পথেই চলছেন। আল্লাহ ﷻ যখন মু'মিনদের তামকীন দান করেন তখন তাদের করণীয় সম্পর্কে পবিত্র কালামে মাজীদে এসেছেঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

"তারা এমন যাদেরকে আমরা যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ

করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।"[33] আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দেখেছি এবং এখনো দেখছি, দাওলাহ যখনই কোন ভূমিতে তামকীন লাভ করে তখন তারা সালাত কায়েম করে, সালাত পরিত্যাগ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে, তারা যাকাত প্রদানের ব্যবস্থা চালু করে, আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার জন্য হিসবাহ কমিটি নিয়োগ করে। এই হিসবাহ কমিটি প্রকৃত অর্থে আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়। আপনি যদি ইরাক, শাম, লিবিয়া, ইয়েমেন, আফ্রিকা ও সাহেল অঞ্চলসহ দাওলাহ'র প্রতিটি উলায়াতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন তখন অবশ্যই দেখতে পাবেন, দাওলাহ'র সৈনিকগণ যখনই কোন ভূমির কর্তৃত্ব লাভ করেন তখন তারা সেখানে ইসলামী শারীয়াহ'র বিধিবিধান চালু করেন। সালাত প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সবধরনের আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকারের কাজ চালিয়ে যান। কেনইবা তারা এটা করবেন না অথচ আমাদের রব তার কিতাবে এটাই বিধিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, শামের সেই সাহওয়াতরা যখন ভূমি নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তখন তারা না সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে আর না তারা সালাত পরিত্যাগ করাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছে। তারা ইসলামী শারীয়াহ বাদ দিয়ে তাদের মনিব আরব তাগুতদের প্রণয়নকৃত নাগরিক আইন দ্বারা শাসন করছে। তারা আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার পরিত্যাগ করেছে। আল-কায়দা এবং তার মিত্র গোষ্ঠীর শ্রদ্ধাভাজন মুহাইসিনী মিডিয়াতে বহুবার বলেছে, "আমরা ইচ্ছা করলেই সকলে মিলে আইন জারী করতে পারি– যেমন দাড়ি শেইভ করা ও টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ ইত্যাদি। তাহলে কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো চিত্র পাল্টে যাবে। কিন্তু এটা কি ইমানী সমাজ হবে? এটা হবে একটি নিফাক্বী সমাজ। তারা অপেক্ষা করবে কখন আমরা চলে যাব আর তারা নিফাক্ব করবে।" সুবহানাল্লাহ্! আমাদের রব আল্লাহ ﷻ -এর আদশ কি এটাই? তাদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা না শারীয়াহ বাস্তবায়ন করছে আর না সৎকাজের আদেশ করছে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করছে!

[33] সুরা হাজ্জঃ ৪১

একই ধরনের কাজ আমরা আল-কায়দার ইয়েমেন শাখাকে করতে দেখেছি। যখন তারা মুকাল্লা শহর দখলে নেয় তখন তারা সেখানে না শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছে আর না আমর বিল মা'রূফ নাহি আনিল মুনকার করেছে। তৎকালীন আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার আমীর আবু বাসীর উহাইশী প্রকাশ্যে বলেছে, "আমাদের হাদারামাউতে বহু মাজার আছে। আল্লাহ-ই জানে সেখানে কত শিরক হচ্ছে। কিন্তু এখন আমাদের করণীয় হল আমরা চেষ্টা করে যাবো বিভিন্ন পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি সবধরনের দাওয়াতি মাধ্যম ব্যবহার করতে। আমরা এই কাজটি করে যাব। আমাদের আরো কাজ করতে হবে, মূর্তি ভাঙতে হবে, শিরক ধ্বংস করতে হবে, মাজার ভাঙতে হবে আর মাজার ভাঙ্গা ওয়াজিব। যখন আপনি এটা করার সামর্থ্য রাখবেন সুযোগ তৈরি হবে তখন সেটা নিশ্চিহ্ন করবেন। শহর দখল করার মানে এই নয় যে, আপনি তামকীন পেয়ে গেছেন এবং আপনি জনগণের উপর আইন জারী করবেন। আর মানুষ যখন তাদের অধিকার চাইবে তখন বলবেন এটা আমি পারব না।" সুবহানাল্লাহ্! তাহলে আলী رضي الله عنه কে দেওয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর সেই আদেশের বাস্তবায়ন কোথায়? রাসুল ﷺ তো বলেছেন, "হে আলী তুমি কোন মূর্তি ধ্বংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর সমান না করে ছাড়বে না।" একদিকে আল্লাহর রাসুল ﷺ আদেশ করেছেন মূর্তি ভেঙ্গে ফেলতে এবং উঁচু কবর সমান করে দিতে অপরদিকে তারা করছেটা কী? আমরা আল-কায়দার এই ইয়েমেন শাখাকেই দেখেছি, তারা উঁচু কবর ও মাজার গুড়িয়ে দিত। কিন্তু আজ তাদের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা কোথায় গেল? বড় বড় শহর দখল করার মত শক্তি তাদের আছে কিন্তু সেই বীজিত শহরে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার মত শক্তি তাদের নেই। এর চেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে?!

দাওলাতুল ইসলাম কখনোই নিজেদের প্রতিপক্ষ বানায়নি। দাওলাহ'র কর্মপদ্ধতিতে না এই ধরনের চিন্তা আছে। দাওলাহ সর্বদাই মুসলিমদের প্রতিরক্ষা করেছে এবং করে যাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী আমরা দেখেছি, শামের সাহওয়াতরা প্রথমে দাওলাহ'কে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। জাবহাতুন নুসরাহসহ সকলে মিলে দাওলাহ'কে প্রতিপক্ষ বানিয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু কিছুদিন যেতে

না যেতেই তারাই আবার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে নিজেরা নিজেরা মারামারি করেছে। শামের আল-কায়দার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় হয়েছে যে, কিছুদিন পূর্বেও যারা পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করে একজোট হয়ে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তারাই আল-কায়দার উপর ক্র্যাকডাউন চালিয়েছে। নেতাদের কাউকে বন্দি করছে আর কাউকে হত্যা করছে। শামে আল-কায়দার এতো সংকটাপন্ন অবস্থা নুসাইরী সরকার বা আমেরিকার মদদপুষ্ট এসডিএফের হামলার কারণে হয়নি। তাদের এ অবস্থা হাকীম সাহেবের হিকমার কল্যাণে হয়েছে। আর হাকীম সাহেব শামে তার ক্ষমতা বিস্তৃত করার জন্য দাওলাতুল ইসলামকে তার প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। তাইতো দাওলাহ যখন জাবহাতুন নুসরাহ নাম বাতিল করে দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণা করেছে এবং যখন জুলানী তার আমীরের বাইআত ভঙ্গ করে ডাক্তার সাহেবকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা দেয় তখন ডাক্তার সাহেব শামে দাওলাহ'র শাখাকে নিজে হস্তগত করে নেয়। কিন্তু কিছুদিন পরই হাকীমের হিকমা আবার ভুল প্রমাণিত হয়। আমরা জানি যে, বর্তমানে শামে আল-কায়দার অবস্থা এতোটাই শোচনীয় যে, এখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর তারাই নিজেরা নিজেদেরকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে এবং তাদের কেউ এখন লাঞ্ছনার মধ্যে জীবন-যাপন করছে আর কেউ নিজেদের আঘাতের যখম নিয়ে দিন পার করছে। তথাপি দাওলাতুল ইসলাম টিকে আছে এবং দিনকে দিন বিস্তৃত হচ্ছে–আলহামদুলিল্লাহ।

চিঠির বক্তব্যঃ "ঐক্যের লক্ষ্যে ও বিভক্তি দূরীকরণের উপায় হিসেবে একদল মুজাহিদীন খিলাফাহ ঘোষণা করলেন। কিন্তু তাতেও কাজ হলো না। বরং উল্টা হল।"

প্রিয় পাঠক! আবু সুলাইমান তার চিঠিতে শুরু থেকেই বিভিন্ন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করে চলছে। তার এই বিকৃত করে উপস্থাপনের ব্যাপারটা আমরা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছি। আশাকরি আপনারা বুঝেছেন–আল্লাহর অনুগ্রহে। বরাবরের মতই উল্লেখিত বক্তব্যেও সে প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করেছে। এরই ধারাবাহিতায় সে উপরোক্ত বক্তব্য এবং এর পরবর্তী

বক্তব্যসমূহ দ্বারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা না করার বিষয়টি সাধারণ মুসলিমদের সামনে একটি মামুলি বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে। সে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে একটি ঐচ্ছিক ও মনচাহি বিষয় বানিয়ে ফেলেছে। কেমন যেন ভাবখানা এমন যে, মুসলিমদের জীবনে খিলাফাহ তেমন কোন মূখ্য বিষয়ই নয়। সে চেয়েছে সাধারণ মুসলিমগণ যেন খিলাফাহ ব্যাপারটিকে গুরুত্বহীন মনে করে। তাই এই অবস্থা বিবেচনায় আমাদের জন্য আবশ্যক হয়েছে যে, আমরা খিলাফাহ'র ব্যাপারে শারয়ী নির্দেশনা স্বল্প বিস্তর হলেও আলোচনা করব। আমরা খিলাফাহ'র ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্য উল্লেখ করব এবং সাথে সাথে খিলাফাহ'র ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ'র বক্তব্যগুলো সালফে সালেহীনগণ কিভাবে বুঝেছেন তাও উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহু তা'আলা। (উপরে উল্লেখিত চিঠির বক্তব্যের কিছু অংশ সামনে মোনাসেব স্থানে তুলে ধরব ইনশা'আল্লাহ)।

সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি অন্য সব শারয়ী শব্দের মত খিলাফাহ এবং খলীফাহও দু'টি শারয়ী শব্দ। সালাত, সিয়াম, হজ্জ–এগুলোর যেমন শারয়ী সংজ্ঞা রয়েছে ঠিক তেমনি খিলাফাহ এবং খলীফাহ'র শারয়ী সংজ্ঞা বিদ্যমান। সালাতের আহকাম জানার উৎস যেমন শারীয়াহ তেমনই খিলাফাহ এবং খলীফাহ সংক্রান্ত আহকাম জানার উৎসও শারীয়াহ। সম্মানিত ভাই! বিষয়টি একটু সহজ করে বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেই– ধরুন কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করছে আপনি তাকে দেখলেন যে, সে সালাতের রুকনসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি বাদ দিল। ঐ ব্যক্তির সালাত কি সহীহ হবে? হবে না। কারণ আপনি জানেন যে, কুরআন এবং সুন্নাহ'র আলোকে তার সালাত সহীহ হবে না। সে সালাতের একটি রুকন ত্যাগ করেছে। তাই তার এই সালাতের কিছু কাজকে সালাত হিসেবে গণ্য করা হবে না। ব্যাপারটি খলীফাহ'র ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই। যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে খলীফাহ মনে করে কিন্তু বাস্তবে ওই ব্যক্তি খলীফাহ'র শর্তসমূহ পূরণ না করে তবে তাকে খলীফাহ বলা হবে না। আর যদি কোন খলীফাহ তার শারয়ী শর্তসমূহ পূরণ করেন তবে তাকে খলীফাহ হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে–যদিও কিছু লোক তাকে না মানে। ইদানীং দেখা যায় কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তি খিলাফাহ এবং খলীফাহ'র ব্যাপারে

নতুন নতুন কনসেপ্ট তৈরি করছে ও তা মানুষের মাঝে প্রচার করছে। এক্ষেত্রে আমাদের উচিৎ নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে কুরআন ও সুন্নাহ'র থেকেই বক্তব্য গ্রহণ করা এবং সাহাবায়ে কেরাম ও উত্তম প্রজন্মের সালাফগণ কুরআন-সুন্নাহ'কে যেভাবে বুঝেছেন এবং আমল করেছেন তা অনুসরণ করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন। এবার তাহলে খিলাফাহ এবং খলীফাহ'র ব্যাপারে শারয়ী দিকনির্দেশনা নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা মুসলিম উম্মাহ'র জন্য ওয়াজিব। ইমাম ক্বুরতুবী আল্লাহ তা'আলার এবাণীর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

"আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিস্তাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি যমীনে খলীফাহ সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আর আমরা আপনার হামদসহ তাসবীহ পাঠ করি এবং পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না।" ক্বুরতুবী বলেন, "এই আয়াত হল একজন ইমাম (নেতা) ও খলিফাহ নিয়োগ করার ব্যাপারে একটি মূলনীতি - যার আনুগত্য করা হবে যাতে কালিমাহ এক হয় এবং খলীফাহ'র হুকুমগুলো এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আর ইমাম ও খলীফাহ নিয়োগ করার বিষয়টি ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উম্মাতের মাঝে এবং ইমামগণের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। তবে বধির থেকে যা বর্ণনা হয় তা ব্যতীত; যেহেতু সে শারীয়াহ'র ব্যাপারে বধির। এমনিভাবে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তার কথা দ্বারা কথা বলে এবং তার মত ও পথের অনুসরণ করে।"[34] আবু ইয়ালা 'আহকামুস সুলত্বনিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন, "খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা ফরজে কিফায়াহ।" আপনারা যেমন জানেন, ফরজে কিফায়াহ মানে হলে - যদি মুসলিমদের একটি জামাআত তা সম্পাদন করে তাহলে বাকিদের উপর থেকে তা রহিত হয়ে যাবে।

[34] তাফসীরে ক্বুরতুবী

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ'র জন্য একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা একটি শারয়ী ওয়াজিব বিষয়। ইমাম তথা খলীফাহ নিয়োগ করা ওয়াজিব এব্যাপারে সাহাবাগণের ইজমা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম হাইতামী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আপনি আরো জেনে রাখুন, সাহাবীগণ একমত হয়েছেন যে, নবুওয়াতের যামানা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব। বরং তারা একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব হিসেবে নির্ধারণ করেছেন; যেহেতু তারা আল্লাহর রাসুলকে দাফন করার চেয়ে খলীফাহ নির্ধারণ করার প্রতি ব্যস্ত থেকেছেন।"[35] আর দলিল গ্রহণের উৎস চারটি– ১. কুরআন। ২. সুন্নাহ। ৩. সাহাবীগণের ইজমা। ৪. কুরআন এবং সুন্নাহ'র উপর নির্ভরকৃত ক্বিয়াস। সুতরাং সাহাবাগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম বা খলীফাহ নিয়োগ করা ওয়াজিব। এছাড়াও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার কালামে পাকে এরশাদ করেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

"অবশ্যই আমরা আমাদের রাসুলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ প্রকাশ করে দেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাকে ও তার রাসুলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী।"[36]

আয়াতের দালিলিক দৃষ্টিকোণঃ আল্লাহ তা'আলা তার রাসুলগণকে এবং যারা তাদের অনুসরণ করে তাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যা বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। এটা কেবলমাত্র শক্তি ও কর্তৃত্বের মাধ্যমেই হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন, তিনি লোহা নাযিল করেছেন। এব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে।

[35] আস-সওয়াইকুল মুহাররীক্বাঃ ০৭

[36] সুরা হাদীদঃ ২৫

বাস্তবতা হল আমরা যদি হুদুদ, ক্বিসাস এবং বান্দাদের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত বিধি-বিধানের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করি তাহলে অবশ্যই আমরা দেখতে পাব যে, একটি রাষ্ট্র ও একজন ইমাম প্রতিষ্ঠা করা উম্মাতের জন্য আবশ্যক।

সুন্নাহ’তে রয়েছে যা মুসলিম তার সহীহ গ্রন্থে ইবনে ওমর ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি বাইআতবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।”

হাদিসের দালিলিক দৃষ্টিকোণঃ ইমামকে বাইআত দেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব। আর যা দ্বারা ওয়াজিব সম্পন্ন হয় সেটাও ওয়াজিব। একারণে উম্মাতের জন্য ইমাম নিয়োগ করা আবশ্যক। ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। তবে শুধুমাত্র কতিপয় বিদআতি এব্যাপারে মতবিরোধ করেছে।

ইমাম ইবনে হাযম ﵀ বলেন, “সকল আহলুস সুন্নাহ, মুরজিয়া, শিয়া এবং সকল খারিজিরা ইমামত তথা নেতৃত্ব ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে এবং উম্মাতের উপর ওয়াজিব হচ্ছে ন্যায়পরায়ণ একজন ইমামের আনুগত্য করা - যিনি তাদের মাঝে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করবেন এবং শারীয়াহ’র বিধি-বিধানের মাধ্যমে তাদের পরিচালনা করবেন যা আল্লাহর রাসুল নিয়ে এসেছেন। তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।”[37]

ইমাম নববী ﵀ সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “তারা সকলে একমত হয়েছেন যে, মুসলিমদের জন্য একজন খলীফাহ নিয়োগ করা ওয়াজিব।”

এই শতাব্দীর মুজাহিদগণ শুরু থেকে এই লক্ষ্যেই কাজ করে গেছেন। ইরাকে যখন দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় তখন আল-কায়দার কয়েকজন শাইখ বলেছেন, আল্লাহ চাহে তো এই দাওলাহ খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করবে। যেমন শাইখ ইমাম

[37] আল-ফাসলঃ ৪/৮৭

আনওয়ার আল-আওলাক্বী। আর ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী একাধিক বক্তব্যে এবং একাধিক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট করেই এব্যাপারে বলেছেন। তিনি এক বক্তব্যে বলেন, এই দাওলাহ ফিলিস্তিন বিজয়ের দ্বার উন্মোচন করবে এবং ইসলামী খিলাফাহ’র রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করবে। শাইখুল মুজাদ্দিদ উসামা ﷺ -ও তার "السبيل لأحباط المؤامرات" বক্তব্যে এরই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। বর্তমানে দাওলাহ যে কর্মপদ্ধতিতে এগিয়ে চলছে শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷺ সর্বশেষ বক্তব্যে সেই কর্মপদ্ধতির কথাই বলেছিলেন। আর তিনি ইরাক প্রসঙ্গে দেওয়া বক্তব্যের মাঝে বলেছিলেন যে, মুসলিমদের এমন একটি রাষ্ট্র হবে–যার সীমানা হবে এক মহাসাগর থেকে আরেক মহাসাগর। শাইখের দেওয়া মুসলিমদের রাষ্ট্রের রূপরেখা এমনই ছিল। দাওলাহ এই লক্ষ্যপানেই এগিয়ে চলছে। আর এটা খিলাফাহ ব্যতীত সম্ভব নয়। কাফিরদের অঙ্কিত সীমানাধীন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা সম্ভব নয়। দাওলাতুল ইসলাম মুসলিম উম্মাহ’র জন্য খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করেছে শারয়ী ওয়াজিব পালনার্থে। আর এই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি পরিপূর্ণভাবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি অনুসারে হয়েছে। দাওলাতুল ইসলাম এমন সময় খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে যখন দাওলাহ’র নিকট খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা না করার শারয়ী কোন উজর বাকি ছিল না। ইমাম জুআইনী ﷺ ‘গিয়াছী’ গ্রন্থে বলেন, “সামর্থ্য থাকা অবস্থায় ইমাম তথা খলীফাহ নিয়োগ করা ওয়াজিব।” আর আমরা জানি যে, শারয়ী কোন উজর ছাড়া ওয়াজিব পালনে বিরত থাকা ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

সুতরাং দাওলাতুল ইসলামের নিকট খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা না করার শারয়ী কোন উজর অবশিষ্ট ছিল না। দাওলাহ এমন এক সময় খিলাফাহ ঘোষণা দিয়েছে যখন মুসলিম উম্মাহ ছিল শতধা বিভক্ত, বিশেষত জিহাদী দলগুলো এবং জিহাদের দাবিদার দলগুলো। যখন জুলানী আবু বকর আল-বাগদাদী ﷺ -এর বাইআত ভঙ্গ করে আইমান যাওয়াহিরীকে বাইআত প্রদান করে এবং আইমান যাওয়াহিরীও জুলানীর বাইআত গ্রহণ করে, তখন শামে মুজাহিদগণের মাঝে বিভক্তি শুরু হয়। আর আইমান যাওয়াহিরী অনধিকার চর্চামূলক শারয়ী ও সিয়াসী বহির্ভূত নির্দেশ

দিতে থাকে–শারয়ী দিক থেকে যে নির্দেশ প্রদানের বৈধতা তার ছিল না।[38] এদিকে সাহওয়াতদের পক্ষ থেকে একের পর এক গাদ্দারির কারণে শামে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। সাহওয়াতরা দাওলাহ'র মুহাজির মুজাহিদগণের উপর হামলা করার পর দাওলাহ যখন প্রতিরক্ষামূলক তাদের উপর হামলা করল তখন তারা চিৎকার চেঁচামেচি করে দাওলাহ'কে দোষারোপ করতে থাকল। আর আইমান যাওয়াহিরী সাহওয়াতদের পক্ষ নিয়ে দাওলাহ'কে শামের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি ছেড়ে দিয়ে ইরাকে ফিরে আসার আহ্বান জানাল–যা শারয়ী ও সিয়াসী দিক থেকে অযৌক্তিক। এবং যাওয়াহিরী সাহওয়াতদের দাবিকৃত ও স্বাধীন আদলতে যাওয়ার আহ্বান জানাল। দাওলাতুল ইসলামের তৎকালীন মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী আশ-শামী رحمه الله বলেছিলেন, তারা যে স্বাধীন আদালতের কথা বলেছে সেটা নিরপেক্ষ কোন আদালত নয়। শাইখ আদনানী বলেছেন, ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী মুসলিমদেরকে দুই শিবিরে বিভক্ত করেছেন। এক শিবির হচ্ছে যারা দাওলাহ এবং এর আনসারদের সাথে রয়েছে আর আরেক শিবির হচ্ছে যারা স্বাধীন আদালতের কথা বলছে। তাই যেহেতু পৃথিবীতে এমন কোন স্বাধীন, যোগ্য কর্তৃপক্ষ পাওয়া যাবে না যাদের প্রতি উভয় শিবির সম্মত হবে তাই দাওলাহ'র পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম তথা খলীফাহ নির্ধারণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এই আহ্বান সর্বপ্রথম ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরীকে উদ্দেশ্য করে করা হয়। কিন্তু আল-কায়দার পক্ষ থেকে এ আহ্বানে কোন সাড়া দেওয়া হয়নি। আর খিলাফাহ ঘোষণার জন্য যেহেতু দাওলাহ'র কোন শারয়ী উজর অবশিষ্ট ছিল না এবং দাওলাতুল ইসলাম খিলাফাহ ঘোষণার প্রতিটি উপাদানের অধিকারী ছিল তাই আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে দাওলাতুল ইসলাম উম্মাতে মুসলিমার জন্য খিলাফাহ ঘোষণা করেছে। ডাক্তার যাওয়াহিরী কর্তৃক মুসলিম উম্মাহ'কে বিভক্ত করার পর তা দূরীকরণের একমাত্র উপায় ছিল একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা। কারণ একজন খলীফাহ'র অধীনেই মুসলিম উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ হয়। শামে সাহওয়াতরা গাদ্দারি করে দাওলাতুল ইসলামের উপর আক্রমণ করার পর ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী শুরুর

[38] আমরা মোনাসেব স্থানে দলিলসহ বিষয়টি উল্লেখ করব ইনশা'আল্লাহ।

দিকে সাহওয়াতদেরকে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে বলেছিল। কিন্তু ডাক্তার যাওয়াহিরীর অনুগত সৈনিক জুলানীসহ আল-কায়দার মিত্র গোষ্ঠী তার এ আহ্বানে কোন সাড়া দেয়নি। বরং আইমান যাওয়াহিরী যখন দাওলাহ’র বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে থাকল তখন তাদের আক্রমণের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পেল। আর দাওলাহ যখন নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে পাল্টা আক্রমণ করল তখন তারা এ সমস্যার নিষ্পত্তির দাবি জানাল। দাওলাতুল ইসলাম তখন মুসলিম উম্মাহ’র সামনে এই সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য এক উত্তম সমাধান পেশ করল। তা হল একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা। কারণ কেবলমাত্র একজন খলীফাহ’র আদেশ-নিষেধ সকল মুসলিম উম্মাহ মানতে বাধ্য। ইমাম কুরতুবী رحمه الله সুরা বাকারাহ’র ৩০ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, “এই আয়াত হল একজন ইমাম ও খলীফাহ নিয়োগ করার ব্যাপারে একটি মূলনীতি–যার আনুগত্য করা হবে যাতে কালিমা এক হয় এবং খলীফাহ’র হুকুমগুলো এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।” সুতরাং কেবলমাত্র একজন খলীফাহ’র আদেশ সকলে মানতে বাধ্য। কারণ ডাক্তার সাহেবের আদেশ না দাওলাহ মানতে বাধ্য আর না তার মিত্র সাহওয়াত গোষ্ঠী মানতে বাধ্য। তাই খিলাফাহ ঘোষণা ছিল সঠিক এবং সময়োপযোগী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। কিছুক্ষণের জন্য আমরা আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় ছিলাম। তাই চলুন আমরা আমাদের মূল আলোচনা–খিলাফাহ এবং খলীফাহ’র ব্যাপারে শারয়ী দিক নির্দেশনাতে ফিরে যাই। খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা এবং একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা ওয়াজিব–এব্যাপারে আমরা কিছুক্ষণ পূর্বেই আলোচনা করেছি। আমরা এখন দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ ঘোষণার শারয়ী দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশা’আল্লাহ।

আমরা পূর্বেই প্রমাণসহ বলেছি, মুসলিম উম্মাহ’র জন্য একজন খলীফাহ নিয়োগ করা ওয়াজিব। ইমাম জুআইনী رحمه الله বলেছেন, “সামর্থ্য থাকা অবস্থায় ইমাম নিয়োগ করা ওয়াজিব।” আর মুসলিমদের জন্য একজন খলীফাহ নিয়োগ করার সকল সামর্থ্য দাওলাতুল ইসলামের ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে ইরাক ও শামের বিস্তৃত অঞ্চল ছিল দাওলাহ’র নিয়ন্ত্রে। নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিগুলো আল্লাহ عز وجل -এর শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হচ্ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মুহাজির মুজাহিদগণ

দাওলাহ'র ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। দাওলাতুল ইসলামের শুরা কাউন্সিল এবং আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের নিকট খিলাফাহ ঘোষণা না করার ক্ষেত্রে এমন কোন উজর বাকি ছিল না যা তাদেরকে গুনাহ মুক্ত করবে–যেহেতু খলীফাহ নিয়োগ করা ওয়াজিব। এই খিলাফাহ নিয়োগ করার উদ্দেশ্য কী? আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইমামত তথা নেতৃত্বের উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۝

"তারা এমন যাদেরকে আমরা যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।"[39] শক্তি ও ক্ষমতা হাসিলের লক্ষ্য হচ্ছে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা এবং হুদুদ বাস্তবায়ন করা। সবচেয়ে মহান সৎকাজ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা আর সবচেয়ে গুরুতর অসৎকাজ শিরক–তা দূর করা। এগুলো বাস্তবায়নের জন্য একজন খলীফাহ নিয়োগ করা আবশ্যক। মাওয়ারদী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "নেতৃত্ব গঠন করা হয়েছে দ্বীনের নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং দ্বীন দ্বারা দুনিয়া পরিচালনা করার ক্ষেত্রে নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।"[40] এই শারয়ী ওয়াজিব বিষয় 'ইমাম নিয়োগ করা' কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে? যেহেতু ইমাম নিয়োগ করা একটি শারয়ী ওয়াজিব বিষয় তাই এই ওয়াজিব পালনের পদ্ধতি শারীয়াহ থেকেই গৃহীত হবে। কোন মানুষের চিন্তাপ্রসূত মূলনীতি বা কোন ব্যক্তির ভালো মনে করা অথবা কল্পিত মাসলাহার ভিত্তি থেকে নেওয়া হবে না। আমরা অনেককে দেখি, তারা শারীয়াহ'র মূলনীতিকে পিছনে ছুড়ে ফেলে বিভিন্ন মাসলাহার পিছনে দৌঁড়ায়। তারা খিলাফাহ'র বিরোধিতা করে এই অজুহাতে যে, এই খিলাফাহ তাদের কল্পনাপ্রসূত মাসলাহার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই খিলাফাহ

---

[39] সুরা হাজ্জঃ ৪১

[40] আহকামুস সুলত্বনিয়্যাহ

পরিপূর্ণরূপে শারয়ী শর্তসমূহ পূরণ করেছে। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হল খলীফাহ নিয়োগের শারয়ী দিকগুলো জানা এবং কল্পিত মাসলাহার পিছনে না ছুটে শারয়ী পদ্ধতির আলোকে দাওলাতুল ইসলামের খলীফাহ নিয়োগ পক্রিয়াকে মূল্যায়ন করা। তাই আসুন আমরা জেনে নেই খলীফাহ নিয়োগের পদ্ধতি।

খলীফাহ তথা ইমাম নিয়োগের পদ্ধতি দুইটিঃ

১. নিষিদ্ধ পদ্ধতি। ২. শারয়ীসিদ্ধ পদ্ধতি।

প্রথমতঃ নিষিদ্ধ পদ্ধতি। কোন পরামর্শ ছাড়া শক্তির মাধ্যমে বলপ্রয়োগকারী খলীফাহ। বলপ্রয়োগকারী ব্যক্তি যদি ইমামত তথা নেতৃত্বের স্বার্থসমূহ বাস্তবায়ন করেন - যেমন দ্বীনের নিরাপত্তা প্রদান ও দুনিয়া পরিচালনা করা - তাহলে এক্ষেত্রে দুইটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ

- ১. ক্ষমতা হাসিল হওয়ার কারণে তার ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যাবে যে ক্ষমতার মাধ্যমে তিনি দ্বীনের নিরাপত্তা প্রদান করবেন এবং দুনিয়া পরিচালনা করবেন।
- ২. পরামর্শ বিহীন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খিলাফাহ’র দায়িত্ব গ্রহণ করার কারণে তিনি পাপী হবেন।

কেননা তিনি হারাম উপায়ে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে ইমামতের স্বার্থসমূহ পূরণ করেছেন। তাই তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে। যেহেতু তিনি হারাম পদ্ধতিতে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করেছেন তাই হারাম পদ্ধতির জন্যে তিনি পাপী হবেন। কিন্তু তিনি ইমামতের মাকসাদ বাস্তবায়ন করার কারণে তার ইমামত সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর ইমামত সাব্যস্ত হওয়ার সাথে ইমামতের গঠন প্রক্রিয়া হালাল হারামের কোন সম্পর্ক নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, “হালাল হারামের বিষয়টি কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিপরীতে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার বিষয়টি অর্জিত ক্ষমতাকে বুঝায়। তাই কখনো এই শাসন ক্ষমতা আল্লাহ এবং তার রাসুলের পছন্দমাফিক হয়

–যেমন খুলাফায়ে রাশিদাহ’র শাসন ক্ষমতা। আর কখনো তা অবাধ্যতার ভিত্তিতে হয়–যেমন জালিমদের শাসন ক্ষমতা।”

ইবনে বাত্তাল বলেন, “ফক্বীহগণ এব্যাপারে একমত যে, বলপ্রয়োগকারী শাসকের আনুগত্য করা আবশ্যক যতদিন তিনি জুমুআর সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ঈদের জামাআতের ব্যবস্থা করবেন, জিহাদ চালিয়ে যাবেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার করবেন। তারা আরো একমত যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য করাই কল্যাণকর। কারণ এতেই রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা রয়েছে।”

সুতরাং এটা স্পষ্ট হল যে, এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইমামতের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া। যদি ইমামতের উদ্দেশ্য হাসিল হয়–যদিও তা হারাম পদ্ধতিতে অর্জিত হয় তথাপি খিলাফাহ ব্যবস্থা সহীহ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ শারয়ীসিদ্ধ পদ্ধতি। শারয়ীসিদ্ধ পদ্ধতি হল ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জন করা। এটা কয়েক মাধ্যমে হতে পারেঃ

- ১. পূর্বের খলীফাহ’র পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারী করে যাওয়া।
- ২. আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত প্রদান করা।

প্রথমঃ উত্তরাধিকারী করে যাওয়া। যদি ইমাম তার পরে একজনকে খলীফাহ হিসেবে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যায় অতঃপর তার জন্য ক্ষমতা ও প্রভাব হাসিল হয় যার মাধ্যমে ইমামতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় তাহলে খিলাফাহ ব্যবস্থা সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি উত্তরাধিকারী ইমামের ক্ষমতা ও প্রভাব হাসিল না হয় তখন দুইটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

- ১. পন্থাটি শারয়ীসিদ্ধ যাতে কোন পাপ নেই।
- ২. এই অবস্থায় কি খিলাফাহ ব্যবস্থা সহীহ হবে?

সঠিক কথা হচ্ছে খিলাফাহ ব্যবস্থা বাতিল হবে। কারণ এর মাধ্যমে খিলাফাহ’

র উদ্দেশ্য—ক্ষমতা ও প্রভাব অর্জন হয়নি।

ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, “এমনিভাবে আবু বকর رضي الله عنه যখন ওমার ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه কে খলীফাহ হওয়ার অসিয়ত করে গেছেন তখন তিনি একারণে খলীফাহ হয়েছেন যে, তারা তাকে বাইআত দিয়েছে এবং তার আনুগত্য করেছে। যদি তারা আবু বকরের প্রতিশ্রুতি পালন না করে তাকে বাইআত না দিত তাহলে তিনি খলীফাহ হতেন না। তাদের একাজ বৈধ হোক বা অবৈধ হোক তা সমান। হালাল হারামের বিষয়টি কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। বিপরীতে নেতৃত্ব ও শাসন ক্ষমতার বিষয়টি অর্জিত ক্ষমতাকে বুঝায়। তাই কখনো এই শাসন ক্ষমতা আল্লাহ এবং তার রাসুলের পছন্দমাফিক হয়—যেমন খুলাফায়ে রাশিদাহ’র শাসন ক্ষমতা। আর কখনো তা অবাধ্যতার ভিত্তিতে হয়—যেমন জালিমদের শাসন ক্ষমতা।” সুতরাং পদ্ধতি শারয়ীসিদ্ধ হওয়াটা ইমাম বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক করে না। এমনিভাবে পদ্ধতি হারাম হওয়াটা (বলপ্রয়োগকারী ইমামের ক্ষেত্রে) ইমামত বাতিল হওয়া আবশ্যক করে না। যেমনটি আমরা ইবনে তাইমিয়্যাহ থেকে উল্লেখ করেছি।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইমামতের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া। যদি হারাম পদ্ধতিতে খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য হাসিল হয় তাহলে খিলাফাহ ব্যবস্থা সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি শারয়ীসিদ্ধ পদ্ধতিতে খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য হাসিল না হয় তাহলে খিলাফাহ ব্যবস্থা বাতিল বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয়ঃ আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত প্রদান করা।

এপর্যায়ে আমাদের জানা দরকার আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ কারা? আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ হচ্ছে- আলেম, মানুষের মাঝে মর্যাদাবান এবং নীতিনির্ধারক ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদের মাধ্যমে ইমাম নির্বাচন সম্পন্ন হয়।

আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের মাঝে বাস্তবায়িত আবশ্যকীয় শর্তগুলো কী? আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের মাঝে বাস্তবায়িত আবশ্যকীয় শর্তগুলো হলঃ

- ১. ন্যায়পরায়ণতা–যা আরো কিছু শর্তকে আবশ্যক করে- যেমন ইসলাম, আক্বলওয়ালা হওয়া, বালেগ হওয়া, ফাসিক্ব না হওয়া এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া।
- ২. এমন ইলম (জ্ঞান) থাকা যার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য শর্তের ভিত্তিতে নেতৃত্বের যোগ্য ব্যক্তিকে চিনতে পারা যায়।
- ৩. এমন চিন্তা ও প্রজ্ঞা থাকা যা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে সম্পন্ন করে।
- ৪. ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া।
- ৫. ইখলাছ থাকা এবং মুসলিমদের জন্য কল্যাণকামী হওয়া।

এবার জানা প্রয়োজন কে আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন করবে? এখানে অবস্থা দুইটিঃ খলীফাহ থাকা অবস্থা এবং খলীফাহ না থাকা অবস্থা।

খলীফাহ থাকা অবস্থার ক্ষেত্রেঃ খলীফাহ তাদেরকে নির্বাচন করবে যেন তারা তার পরে একজন খলীফাহ নির্ধারণ করতে পারে যেমনটি করেছিলেন ওমার ইবনে খাত্তাব رضي الله عنه , তিনি আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের ছয়জনকে নির্বাচন করেছিলেন যেন তারা তার পরে তাদের মধ্য থেকে একজনকে মুসলিমদের জন্য খলীফাহ নির্ধারণ করে।

খলীফাহ না থাকা অবস্থার ক্ষেত্রেঃ উপস্থিতির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে–যখন আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের একদল খলীফাহ নির্ধারণ না করবে তখন তাদের মধ্য থেকে যার উপস্থিত থাকা সহজ হবে তার মাধ্যমে বাইআত সংঘটিত হবে। আর উপস্থিত হওয়াটা নিয়োগের স্থলাভিষিক্ত হবে।

খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য কি সকল আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের ইজমা (ঐক্যমত) থাকা অথবা অধিকাংশ আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত বা নির্দিষ্ট সংখ্যক আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত আবশ্যক?

সকল আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত অথবা অধিকাংশ আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত বা নির্দিষ্ট সংখ্যক আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত আবশ্যক নয়। বরং যারা একত্রিত হতে পারবে এবং যাদের উপস্থিত হওয়া সহজ হবে তারাই যথেষ্ট হবে। যদিও সেটা একজন হয়। কিন্তু শর্ত হচ্ছে তাদের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সুতরাং আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাদের সমবেত হওয়া সহজ হবে তাদের বাইআত প্রদান করা যথেষ্ট হবে।

ইমাম জুআইনী رحمه الله বলেন, “ইজমার ভিত্তিতে এটা একটি অকাট্য বিষয় যে, খিলাফাহ’র চুক্তির ক্ষেত্রে ঐক্যমত শর্ত নয়।”

ইমাম নববী رحمه الله বলেন, “সকল আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, বাইআত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সকল মানুষের বাইআত দেওয়া শর্ত নয় এবং আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গেরও বাইআত দেওয়া শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে আলেম-উলামা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও মানুষের মাঝে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিতি সহজ হবে তাদের বাইআত দেওয়া।”[41]

উম্মাহ’র প্রতিটি অঞ্চলের আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের কি খলীফাহ’কে বাইআত দেওয়া জরুরী?

এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম رحمه الله বলেন, “পক্ষান্তরে যে বলে, বিভিন্ন দেশের ভূখণ্ডে থাকা উম্মাহ’র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বাইআত ব্যতীত খিলাফাহ সহীহ হবে না–তার কথা বাতিল। কারণ তাহলে এমন একটি ব্যাপার চাপিয়ে দেওয়া হবে যা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে এবং সাধ্যাতীত। আর এটা অনেক কষ্টের কাজ। অথচ আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ عز وجل বলেন, “দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি।”[42]

[41] শরহুন নবাবীঃ ১২/৭৭

[42] সুরা হাজ্জঃ ৭৮

তাছাড়া বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ অধিবাসীদের একশ ভাগের এক ভাগ একমত হওয়ার পূর্বেই মুসলিমদের জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে নিশ্চিত। সুতরাং এই ভ্রান্ত মতটি বাতিল। তবে এতোকিছু সত্ত্বেও যদি কাজটি সম্ভবও হয় তবুও সেটি মানা আবশ্যক নয়। কারণ এটি দলিলহীন একটি দাবি মাত্র।"[43]

আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের জুমহুর বা অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের বাইআত ব্যতীত খিলাফাহ বিশুদ্ধ হবে না–এটা একটি বাতিল উক্তি। যদি এ উক্তি সঠিক হয় তাহলে আলী رضي الله عنه -এর খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হবে। কারণ আমরা জানি যে, আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের জুমহুর ব্যক্তিবর্গ আলী رضي الله عنه কে বাইআত দেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, "অনেক সংখ্যক সাহাবী আলী رضي الله عنه কে বাইআত দেননি। যেমন ইবনে ওমার এবং তার মত অন্যান্য সাহাবীগণ। তখন তার ব্যাপারে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলঃ একশ্রেণী তার সাথে মিলে যুদ্ধ করেছিল। আরেক শ্রেণী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। এছাড়া আরেক শ্রেণী ছিল যারা তার সাথে মিলে যুদ্ধ করেনি এবং তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেনি।"[44] অতঃপর তিনি এই অনেক সংখ্যকের পরিমাণ বর্ণনা করেছেন। তার বক্তব্যঃ "আর আলী যখন খিলাফাহ'র দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন অগ্রগামী মুহাজির ও আনসারদের মধ্য থেকে এবং তারা ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি মুসলিমরা তাকে বাইআত দেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। যারা তাকে উপেক্ষা করেছিল তাদের কেউ তার সাথে মিলে যুদ্ধ করেনি এবং তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেনি। যেমন উসামা বিন যায়েদ, ইবনে ওমার এবং মুহাম্মাদ বিন মাসলামা। আর তাদের কেউ কেউ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। অতঃপর যারা তাকে বাইআত দিয়েছিল তাদের অনেকেই তার থেকে ফিরে গেছে–তাদের একাংশ তাকে তাকফীর করে তার রক্ত হালাল সাব্যস্ত করেছে আর তাদের আরেকাংশ মুআবিয়া رضي الله عنه -এর নিকট চলে

[43] আল-ফাসল ফীল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান-নিহালঃ ৩/৮৪

[44] মিনহাজুস সুন্নাহ

গেছে। যেমন তার ভাই আকীল এবং অন্যরা।”[45]

সুতরাং খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের জুমহুর ব্যক্তিবর্গের বাইআতকে শর্ত করলে আলী رضي الله عنه -এর খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। অথচ আমরা জানি, আলী رضي الله عنه -এর খিলাফাহ নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ ছিল।

আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের বাইআতের ব্যাপারে শামের কাযী শাইখুল ইসলাম বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ رحمه الله বলেন, “বাইআত প্রদানকারীদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যা শর্ত নয়। বরং বাইআত সংঘটিত হওয়ার সময় যাদের উপস্থিত থাকা সহজ হয় তারাই যথেষ্ট হবে।”[46]

সুতরাং খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গের বাইআত শর্ত নয়। এবং আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের অধিকাংশ বা নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গের বাইআতও শর্ত নয়। কারণ অধিকাংশের বাইআত শর্ত করা হলে আলী رضي الله عنه -এর খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কেউ কেউ দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ’র বিরোধিতা করে এই ভিত্তিতে যে, তা আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের বাইআত দ্বারা প্রতিষ্ঠা হয়নি। তারা সালাফগণের কথাকে অগ্রাহ্য করে খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য অধিকাংশের বাইআতকে শর্ত করে। সালাফগণ এটাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করেন নি। তবে খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে খলীফাহ’র জন্য ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত হওয়া। আর এই ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়ার মাধ্যমে হতে পারে, যেমন উসমান বিন আফফান رضي الله عنه -এর বাইআতের ঘটনা। কিংবা তা হতে পারে আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়ার মাধ্যমে—যেমন আবু বকর رضي الله عنه -এর বাইআতের ঘটনা। অথবা তা হতে পারে আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের কিছু

---

45 মিনহাজুস সুন্নাহ

46 তাহরীরুল আহকাম ফি তাদবীরি আহলিল ইসলাম

ব্যক্তির বাইআত প্রদানের মাধ্যমে—যেমন আলী رضي الله عنه -এর বাইআতের ক্ষেত্রে। এখানে বিবেচ্য বিষয় হল ইমামত তথা খিলাফাহ’র মাকসাদ অর্জিত হওয়া। যদি সেই মাকসাদ মান্যবর একজন ব্যক্তির মাধ্যমে হাসিল হয় তাহলেও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله বলেন, “আহলুস সুন্নার নিকট প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়ার মাধ্যমেই খিলাফাহ গঠিত হবে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ ইমাম হবে না যতক্ষণ না তার সঙ্গে একমত হয় প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এমন কিছু ব্যক্তি, ইমামের প্রতি যাদের আনুগত্যের মাধ্যমে খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। কারণ খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে ক্ষমতা ও আনুগত্যের মাধ্যমে। সুতরাং যদি এমন একটি বাইআহ সংঘটিত হয় যার মাধ্যমে ক্ষমতা ও সালতানাত অর্জিত হয় তাহলে তিনি খলীফাহ হয়ে যাবেন।” তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী না হলেও দু’একজন একমত হওয়ার দ্বারাই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে, তার কথা ভুল।”

উল্টো অর্থে কথাটি এমন দাড়ায়, যে ব্যক্তি এমন কথা বলবে যে, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এমন দু’একজন একমত হলেই কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে যাবে, তার কথা ভুল নয়। কিছু আহলুল ইলমগণের বক্তব্য থেকে এই কথাটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইমাম নববী رحمه الله বলেন, “এমনকি আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ যদি একজন মান্যবর ব্যক্তিও হয়, তবুও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার বাইআত যথেষ্ট।”[47]

আল্লামা কলকাশন্দী رحمه الله বলেন, “বাইআত সংঘটিত হওয়ার মুহূর্তে আলেম-উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিত থাকা সম্ভব তাদের বাইআতের মাধ্যমেই খিলাফাহ সংঘটিত হয়ে যাবে। এমনকি আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের যদি একজন মান্যবর ব্যক্তিও হয়, তবুও খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত

[47] রওদাতুত ত্বলিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীনঃ ১০/৪৩

হওয়ার জন্য তার বাইআত যথেষ্ট।"

ইমাম জুআইনী رحمه الله বলেন, "একজন গণ্যমান্য ও নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুসৃত কোন ব্যক্তি যদি বাইআত প্রদান করেন এবং তার বাইআতের মাধ্যমে ইমামের জন্য প্রভাব-প্রতিপত্তি তৈরি হয় তাহলে খিলাফাহ প্রতাষ্ঠিত হয়ে যাবে।"

আল্লামা মুহাম্মদ আমীন শানক্বীতী رحمه الله 'আদওয়াউল বায়ান' গ্রন্থে বলেন, "মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে উল্লেখিত ইবনে তাইমিয়্যাহ'র কথা থেকে বুঝা যায় যে, খিলাফাহ এমন ব্যক্তিবর্গের বাইআতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে যাদের মাধ্যমে ইমামের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং যাবতীয় বিধিবিধান বাস্তবায়নে তিনি সক্ষম হবেন। কারণ যার কোন ক্ষমতা নেই তিনি খলীফাহ হতে পারেন না।" এটিই প্রতিষ্ঠিত মত। কারণ আমাদের কাছে বিবচ্য বিষয় হলো, খিলাফাহ'র লক্ষ্য অর্জিত হওয়া। আমাদের লক্ষ্য হলো, আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা, সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের কোন বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে খুশি করা আমাদের লক্ষ্য নয়।

সুতরাং শাসনকার্যে লক্ষ্য অর্জিত হওয়াই মূল উদ্দেশ্য। যখন লক্ষ্য অর্জিত হবে তখন খিলাফাহ সহীহ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যখন লক্ষ্য অর্জিত না হবে তখন খিলাফাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ শারয়ীসিদ্ধ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উম্মাতে মুসলিমার আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআতের মাধ্যমে আবু বকর আল-বাগদাদী খলীফাহ নির্বাচিত হয়েছেন। দাওলাতুল ইসলামের অধীনে থাকা ইরাক ও শামের বিস্তৃত অঞ্চলের আলেম-উলামা, কমান্ডার ও প্রভাবশালী লোকদের বাইআতের মাধ্যমে আবু বকর আল-বাগদাদী খলীফাহ নির্বাচিত হয়েছেন। কেউ কেউ বলে থাকে, আবু বকর আল-বাগদাদীকে তো সকল মানুষ বাইআত দেয়নি তাই তিনি কিভাবে খলীফাহ হবেন!

আমরা পূর্বে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার শারয়ীসিদ্ধ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করার সময় বলেছি, খলীফাহ হওয়ার জন্য সকল মানুষের বা আহলুল হাল্লী ওয়াল-

আকদের সকল ব্যক্তিবর্গের বাইআত দেওয়া শর্ত নয়। বরং আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে যাদের বাইআত দেওয়া সহজ হবে তাদের বাইআতই খলীফাহ নিয়োগের জন্য যথেষ্ট হবে।

ইমাম নববী رحمه الله বলেন, “সকল আলেমগণ এব্যাপারে একমত যে, বাইআত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য সকল মানুষের বাইআত দেওয়া শর্ত নয় এবং আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গেরও বাইআত দেওয়া শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে আলেম-উলামা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও মানুষের মাঝে মর্যাদাবান ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিতি সহজ হবে তাদের বাইআত দেওয়া।”[48]

শাইখ কালকাশন্দী মাআসিরুল গ্রন্থে বলেন, “অষ্টম বিষয় হল - শাফেয়ী মাজহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী খিলাফাহ সংঘটিত হয়ে যাবে বাইআতের সময় ঐ স্থানে আলেম, সামরিক কমান্ডার ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিতি সহজ হয় তাদের বাইআত প্রদানের মাধ্যমে। অবশ্য তাদের সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হওয়ার জন্য যেসব গুণাবলী প্রয়োজন সেসব গুণের অধিকারী হতে হবে। এমনকি আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির বাইআত প্রদানের মাধ্যমে খিলাফাহ সংঘটিত হয়ে যাবে।”[49]

আমীরুল মু’মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদীর খিলাফাহ আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআতের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গের বাইআত লাগবে এটা মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মত। আর খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য অধিকাংশ মানুষের বাইআত লাগবে–এটা গণতন্ত্রপন্থিদের মূলনীতি; কারণ তারা অধিকাংশের মতের উপর নির্ভরশীল। এই সব মত প্রত্যাখ্যাত। এর স্বপক্ষে কোন দলিল নেই।

কেউ কেউ বলে, দাওলাতুল ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীতে তো আরো অনেক

---

[48] শরহুন নববীঃ ১২/৭৭

[49] মাআসীরুল ইনাফা ফী মাআলিমীল খিলাফাহঃ পৃঃ ২৩

জায়গায় জিহাদী সংগঠন ছিল যারা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিল, সেই সকল সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে ভূমি ছিল। সে সমস্ত ভূমির আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের সম্মতি ছাড়া বা তাদের বাইআত ছাড়া দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ সহীহ হয় কিভাবে?

পূর্বেই আমরা সালাফগণের বক্তব্য থেকে জানতে পেরেছি যে, খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গের বাইআত বা আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের জুমহুর ব্যক্তিবর্গের বাইআত শর্ত নয় এবং প্রতিটি ভূখণ্ডের আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত শর্ত নয়। কারণ এটা একটি অসম্ভব সাধ্যাতীত কাজ।

ইমাম ইবনে হাযম رحمه الله বলেন, “পক্ষান্তরে যে বলে, বিভিন্ন দেশের ভূখণ্ডে থাকা উম্মাহ’র শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের বাইআত ব্যতীত খিলাফাহ সহীহ হবে না–তার কথা বাতিল। কারণ তাহলে এমন একটি ব্যাপার চাপিয়ে দেওয়া হবে যা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে এবং সাধ্যাতীত। আর এটা অনেক কষ্টের কাজ। অথচ আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। আল্লাহ تعالى বলেন, “দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি।”[50] তাছাড়া বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ অধিবাসীদের একশ ভাগের এক ভাগ একমত হওয়ার পূর্বেই মুসলিমদের জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে নিশ্চিত। সুতরাং এই ভ্রান্ত মতটি বাতিল। তবে এতোকিছু সত্ত্বেও যদি কাজটি সম্ভবও হয় তবুও সেটি মানা আবশ্যক নয়। কারণ এটি দলিলহীন একটি দাবি মাত্র।”[51]

সুতরাং যারা বলে, বিভিন্ন অঞ্চলের মুজাহিদ আমীরগণের বাইআতের মাধ্যমে যেহেতু আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله -এর খিলাফাহ সংঘটিত হয়নি তাই তার খিলাফাহ সহীহ নয়–তাদের এ দাবি সালাফগণের কথার বিপরীত। বরং তাদের এ দাবি যদি সঠিক হয় তাহলে আলী رضي الله عنه -এর খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হবে। কারণ

---

50 সুরা হাজ্জঃ ৭৮

51 আল-ফাসল ফীল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান-নিহালঃ ৩/৮৪

অনেক জলীলে ক্বদর সাহাবী আলী কে বাইআত দেননি এবং তাদের বাইআত ব্যতীতই তিনি খলীফাহ মনোনীত হয়েছেন। এমনকি তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ইবনে তাইমিয়্যাহ উল্লেখ করেছেন, প্রথমে অর্ধেকের মত মুসলিম আলী কে বাইআত দিয়েছিল। এরপর বাইআতবদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে একটি দল আলী কে পরিত্যাগ করে। তাই আমাদের নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী না হয়ে সাহাবীগণের আছার এবং সালাফগণের বক্তব্যের অনুসরণ করাই কল্যাণকর। আর আমরা দেখেছি, দাওলাতুল ইসলাম আবু বকর আল-বাগদাদী কে খলীফাহ মনোনীত করে ঘোষণা করার পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মুজাহিদগণ আবু বকর আল-বাগদাদী -এর খিলাফাহ'কে স্বীকৃতি দিয়ে তার আনুগত্যের উপর বাইআত দেন। সুতরাং আবু বকর আল-বাগদাদী -এর খলীফাহ হওয়ার পদ্ধতি এবং আলী -এর খলীফাহ হওয়ার পদ্ধতি একই।

আর কিছু ব্যক্তি বলে, দাওলাতুল ইসলাম আবু বকর আল-বাগদাদীকে খলীফাহ মনোনীত করার পূর্বে আল-কায়দার আমীর-উমারাদের সাথে পরামর্শ করেনি এবং তাদের বাইআতের মাধ্যমেও আবু বকর আল-বাগদাদী খলীফাহ হয়নি, অথচ অধিকাংশ জায়গায় জিহাদের ক্ষেত্রে আল-কায়দার ভূমিকা ছিল, তাহলে আবু বকর আল-বাগদাদীর খিলাফাহ সহীহ হয় কী করে?

প্রথমতঃ আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলাম যখন ইরাক ও শামের বিস্তৃত ভূমি বিজয় করে এবং এ বিজয়ের ধারা অব্যাহত রাখে তখন কাফিররা শামের সাহওয়াতদেরকে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। আর সাহওয়াতরাও বরাবরের মত গাদ্দারি করে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। এই সাহওয়াতদের সাথে যোগ দেয় বিশ্বাসঘাতক জুলানীর দল। শুরুর দিকে আল-কায়দা প্রধান আইমান যাওয়াহিরীর পক্ষ থেকে শামের সাহওয়াতদেরকে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলা হয় কিন্তু সাহওয়াতরা তার কথায় কর্ণপাত করেনি। এমনকি যাওয়াহিরীর অনুগত জুলানীর দলও তা মানেনি। এর কিছুদিন পর যাওয়াহিরী দাওলাহ'কে ইবনে মুলজিমের উত্তরসূরী আখ্যায়িত করে অপবাদ দেয়। এরপরেই শামের সাহওয়াতরা নব উদ্যমে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। অপরদিকে

দাওলাহ'র যুদ্ধের তীব্রতায় সাহওয়াতরা টিকতে না পেরে তথাকথিত নিরপেক্ষ শারয়ী আদালত গঠন করার দাবি জানায়। কিন্তু দাওলাহ তাদের দাবির পাত্তা দেয়নি। কেনইবা পাত্তা দিবে! যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তাদের আবার কিসের শারয়ী আদালত? বিশ্বাসঘাতকদের জন্য কি এটা শোভা পায় যে, তারা শারয়ী আদালত গঠন করবে? গতকালই তো তারা শারীয়াহ'কে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেছে! তাই দাওলাতুল ইসলাম পুরো উম্মাহ'র সামনে একটি সমাধান পেশ করল যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটে যাবে এবং প্রত্যেককেই তার হক্ব দেয়া হবে। পাশাপাশি মু'মিন ও সত্যবাদী মুজাহিদগণের মাঝে ঐক্য তৈরি হবে। সেই সমাধানটি ছিল মুসলিমদের জন্য একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা—যিনি আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হবেন, সকল তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবেন, আল্লাহর শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন। দাওলাতুল ইসলামের পক্ষ থেকে দাওলাহ'র মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷾ ১৪৩৫ হিজরীর রজব মাসে "عذرا أمير القاعدة" শিরোনামে এক অডিও বক্তব্যে আল-কায়দা প্রধান ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরীর প্রতি প্রস্তাব পেশ করেন যে, সকলেই মিলে যেন মুসলিম উম্মাহ'র জন্য একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা হয়—যিনি প্রকাশ্যে কাফিরদের প্রতি বারা ঘোষণা করবেন। আর দাওলাহ গঠন হওয়ার পর থেকে দাওলাহ'র উমারাগণ এ লক্ষ্যে চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু আল-কায়দা দাওলাহ'র এই প্রাস্তাবের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং এই প্রাস্তাবকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। তারা এই প্রাস্তাবের উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করেনি। তখন দাওলাহ আল্লাহর উপর ভরসা করে খলীফাহ নির্ধারণ করে এবং অবহেলিত এই ওয়াজিব আদায় করে। খিলাফাহ ঘোষণার পর আল-কায়দার উল্লেখযোগ্য অংশ খিলাফাহ'কে স্বীকৃতি দিয়ে খলীফাহ'র আনুগত্যের ছায়ায় চলে আসে আর বাকিরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে খিলাফাহ'র বিরোধিতা করতে থাকে। আল-কায়দা প্রধান ডাক্তার সাহেব দাবি করে, পরামর্শ করা ছাড়াই যেহেতু খিলাফাহ ঘোষণা করা হয়েছে তাই এই খিলাফাহ বৈধ নয়। অথচ খিলাফাহ ঘোষণার এক থেকে দেড় মাস পূর্বে বিশেষভাবে ডাক্তার সাহেবকে উদ্দেশ্য করে দাওলাহ খিলাফাহ ঘোষণার প্রাস্তাব পেশ করেছিল। ডাক্তার সাহেব তখন কোন উত্তর দেয়নি কিন্তু খিলাফাহ

ঘোষণার পর খোঁড়া যুক্তি দিয়ে খিলাফাহ’র বিরোধিতা শুরু করল। ডাক্তার সাহেবের অভিযোগ ছিল পরামর্শ ছাড়াই এ খিলাফাহ ঘোষণা করা হয়েছে তাই এই খিলাফাহ বৈধ নয়। সুতরাং খিলাফাহ ঘোষণার পূর্বে আল-কায়দার সাথে পরামর্শ করা হয়নি বা তাদেরকে বলা হয়নি দাবিটা সুস্পষ্ট মিথ্যা। কারণ খিলাফাহ ঘোষণা করা হয়েছে রমাদানে আর আল-কায়দাকে আহ্বান জানানো হয়েছে রজব মাসে। কিন্তু আল-কায়দা কোন সাড়া দেয়নি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা ধরেই নিলাম, আল-কায়দা প্রধান আইমান যাওয়াহিরীসহ আল-কায়দার আমীর-উমারা আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য কি আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গের বাইআত বা পরামর্শ জরুরী? আমরা পূর্বে গ্রহণযোগ্য বেশ কয়েকজন সালাফগণের ইজমা উল্লেখ করেছি– যেমন ইমাম নববী, ইবনে তাইমিয়্যাহসহ অন্যান্যরা। তারা বলেছেন, খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য আহলু হাল্লী ওয়াল-আকদের সকল ব্যক্তিবর্গের বাইআত জরুরী নয়। যদি আল-কায়দার সম্মতি না থাকা বা আল-কায়দার সবাই বাইআত না দেওয়ার কারণে দাওলাতুল ইসলামের ঘোষণাকৃত খিলাফাহ সহীহ না হয় তাহলে আলী ﵁ -এর খিলাফাহ’র ক্ষেত্রে মুআবিয়াহ ﵁ সহ প্রায় অর্ধেকের বেশি মুসলিম আলী ﵁ কে বাইআত না দেওয়ার কারণে তার খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হওয়া লাযিম হয়ে যায়। কিন্তু আল-কায়দার আমীর-উমারা একথা বলার সাহস করবে না। আমরা পূর্বে ইবনে তাইমিয়্যাহ’র উক্তি উল্লেখ করেছি। তিনি সেখানে বলেছেন, আলী ﵁ কে প্রথম অর্ধেক সংখ্যক মুসলিম বাইআত দিয়েছিল এরপর সেই বাইআতবদ্ধ ব্যক্তিদের থেকে একটা অংশ বাইআত ভঙ্গ করে। কিন্তু এর কারণে আলী ﵁ -এর খিলাফাহ বাতিল হয়নি। বরং তিনিই সঠিক ছিলেন এবং তার বিরোধীরা ভুলের উপর ছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল খিলাফাহ-ই হল খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ এবং এই খিলাফাহ’র খলীফাহ, মন্ত্রীবর্গ, সৈনিকগণ ও প্রজাসাধারণ হক্বের উপর রয়েছেন আর এই খিলাফাহ’র বিরোধিতাকারীরা ভুলের উপর রয়েছে।

সকলের সাথে পরামর্শ করার পর বাইআত নেওয়ার ব্যাপারে আল-কায়দার

প্রতিষ্ঠাতা শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله বলেন, "এই অনুরূপ অবস্থার ক্ষেত্রে যদি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে পরামর্শ করার পরই কেবল নেতৃত্ব সম্পন্ন হত তাহলে পরামর্শ চাওয়া ছাড়াই ওমার رضي الله عنه আবু বকর رضي الله عنه কে বাইআত দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতেন না। আর আবু বকর رضي الله عنه বাইআত গ্রহণের জন্য তার হাত প্রসারিত করতেন না এবং অধিকাংশ সাহাবী رضي الله عنهم তাকে বাইআত দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নিতেন না।"[52]

কিছু ব্যক্তির অভিযোগ, কিভাবে আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله -এর খিলাফাহ সহীহ হবে অথচ তিনি কিছু অঞ্চল বলপ্রয়োগ করে দখল করেছেন, সেখানকার আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ তাকে বাইআত প্রদান করেনি!

যেসব অঞ্চল দাওলাহ জোরপূর্বক দখল করেছে এবং শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله -এর কর্তৃত্বে এসেছে, সেগুলো এমন কিছু লোকের নিয়ন্ত্রণে ছিল যারা সেসব অঞ্চল গাইরুল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করত। অতএব তাদেরকে সেখান থেকে শক্তির জোরে তাড়িয়ে দেওয়া এবং সেই অঞ্চল দখল করা ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ার অন্তর্ভুক্ত।

তর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নেই, আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله সেসব অঞ্চল জোরপূর্বক দখল করেছেন, তাহলেও তো তিনি মুসলিম শাসক, আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অতএব যতক্ষণ তিনি শারীয়াহ'কে আঁকড়ে ধরে থাকবেন ততক্ষণ তার আনুগত্য করা, তার আদেশ মান্য করা ওয়াজিব।

ইবনু হাজার رحمه الله এব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন, "সকল ফক্বীহ এ বিষয়ে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী সুলতানের আনুগত্য করা এবং তার সাথে মিলে জিহাদ করা আবশ্যক। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে তার আনুগত্য করা ভালো। কারণ বিদ্রোহ করলে রক্তপাত ঘটবে এবং অনেক ধ্বংসযজ্ঞ

52 আস-সাবীল লি-আহবাতিল মুআমারাত

সংঘটিত হবে।"[53]

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله বলেন, "সকল মাযহাবের সকল ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসক সব বিষয়ে বৈধ ইমামের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। যদি এমনটা না হয় (অর্থাৎ তার আনুগত্য করা না হয়) তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। কারণ অনেক আগে থেকে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের আগে থেকে এ পর্যন্ত কখনই সকল মানুষ একজন শাসকের ব্যাপারে একমত হয়নি।"[54]

এই যদি হয় জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে - যতক্ষণ সে আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী শাসন করে - আলেমদের বক্তব্য; তাহলে ঐ শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারটা কেমন হবে যে একনিষ্ঠ মুসলিম, আল্লাহর পথের মুজাহিদ, সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নকারী! আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই ধারণা করি আর আল্লাহই তার হিসাব গ্রহণকারী। অবশ্যই শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে সকল মুসলিম তার আনুগত্য করতে, তার কাছে হিজরত করতে এবং তাকে বাইআত প্রদান করতে বাধ্য।

খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য প্রত্যেক আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের বাইআত দেওয়া শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিদের বাইআত দেওয়া যাদের মাধ্যমে ইমামের জন্য ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত হবে। আর খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যেহেতু খলীফাহ'র ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জিত হওয়া শর্ত তাই আমাদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তথা 'তামকীন ও শাওকাহ' এর পরিচয় জানা জরুরী। নচেৎ বিষয়টি বোধগম্য হবে না। কারণ আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ হলেন, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ। তারা যদি ইমামের কথা শোনা ও মান্য করার উপর ভিত্তি করে তাকে বাইআত প্রদান করে তাহলে ইমামের

---

53 ফাতহুল বারীঃ ২০/৫৮

54 আদ-দুরারুস সানিয়্যাহঃ ৯/৫

জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা, দুনিয়াবি বিষয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং মানুষের নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব হবে।

শাওকাহ তথা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে ইমাম ইবনে আশুর তার তাফসীরে বলেন, “শক্তি-সামর্থ্য বুঝাতে شوكة শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন প্রচলিত আছে فلان ذو شوكة অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি শক্তির অধিকারী, যা দ্বারা প্রতিরোধশক্তির কাজ হয়।”

তামকীনঃ এর অর্থ–এই শব্দটির উৎপত্তি مكن يمكن تمكينا থেকে। ফায়েল হল مُمَكِّن আর مُمَكَّن হল এর মাফউল। مكّن له في شيء এর অর্থ হলো, সে তাকে কোন ব্যপারে ক্ষমতা দান করলো।

আল্লাহ তা’আলা বলেন,

اَلَّذِيۡنَ اِنۡ مَّكَّنّٰهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوۡا بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ نَهَوۡا عَنِ الۡمُنۡكَرِ‌ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الۡاُمُوۡرِ ۝

“তারা এমন যাদেরকে আমরা যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।”[55]

ইমাম ত্বাবারী رحمه الله বলেন, “অর্থাৎ যদি আমি তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করি, ফলে তারা সেখানে মুশরিকদেরকে পরাজিত করে। তারা সেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে। অর্থাৎ তারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যাদেরকে যাকাতের হকদ্বার বানিয়েছেন, তাদেরকে যাকাত প্রদান করে। তারা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করার পথে এবং ঈমানদার ব্যক্তিরা যে জ্ঞান রাখেন তার প্রতি আহ্বান করে।”

সুতরাং শাওকাহ ও তামকীন উভয় শব্দ দু’টিই শক্তি ও ক্ষমতার অর্থে

55 সুরা হাজ্জঃ ৪১

ব্যবহৃত হয়।

এখন প্রশ্ন হল খিলাফাহ সহীহ হওয়ার জন্য কতটুকু তামকীন প্রয়োজন?

উত্তর হল- তামকীন দুই প্রকারঃ

- ১. তামকীনে মুতলাক্ব বা পরিপূর্ণ তামকীন।
- ২. মুতলাক্বে তামকীন বা আংশিক তামকীন।

প্রথম প্রকার তামকীনে মুতলাক্ব বা পরিপূর্ণ তামকীনকে কোন বিবেকবান ব্যক্তি শর্ত মনে করতে পারে না। কেননা এর দ্বারা একটি সাধ্যাতীত বিষয় মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। যদিও আমরা কিছু ব্যক্তিকে দেখি, তারা খিলাফাহ বিশুদ্ধ না হওয়ার ক্ষেত্রে যুক্তি পেশ করে যে, খিলাফাহ’র তামকীনে মুতলাক্ব নেই। কিন্তু যদি খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তামকীনে মুতলাক্ব শর্ত ধরা হয় তাহলে পৃথিবীতে কোন বিশুদ্ধ খিলাফাহ বা ইমারাহ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা কোন খিলাফাহ’র-ই তামকীনে মুতলাক্ব ছিল না।

শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله বলেন, “যদি এই যামানায় ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠার জন্য তামকীনে মুতলাক্ব শর্ত করা হয় তাহলে কোন ইসলামী রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা হতে পারবে না।”[56] শাইখ رحمه الله আরো বলেন, “যে ব্যক্তি রাসুল ﷺ ওফাতের পর অল্প কিছু ব্যতীত পুরো আরব মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সময়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে সে অবশ্যই জানবে যে, ইমামের জন্য বাইআত সম্পন্ন হওয়ার অথবা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তামকীনে মুতলাক্ব শর্ত নয়।”[57] সুতরাং আমরা যদি খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তামকীনে মুতলাক্বকে শর্ত বানিয়ে নেই তাহলে এটা হবে স্বেচ্ছাচারিতা ও নিরেট মূর্খতা।

দ্বিতীয় প্রকারঃ মুতলাক্ব তামকীন হচ্ছে কোন একটি অঞ্চলে আংশিক তামকীন

56 আস-সাবীল লি-আহবাতিল মুআমারাত

57 আস-সাবীল লি-আহবাতিল মুআমারাত

থাকা। এখন প্রশ্ন আসে যে, খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট তামকীনের পরিমাণ কতটুকু?

ইসলামী রাষ্ট্র বা খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তামকীনের বর্ণনা কুরআন ও সুন্নাহ'তে নেই। এব্যাপারে শাইখ উসমান ইবনে আব্দুর রহমান আত-তামিমী ﷺ বলেন, "কুরআন অথবা সুন্নাহ'র এমন কোন নছ পাওয়া যায় না যা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমির নির্দিষ্ট পরিমাপ নির্ধারিত করে। এবং ভূমির কোন আকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রেও কোন শারয়ী নছ পাওয়া যায় না। তবে পূর্বে আমরা যেসকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি–সেগুলোর মূল হল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শারীয়াহ'র প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ পাওয়া। আর যে ব্যক্তি এক্ষেত্রে কোন সীমা নির্ধারণ করে অথবা পরিমাপ, পরিমাণ বা আমরা যা উল্লেখ করেছি এর উপর কোন বিশেষণ নির্দিষ্ট করে সে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুনত্ব বিষয় উদ্ভাবন করল যা আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[58] সুতরাং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তামকীন থাকা শর্ত নয়। বরং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট তামকীনের পরিমাপ হচ্ছে শক্তিশালী ও দুর্বল–সকল মানুষের উপর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। যদিও কিছু কিছু নির্বোধ ব্যক্তি আবু বকর আল-বাগদাদী ﷺ -এর খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ণ তামকীন বা তামকীনে মুতলাক্ব শর্তারোপ করে। তারা বলে থাকে, যেহেতু দাওলাতুল ইসলামের পূর্ণ তামকীন ছিল না তাই দাওলাতুল ইসলাম আবু বকর আল-বাগদাদী ﷺ কে মুসলিমদের জন্য খলীফাহ হিসেবে নির্ধারণ করে খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়াটা বৈধ হয়নি। কিন্তু শাইখ উসামা ﷺ বলেছেন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ তামকীন শর্ত করা হলে কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভব হবে না। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাওলাতুল ইসলামের যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন ছিল এখনো আছে এবং সামনে তা আরো বিস্তৃত হবে ইনশা'আল্লাহ। আমরা দেখেছি এবং দেখছি, দাওলাতুল খিলাফাহ'র ভূমিগুলোতে কিভাবে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়–প্রকাশ্যে সালাত প্রতিষ্ঠা করা, মুসলিমদের জন্য যাকাত প্রদানের ব্যবস্থা করা, হুদুদ প্রতিষ্ঠা

[58] ইলামুল আনাম বি-মীলাদি দাওলাতিল ইসলামঃ পৃঃ ২৩

করা, আমর বিল মা’রূফ নাহী আনিল মুনকার করা, কাফিরদের উপর জিযয়া আরোপ করা, মুরতাদদের ব্যাপারে শারয়ী হদ বাস্তবায়ন করাসহ শারীয়াহ’র প্রতিটি বিধান বাস্তবায়ন করা হয়। সুতরাং মানুষের উপর আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং তাদের উপর তা জাড়ি করাই যথেষ্ট পরিমাণ তামকীনের প্রমাণ বহন করে। শাইখুল ইসলাম বলেন, “আহলুস সুন্নাহ’র নিকট খিলাফাহ সাব্যস্ত হবে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা যাদের আনুগত্যের মাধ্যমে খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে।” তিনি আরো বলেন, “প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের একমত হওয়াই বিবেচ্য বিষয়, খলীফাহ যাদের মাধ্যমে খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবেন।”

সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন হল খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়ার মত তামকীন থাকা। আর খিলাফাহ’র উদ্দেশ্য হল, খিলাফাহ’র শাসনাধীন ভূমির সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে খলীফাহ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷻ -এর খিলাফাহ’র ক্ষেত্রে কি এই যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন ছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই ছিল। তিনি ইরাক ও শামের বিশাল এলাকাজুড়ে সকল মানুষের মাঝে সমান ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে আল্লাহর বিধিবিধান জাড়ি করেছেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, কিছু গোত্র খলীফাহ’র আনুগত্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ফলে শক্তি প্রয়োগ করে তাদের উপর আল্লাহর বিধান কার্যকর করা হয়েছে। এতেকরে তারা প্রথমে দেশান্তরকারী যুদ্ধের স্বাদ আস্বাদন করেছে এরপর লাঞ্ছনাদায়ক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। সুতরাং খিলাফাহ ঘোষণার সময় দাওলাতুল ইসলামের শক্তি ও তামকীন ছিল। মাত্র তিন মাসে তারা কয়েকটি শহর দখল করে নিয়েছে। অথচ তাবৎ বিশ্ব বলেছে, শহরগুলো দখল করতে আমাদের প্রায় তিন বছর সময় লাগবে। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করেছি যে, কিভাবে কাফির ও মুসলিমদের উপর আল্লাহর বিধান কায়েম করা হচ্ছে। আমরা খৃষ্টানদের দেখেছি লাঞ্ছিত হস্তে জিযয়া প্রদান করে ওমার رضي الله عنه কর্তৃক নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জীবন-যাপন করতে। দেখেছি মুশরিকদের চরম লাঞ্ছিত হতে। তাদের সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে আর নারীদের করা হয়েছে বন্দি। আমরা যিনার

কারণে পাথর মেরে হত্যা করা ও দোররা মারা এবং চোরের হাত কাটার মত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হুদুদ বাস্তবায়ন হতে দেখেছি। সুতরাং এরপরেও আপনারা আর কোন তামকীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দাবি করছেন?

আর যদি পূর্ণ তামকীন না থাকার কারণে আমীরুল মু’মিনীন আবু বকর আল -বাগদাদী ﷺ খলীফাহ হওয়া অবৈধ হয় তাহলে আবু বকর রাদি-এর খিলাফাহ অবৈধ হবে এবং শাইখ উসামা, শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী, শাইখ মোস্তফা আবুল ইয়াযীদ, আনওয়ার আল-আওলাক্বী এবং ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরীর প্রশংসাকৃত দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ অবৈধ হওয়া লাযিম হবে। কারণ আবু ওমার আল-বাগদাদী ﷺ -এর দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার সময় পূর্ণ তামকীন ছিল না বরং ছিল যথেষ্ট পরিমাণ তামকীন। অথচ এই দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’কে আল-কায়দার প্রত্যেক নেতা শারয়ী বিশুদ্ধ ইমারাহ মনে করতেন। আর আমরা জানি যে, দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠার সময় মাজলিসে শুরার অধীনে যতটুকু তামকীন ছিল দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ ঘোষণা করার সময় মাজলিসে শুরার অধীনে থাকা তামকীনের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পরিমাণ তামকীন দাওলাহ’র অধীনে ছিল। আপনি চিন্তা করুন! দাওলাহ যখন খিলাফাহ ঘোষণা করে তখন এর অধীনে ছিল ইরাকের প্রায় অর্ধেক ভূমি এবং শামের প্রায় ৭০ শতাংশ ভূমি। এরপরেও বাতিলপন্থিরা দাওলাতুল ইসলামের খিলাফাহ ঘোষণার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় ছড়াতে থাকে।

কেউ কেউ বলে থাকে যে, ১৪৩৫ হিজরীতে যখন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷺ কে মুসলিমদের জন্য খলীফাহ নির্ধারণ করা হয় তখন তো অনেক বিস্তৃত ভূমি দাওলাতুল ইসলামের অধীনে ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কুফফার জোটের তীব্র আক্রমণের মুখে দাওলাতুল ইসলাম অনেক ভূমি হারায় বিশেষত ইরাক ও শামে। বর্তমান খলীফাহ আবু হাফস আল-হাশিমী حفظه الله-এর অধীনে ইরাক ও শামে পূর্বের মত বিস্তৃত ভূমি নেই, তাহলে এই অবস্থায় আবু হাফস আল-হাশিমী আল-কুরাইশী حفظه الله -এর খিলাফাহ বিশুদ্ধ হয় কি করে?

প্রথমতঃ কিছু পরিমাণ অথবা অধিক পরিমাণ ভূমির কর্তৃত্ব হারানোর মাধ্যমে

খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হয়ে যায় না। যারা এমনটা দাবি করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি, অবশ্যই তাদের না আছে শারয়ী বুঝ আর না আছে ইসলামী সিয়াসী বুঝ। এক্ষেত্রে এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইমাম এবং খিলাফাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত শর্তাদির মধ্যে এমন শর্ত রয়েছে যা শুরুতে থাকা আবশ্যক স্থায়ীভাবে থাকা আবশ্যক নয়। আর এর অনুপস্থিতি খিলাফাহ ব্যবস্থার পতনকে আবশ্যক করে না। আর না এর মাধ্যমে খলীফাহ অপসারিত হয় এবং না জনগণের জন্য তার আনুগত্য বাতিল হয়। তা হল- মুতলাক্বে তামকীন ও শক্তি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শারীয়াহ’র আহকাম প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে যমীনের কোন অংশে তামকীন থাকা। আর এটাই হল ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকার সাথে খিলাফাহ’র মাকসাদ –যে ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রজাসাধারণকে এর প্রতি বাধ্য করবে। সকল শর্তাদি পূরণ করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর যখন রাষ্ট্রের তামকীন দুর্বল হয়ে যায় তখন এই দুর্বল হওয়াটা খিলাফাহ ব্যবস্থার বিলুপ্তিকে আবশ্যক করে না। এমনকি যদিও ভয় ও আতঙ্ক রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং যদিও মুসলিমরা তাদের ভূখণ্ডে তাদের শত্রুদের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ না থাকে। এব্যাপারে দলিল হল- ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো মুসলিমদের সাথে ঘটেছে। যেমন খুলাফায়ে রাশিদাহ’র যুগ এবং পরবর্তী খিলাফাহ’র রাষ্ট্রসমূহে ঘটে যাওয়া বিষয়াদি। ঐ সমস্ত যুগের ইসলামী রাষ্ট্র বহুবিধ বিপদ এবং ক্ষমতা ও তামকীনের ক্ষেত্রে জোয়ারভাটায় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ বলেন নি যে, দুর্বল তামকীন অথবা সংখ্যার স্বল্পতা বা ভূমি হারানোর কারণে রাষ্ট্রের পতন হয়ে গেছে এবং খলীফাহ’র ইমামত বাতিল হয়ে গেছে।

আমরা যদি নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ’র প্রথম খলীফাহ আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه -এর শাসনকাল পর্যবেক্ষণ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। রাসুল ﷺ যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আবু বকর رضي الله عنه মুসলিম উম্মাহ’র জন্য খলীফাহ মনোনীত হন। আবু বকর رضي الله عنه খলীফাহ মনোনীত হওয়ার পর অনেক শহর, নগর ও গ্রাম মুরতাদ হয়ে যায় যেগুলোর অধিবাসীরা নাবী ﷺ -এর ওফাতের পূর্বে ইসলামের উপর ছিল। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব বলেন, “নাবী

ﷺ -এর ওফাতের পর দুই মাসজিদ মক্কা ও মদিনা ব্যতীত সমগ্র আরব মুরতাদ হয়ে যায়। আসাদ ও গাতফান গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। আর তাদের নেতা ছিল তুলাইহা ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী আল-কাহিন। কিন্দা ও এর আশেপাশের এলাকা মুরতাদ হয়ে যায়। আর তাদের নেতা ছিল আশআছ ইবনে ক্বাইছ আল-কিন্দী। মুযহাজ এবং এর আশেপাশের গোত্রগুলো মুরতাদ হয়ে যায়। তাদের নেতা ছিল আসওয়াদ ইবনে কাব আল-আনাসী আল-কাহিন। মারুর ইবনে নুমান ইবনে মুনযিরের সাথে মিলে রবীআহ গোত্র মুরতাদ হয়ে যায়। আর বনু হানীফাহ মুসাইলিমাতুল কাযযাবের সাথে ছিল। সালিম গোত্র ফাজাআহ’র সাথে গিয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। আর তার নাম ছিল আনাস ইবনে আব্দ ইয়ালাইল। বনু তামীম গোত্র সাজা আল-কাহিনার সাথে যোগদান করে মুরতাদ হয়ে যায়।”[59]

এ থেকে প্রামাণিক সাক্ষ্য এই যে, আবু বকর رضي الله عنه যখন খিলাফাহ’র দায়িত্ব নেন তখন এই শহর নগরগুলো ইসলামের ভূমি ছিল। অতঃপর কিছু দিন পরই তারা তাদের রিদ্দাহ’র ঘোষণা দেয়। ফলে সেগুলো দারুল ইসলাম থেকে দারুল কুফরে পরিণত হয়। এমনকি কেবলমাত্র মক্কা, মদিনা ও কিছু নগর দারুল ইসলাম হিসেবে রয়ে যায়। এ সত্ত্বেও সাহাবীগণের কেউ এবং তাদের পরবর্তী কেউ বলেন নি যে, দারুল ইসলাম থেকে এই সকল ভূমি চলে যাওয়ার কারণে খিলাফাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে–যেহেতু দারুল ইসলামের অল্প কিছু ভূমি অবশিষ্ট ছিল। বরং এই স্বল্পতার অবস্থা এমন ছিল যে, তারা সর্বদা শত্রুর অপেক্ষায় থাকত। যেকোনো অবস্থায় মদিনাতে অভিযান পরিচালনা করার সম্ভাবনা ছিল। অথচ তখন সেটা ছিল ইসলামের প্রধান নগরী। সেখানে মুসলিমদের খলীফাহ ছিল। এতোকিছু সত্ত্বেও তাদের কেউ আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه-এর খিলাফাহ সম্পর্কে কোন নিন্দামূলক উক্তি করেন নি।

ইবনে কাসীর বলেন, “যখন রাসুল ﷺ মৃত্যুবরণ করলেন তখন আরবের অনেক এলাকা মুরতাদ হয়ে যায়। মদিনাতে নিফাক্ব উদ্ভূত হয় এবং বনু হানীফাহ ও

59 আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াঃ ৯/৪৪০

ইয়ামামার অনেক মানুষ মুসাইলিমাতুল কাযযাবের পক্ষে চলে যায়। তুলাইহা আল-আসাদীর পক্ষে যায় বনু আসাদ, ত্বই গোত্র এবং আরো অনেক মানুষ। সেও মুসাইলিমাতুল কাযযাবের মত নবুওয়াতের দাবি করে বসে। অবস্থা গুরুতর ও তীব্র আকাড় ধারণ করে। আবু বকর সিদ্দীক উসামার বাহিনী প্রেরণ করেন। ফলে আবু বকর সিদ্দীকের নিকট সৈন্য সংখ্যা কমে গিয়েছিল। তাই আরবের অনেকেই মদিনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে মদিনাতে আক্রমণ করতে চাইল। ফলশ্রুতিতে আবু বকর সিদ্দীক মদিনার গিড়িপথগুলোতে রক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন যারা সৈন্যবাহিনীর সাথে রাতে মদিনার আশেপাশে পাহারা দিত। সেই রক্ষীদের আমীরদের মধ্যে ছিলেন আলী ইবনে আবী তালিব, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ।"[60]

আপনি ইবনে কাসীরের উক্তি লক্ষ্য করুনঃ

- ফলে আবু বকর সিদ্দীকের নিকট সৈন্য সংখ্যা কমে গিয়েছিল।
- তাই আরবের অনেকেই মদিনার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে মদিনাতে আক্রমণ করতে চাইল।
- ফলশ্রুতিতে আবু বকর সিদ্দীক মদিনার গিড়িপথগুলোতে রক্ষী নিযুক্ত করেছিলেন যারা সৈন্যবাহিনীর সাথে রাতে মদিনার আশেপাশে পাহারা দিত।

সুতরাং এই ছিল রিদ্দাহ'র যুদ্ধের সময় ইসলামের প্রধান নগরীর অবস্থা। সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুর আধিক্যতা, যেকোনো সময় মদিনাতে অভিযান চালানোর মত এক পরিস্থিতি ছিল। এসত্ত্বেও কেউ আবু বকর رضي الله عنه -এর খিলাফাহ' র ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেনি।

আর উসমান رضي الله عنه -এর খিলাফাহ'র আমলে তাকে তার বাড়িতে কয়েকদিন অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। যার ফলে তিনি জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।

[60] আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াঃ ৯/৪৩৭

এমনকি তিনি লোকদের সালাতের ইমামতি করতেও সক্ষম ছিলেন না যেমনটি সিরাহ'র কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি এভাবেই শহীদ হয়ে যান। এসত্ত্বেও কেউ বলেনি যে, তার ইমামত বাতিল হয়ে গেছে এবং তার খিলাফাহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমনকি যে খারিজিরা তাকে অবরুদ্ধ করেছিল তারাও এমনটা বলেনি। অথচ তাদের চাওয়া পাওয়ার একটি ছিল যে, তিনি যেন নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন। যদি মদিনা থেকে বিস্তৃত অংশ চলে যাওয়া এবং ইমামের শাসন থেকে সেগুলো বের হয়ে যাওয়া তার ইমামতকে বাতিল করত তাহলে খারিজিরা এই কথা সবার আগে বলত। কিন্তু তারাও এটা মনে করেনি। ফলে তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কে হত্যা করে। ইমাম জুআইনী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "তিনি অর্থাৎ উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু শাহাদাত লাভ করা পর্যন্ত ইমাম ছিলেন।"

এরপর যদি আমরা নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ'র চতুর্থ খলীফাহ আলী ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর শাসনকাল পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আহলুল হাল্লী ওয়াল -আকদের ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে যাদের উপস্থিতি সহজ ছিল তাদের বাইআতের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহ'র খলীফাহ নির্ধারিত হন। কিন্তু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু সহ প্রায় অর্ধেক সংখ্যক মুসলিম তাকে খলীফাহ হিসেবে বাইআত দেয়নি। আর যে অর্ধেক সংখ্যক মুসলিম তাকে বাইআত দিয়েছিলেন তাদের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে তিনি শামসহ কিছু অঞ্চলের কর্তৃত্ব হারান। যেমনটি ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর পরিবর্তে সাহল ইবনে হুনাইফকে শামের আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেন। তিনি রওয়ানা করার পর যখন তাবুক পৌঁছলেন তখন মুআবিয়ার অশ্বারোহী বাহিনী তার পথ রোধ করল। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনার পরিচয় কী? তিনি বললেন, আমি আমীর। তারা বলল, কোথাকার আমীর? সাহল ইবনে হুনাইফ বললেন, শামের আমীর। তারা বলল, যদি উসমান আপনাকে পাঠিয়ে থাকে তাহলে আপনি আসুন। আর যদি অন্য কেউ পাঠিয়ে থাকে তাহলে আপনি ফিরে যান। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি ঘটনা শুনোনি? তারা বলল, অবশ্যই শুনেছি। অতঃপর তিনি আলীর

নিকট ফিরে এলেন।"

এখানেও আমরা দেখতে পেলাম যে, উসমান رضي الله عنه -এর মৃত্যুর পর যখন আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه খলীফাহ মনোনীত হলেন তখন শামসহ কিছু অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ তার হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এর জন্য আলী رضي الله عنه -এর খিলাফাহ বাতিল হয়ে যায়নি। অথচ আমরা জানি যে, মুসলিম উম্মাহ'র বর্তমান খলীফাহ আবু হাফস আল-হাশিমী حفظه الله -এর অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত ভূমির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। যেমন ইরাক ও শামের বিস্তীর্ণ ভূমি মুজাহিদগণের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আর আমীরুল মু'মিনীন আবু হাফস আল-হাশিমীর কর্তৃত্বে শুধুমাত্র ইরাক শামের ভূমির নিয়ন্ত্রণই আছে ব্যাপারটি তেমন নয়। কারণ আফ্রিকার সাহারা (উলায়াত সাহেল) অঞ্চল থেকে শুরু করে পশ্চিম আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, মোজাম্বিক, সোমালিয়া, লিবিয়া, সিনাই, ইয়েমেন, খোরাসান, পাকিস্তান, কাশ্মীর এবং পূর্ব এশিয়া (ফিলিপাইন) পর্যন্ত অঞ্চলগুলোতে বিস্তৃত ভূমির কর্তৃত্ব আবু হাফস আল-হাশিমীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যেহেতু পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত আবু হাফস আল-হাশিমীর কর্তৃত্ব বিস্তৃত তাই তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ভূমির কর্তৃত্ব প্রমাণিত। এব্যাপারে বন্ধুদের থেকে শত্রুরা অধিক জ্ঞাত। তবে যদি আপনি আল-কায়দার একচোখা, ভুঁইফোড়, হলুদ মিডিয়ার সংবাদে বিশ্বাসী হন তাহলে অবশ্যই প্রতারিত হবেন। কারণ তারা একদিকে প্রচারণা চালায় দাওলাতুল খিলাফাহ নিঃশেষ হয়ে গেছে আর আল-কায়দা দিনকে দিন বিস্তৃত (!) হচ্ছে তথাপি তারা যখন শামে তিন বছরের মধ্যে এক অপারেশন চালিয়ে মাত্র সাতজনকে আহত নিহত করে তখন তারা এটাকে সিরিয়ান জিহাদের এক নব দিগন্ত এবং মুসলিম উম্মাহ'র আশার আলো হিসেবে ঢালাওভাবে প্রচার করতে থাকে। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে আল -কায়দা লিবিয়া, তিউনিসিয়া ও মিসরে নিজেদের অস্তিত্ব হারানোর পর যখন শামেও তাদের অস্তিত্ব হারানোর পথে তখন তারা হাকীমের হিকমার ব্যর্থতা ঢাকতে দাওলাতুল খিলাফাহ'র ব্যাপারে অপপ্রচার চালাতে থাকে। আর তালেবানের আফগান ক্ষমতা দখল যে নিকৃষ্ট কুফরি চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে তা সকলের নিকট স্পষ্ট (সামনে এব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশা'আল্লাহ)। সুতরাং প্রিয় ভাই,

আপনি আল-কায়দার ভুঁইফোড় হলুদ মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতারিত হবেন না। অতএব কিছু ভূমির নিয়ন্ত্রণ হারানো খিলাফাহ বাতিল হওয়ার জন্য কোন দলিল নয়। যদি দাওলাতুল ইসলামের ভূমি হারানোর কারণে খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হয় তাহলে আবু বকর ﵁-এর সময় মক্কা মদিনা ব্যতীত সকল আরবের ভূমি দারুল কুফরে পরিণত হওয়ার কারণে আবু বকর ﵁ -এর খিলাফাহ বাতিল সাব্যস্ত হত।

এমনিভাবে আমরা জানি যে, মুসলিমদের ভূমিগুলোতে তাতারদের হামলার ফলে আব্বাসী খিলাফাহ এক সংকটময় অবস্থায় পড়েছিল। তাতাররা খিলাফাহ'র শহর বাগদাদ দখল করে নেয় এবং মুসলিমদের খলীফাহ মুস্তাসিম বিল্লাহকে হত্যা করে। এর ফলে মুসলিমরা তিন বছর খলীফাহ বিহীন অবস্থায় অতিবাহিত করে। খলীফাহ মুস্তাসিম বিল্লাহ'র চাচা মুস্তানসির বিল্লাহ তাতারদের হাতে বন্দি হন। তিন বছর পর তিনি বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পর মিসরে পুনরায় তাকে খলীফাহ হিসেবে বাইআত দেওয়া হয় যেমনটি ইবনে কাসীর 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[61] আপনি একটু চিন্তা করুন, খলীফাহ'কে হত্যা করা হয়েছে, মুসলিমরা তারপরে একজনকে খলীফাহ হিসেবে নিয়োগ করতে সক্ষম ছিল না। ফলে বিচ্ছিন্নভাবে ছোট ছোট ইমারাহ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের কেউ বলেনি খিলাফাহ ব্যবস্থার পতন হয়ে গেছে এবং খিলাফাহ'র ভূমি চলে যাওয়ার কারণে ও খলীফাহ'কে হত্যা করার কারণে খিলাফাহ বাতিল হয়ে গেছে। কারণ খলীফাহ'র মৃত্যু বা তার কোন একটি শর্তের অনুপস্থিতি মানে এই নয় যে, খিলাফাহ ব্যবস্থার পতন হওয়া যেমনটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ জন্যই যখন মুস্তানসির বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হন তখন আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গ তাকে বাইআত প্রদান করেন। আর খিলাফাহ'র পদ তিন বছরের জন্য শূন্য থাকা সত্ত্বেও খিলাফাহ ব্যবস্থা পূর্বের অবস্থাতেই স্থায়ী হয়। সেই সময়ে আব্বাসী খলীফাদের ধারাবাহিকতা থাকার সাথে সাথে অনেক শহর নগরে মুসলিমদের মাঝে এবং তাতারদের মাঝে হামলা-পলায়ন ঘটেছিল বিশেষত শাম ও এর আশেপাশের অঞ্চলে।

[61] বিস্তারিত জানতে দেখুন 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'- ১৭/৪২৫

আপনি বর্তমান অবস্থায় দাওলাতুল ইসলামের প্রতি লক্ষ্য করুন, এই দাওলাহ এমন সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে যখন এর প্রতিষ্ঠা খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। অনেকেই তা প্রতিষ্ঠা করতে বিলম্ব করেছিল বরং তা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছিল। এতোকিছু সত্ত্বেও যখন এই দাওলাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হল তখন আল্লাহর অনুগ্রহে এর অধীনে প্রশস্ত তামকীন ও বিস্তৃত ভূমি এবং অনেক সংখ্যক জনগণ চলে আসল। আর এ দাওলাহ'র অবস্থা এমন যার প্রতিটি সেক্টরে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়। একারণেই আরব অনারবের কুফফাররা এক ধনুক থেকে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা শুরু করে। দাওলাহ-ও পর্যায়ক্রমে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে বহু শহর নগর বিজয় করে। এর সৈনিকগণ জাহিলী পতাকা পায়ে মাড়িয়ে ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত করে। এমনকি এর শক্তি ও তামকীনের ব্যাপারে শুভাকাঙ্ক্ষীর পূর্বে শত্রু-ই স্বীকৃতি দিয়েছে।

পরবর্তীতে আল্লাহ ﷻ দাওলাতুল ইসলামের সম্প্রসারণের পর এর ভূমি হ্রাস হওয়া নির্ধারণ করলেন। আর তারা আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা ভূমি শাসন করার পর তা সমর্পণ করে দেয়নি। এটাতো যুদ্ধ। কখনো এক পক্ষ জয়ী হয় এবং কখনো অপর পক্ষ জয়ী হয়, এতে রয়েছে হামলা আর পলায়ন। তারা এই সমস্ত ভূমির যে অংশ থেকে ফিরে গিয়েছেন সেটা কাপুরুষতা বা ক্লান্তির জন্য নয়। কিভাবেই বা তারা এমন হবে অথচ তারা প্রতিটি উলায়াতে আল্লাহর অনুগ্রহে মুরতাদদের এবং ক্রুসেডারদেরকে যুদ্ধের কঠিন স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন।

এই দাওলাতুল ইসলামের মাঝে এতোকিছু ঘটা সত্ত্বেও খিলাফাহ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাদির কোন একটি শর্তও ত্রুটিপূর্ণ হয়নি। কারণ আল্লাহর অনুগ্রহে ইমাম তথা খলীফাহ حفظه الله বিদ্যাদান রয়েছেন। যে সকল শর্তাদির মাধ্যমে প্রথমে এই দাওলাহ'র ইমামের ইমামত শারয়ী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং যে সকল শর্ত চলে যাওয়াটা ইমামতের পদে প্রভাব ফেলে আল্লাহর অনুগ্রহে সেগুলোর কোনটিই বিলীন হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি একবিংশ শতাব্দীতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি তাহলে একই ফলাফল আমাদের সামনে প্রতীয়মান হবে। মোল্লা

ওমার رحمه الله আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারাহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে হামলা করে তখন কী ঘটেছিলো? মোল্লা ওমার رحمه الله -এর তালেবান সকল শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিল। কেউ কি বলবে যেহেতু মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله -এর তালেবান আমেরিকার হামলায় বিস্তীর্ণ ভূমির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিল তাই তার ইমারাহও বাতিল হয়েছিলো? কারণ ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া তো কোন ইমারাহ হয় না। এ কথা বলার কেউ সাহস করবে না। তখনও কিছু বাতিলপন্থিরা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণ তামকীন শর্তারোপ করেছিল যেহেতু মোল্লা ওমার رحمه الله -এর ইমারাহ'র এবং দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র পূর্ণ তামকীন ছিল না। আর পূর্ণ তামকীন শর্তারোপ করা হলে পৃথিবীতে কোন ইমারাহ-ই প্রতিষ্ঠিত হবে না। সর্বজনবিদিত যে, আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলার পর মোল্লা ওমার رحمه الله -এর তালেবানের যতটুকু পরিমাণ তামকীন ছিল এরচেয়েও কয়েক ডজন বেশি পরিমাণ তামকীন এখনো আবু হাফস আল-হাশিমী حفظه الله -এর অধীনে রয়েছে। তামকীন মানে হল সকল মানুষের উপর আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা। শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা তো বিলুপ্ত হয়নি। কিভাবে এটা হবে অথচ আল্লাহর যমীনকে তার শারীয়াহ দ্বারা শাসন করার জন্য আল্লাহর সৈনিকগণ যমীনে খুন ঢেলে যাচ্ছেন। খিলাফাহ'র সৈনিকগণ এখনো মুরতাদ এবং মুশরিকদেরকে স্বহস্তে শাস্তি দিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা বুঝি না এই লোকগুলো কোথা থেকে এসেছে যারা কিছু ভূমি চলে যাওয়া বা কিছু ভূমি থেকে সৈন্যবাহিনী বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে খিলাফাহ'র পতনের দাবি করে! আপনি জানেন যে, আমরা আরবের রিদ্দাহ'র পর ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং মুসলিমদের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া ঘটনা উল্লেখ করেছি। পর্যাপ্ত সংখ্যক আলেম ও ফক্বীহ ছিলেন তাদের কেউ এই ধরনের কথা বলেন নি এই সকল জাহিলরা এব্যাপারে যা বলে। কিন্তু এই সকল জাহিলরা হচ্ছে অন্ধ, বধির ও বোবা যারা অনুধাবনও করতে পারে না। তারা যদি ইতিহাস পড়ে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত তাহলে তারা অবশ্যই জানত যে, ভূমি চলে যাওয়াটা খিলাফাহ'র পতনের জন্য কোন দলিল না। বরং সেটা কোন দিক থেকেই খিলাফাহ'র ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ

নয়। তাদের এ দাবি যদি সঠিক হয় তাহলে আবু বকর ﷺ -এর খিলাফাহ ত্রুটিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক হবে। আপনাদের নিকট ইতিহাস থেকে কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছি, তাই যে সঠিক পথ পেতে আগ্রহী তার জন্য ইশারা এবং আলোদান-ই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে ইনসাফপূর্ণ অবস্থান এবং হক্বের নিকট পৌঁছানোর জন্য আগ্রহমূলক গভীর চিন্তা। আল্লাহ সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন! আমীন!!

এখন আমাদের আলোচনা হবে শারীয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত খলীফাহ'র শর্তসমূহ সম্পর্কেঃ

খিলাফাহ'র পদ অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ এক আমানত। রাসুল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই এটি হচ্ছে একটি আমানত। আর ক্বিয়ামতের দিন এটা হবে লাঞ্ছনা ও অনুশোচনা, তবে যে এর হক্ব পরিপূর্ণরূপে আদায় করবে তার কথা ভিন্ন।"[62]

যেহেতু এই পদটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই ইসলাম এই পদ এবং মুসলিমদের নেতৃত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য কিছু শর্তারোপ করেছে। কারণ ইসলাম যে কোন ব্যক্তিকেই মুসলিমদের শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না।

ইসলামে শাসক সেই ব্যক্তি যাকে দ্বীনের নিরাপত্তা প্রদান, দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতা তথা আল্লাহর শারীয়াহ অনুযায়ী মানুষের সকল বিষয়াদি পরিচালনার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। এজন্য রাসুল ﷺ সাহাবীগণের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতৃত্বের জন্য বাছাই করতেন। যেন সেই ব্যক্তি সুচারুরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতে পারে।

আলেমগণ নেতৃত্বের জন্য কিছু শর্ত উল্লেখ করেছেন। যে ব্যক্তি মুসলিমদের নেতৃত্ব ও খিলাফাহ'র দায়িত্ব গ্রহণ করবে তার মধ্যে এই শর্তগুলো পূরণ হতে হবে। আমরা এই শর্তগুলো উল্লেখ করব। দাওলাতুল ইসলাম শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ কে মুসলিম উম্মাহ'র জন্য খলীফাহ হিসেবে নির্ধারণ করার সময় এই

---

62 মুসলিম

শর্তগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ -এর মধ্যে এই শর্তগুলো পূরণ হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই তিনি শারয়ী দিক থেকে একজন বৈধ খলীফাহ হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

শর্তগুলোর বিবরণঃ

- ১. মুসলিম হওয়া। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল আলেম এব্যাপারে একমত যে, কোন কাফির মুসলিমদের দায়িত্বশীল বা শাসক হতে পারবে না।
- ২. পুরুষ হওয়া। কোন নারী মুসলিমদের শাসক হতে পারবে না। ইমাম শানক্বীতী ﷫ বলেন, “খলীফাহ’র জন্য শর্ত হল পুরুষ হতে হবে। এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে কোন দ্বিমত নেই।”[63]
- ৩. বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়া। এ শর্তটি একেবারেই সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি মুসলিমদের ছোট-বড় কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হবে তার মধ্যে এই শর্তটি পূরণ হতে হবে; এব্যাপারে আলেমগণের মাঝে কোন ইখতিলাফ নেই।
- ৪. সৎ বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া। ইমাম ক্বুরতুবী বলেন, “ফাসিক্ব ব্যক্তি খলীফাহ হতে পারবে না। আর এ বিষয়ে উম্মাহ’র কারো দ্বিমত নেই।”[64]
- ৫. আলেম হওয়া। ইমামুল হারামাইন জুআইনী বলেন, “খলীফাহ হওয়ার জন্য শর্ত হল মুজতাহিদ হওয়া–ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হওয়া এবং মুফতী হওয়ার সকল গুণাবলী বিদ্যমান থাকা। আর এই শর্তের ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই।”[65]
- ৬. বালেগ হওয়া। আলেমগণ উল্লেখ করেছেন, ছোট হোক বা বড় হোক এক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বালেগ হওয়া আবশ্যক।

---

63 আদওয়াউল বায়ানঃ ১/২৬

64 তাফসীরে ক্বুরতুবী

65 গিয়াছুল উমামঃ ৮৪

- ৭. স্বাধীন হওয়া। ইমাম ইবনে বাত্তাল বলেন, “সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, গোলাম খলীফাহ হতে পারবে না।”[66]

- ৮. শারীরিক সুস্থতা। শারীরিক সুস্থতা দ্বারা উদ্দেশ্য হল - পঞ্চইন্দ্রীয় এবং ঐ সকল অঙ্গগুলো সুস্থ থাকা যেগুলোর অনুপস্থিতি কাজ ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যেমন দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি—এগুলো সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। দুই হাত ও দুই পায়ের অনুপস্থিতি উঠা-বসার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

- ৯. সাহসী হওয়া। খলীফাহ’কে অবশ্যই হুদুদ বাস্তবায়ন এবং যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সাহসী হতে হবে।

- ১০. কুরাইশী হওয়া। খলীফাহ কুরাইশী বংশের হওয়া আবশ্যক। হাদিসে এই শর্তের বিষয়টি স্পষ্ট এসেছে। রাসুল ﷺ বলেছেন, “এই বিষয় (খিলাফাহ ও শাসন ক্ষমতা) সর্বদাই কুরাইশদের হাতে থাকবে যতদিন তাদের দুজন লোকও বেঁচে থাকবে।”

এই হল সেসব শর্তের বর্ণনা, শাসক ও খলীফাহ’র ব্যাপারে আলেমগণ যেসব শর্তারোপ করেছেন। দাওলাতুল ইসলাম শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী আল-কুরাইশী حفظه الله কে খলীফাহ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সবগুলো শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে। যাকে মুসলিমদের নেতা ও খলীফাহ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের সত্যবাদী আলেমগণ। এই বিষয়টি আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য আমরা আমীরুল মু’মিনীন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী حفظه الله -এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করছিঃ

শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী হলেন একজন মহান শাইখ, ইমাম, ইবাদাতগুজার, সাহসী যোদ্ধা, আমীরুল মু’মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন আবু দুআ ইবরাহীম ইবনু আওয়াদ ইবনু আলী ইবনু মুহাম্মাদ আল-বাদরী (বংশগত দিক

[66] ফাতহুল বারীঃ ২০/১৬০

থেকে) আল-কুরাইশী আল-হাশিমী আল-হুসাইনী। (জন্মস্থানের দিক থেকে) সামাররায়ী (ইলম অর্জন ও বাসস্থানগত দিক থেকে) বাগদাদী। তিনি পরহেজগার, মুত্তাকী, আলেম, ফক্বীহ, মুজতাহিদ, সাহসী যোদ্ধা ও মুজাহিদ। তিনি হুসাইন ইবনু আলী ইবনু আবু তালিবের দিক থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধর। তিনি ধার্মিক সুন্নী পরিবারে বেড়ে উঠেছেন। তার পিতা ছিলেন ইরাকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতের অন্যতম বড় আলেম। এ বিষয়টি তাকে ইলমের প্রতি ভালবাসা ও ইলম অর্জনে সাহায্য করেছে। তিনি বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং কুরআনের দশ কিরাতের উপর ডক্টরেট সম্পন্ন করেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীয়াহ অনুষদে পিএইচডি করেছেন।

তিনি ছিলেন ইরাকের সালাফী মুজাহিদদের অন্যতম নেতা এবং বড় আলেম। তিনি ছিলেন ইরাকে প্রথম সারির মুজাহিদদের একজন। তিনি নিজের জান, মাল, ইলম ও জবানের মাধ্যমে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন এবং আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে সালাফগণের কর্মপন্থার আলোকে জিহাদী দল গঠন করেছেন।[67] শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদের ময়দানে তিনি অনেক বড় ভূমিকা রেখেছেন। যখন ইরাকে মুজাহিদগণ শূরা কাউন্সিল গঠন করেন তখন শাইখ তার সঙ্গীদেরকে নিয়ে এই মোবারক মাজলিসে যুক্ত হয়ে যান।

ইরাকের জিহাদ যখন ফল দিতে শুরু করে এবং মুজাহিদগণ একতাবদ্ধ হন, পাশাপাশি আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে বিজয় ও শাসন ক্ষমতা দান করেন, তখন তারা দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ গঠন করেন। এ রাষ্ট্র গঠনে শাইখের অনেক অবদান ছিল। তিনি এই রাষ্ট্রের সুরক্ষায় এবং তখনকার আমীরুল মু’মিনীন শাইখ আবু ওমার আল-বাগদাদী رحمه الله কে বাইআত প্রদানের ব্যাপারে অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছেন। সেসময় শাইখের কুরবানি ও প্রচেষ্টা ছিল অনেক। তিনি বিভিন্ন দল, গোত্র ও গোষ্ঠীর কাছে গিয়ে দাওলাহ’র আক্বীদাহ-মানহাজ স্পষ্ট করতেন এবং

---

[67] শাইখ বাগদাদীর দলের নাম ছিল জাইশু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ। তিনি এই দল নিয়ে মাজলিসু শুরাল মুজাহিদীনে যোগদান করেন এবং পরে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’কে বাইআত দিয়ে দেন।

তাদেরকে দাওয়াহ দিতেন।

এক পর্যায়ে শায়েখ আবু ওমার আল-বাগদাদী ﵀ শহীদ হয়ে যান। তখন শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﵀ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন উত্তম পূর্বসূরীর উত্তম উত্তরসূরী।

শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﵀ বলেন, "যখন আবু ওমার ইন্তেকাল করলেন তখন আমরা বলতে লাগলাম, আবু ওমারের মত আমীর আমরা কোথায় পাবো? তখন আবু বকর তার স্থলাভিষিক্ত হলেন। আপনারা কি জানেন, কে এই আবু বকর? যদি আপনারা জানতে চান তাহলে বলি, তিনি হুসাইনী, কুরাইশী রাসুলুল্লাহ ﷺ -এর বংশধর, আলেম, আবেদ, ইবাদাতগুজার, বীর যোদ্ধা। তার মধ্যে আমি দেখেছি আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﵀ -এর দৃঢ়তা, অবিচলতা ও বিশ্বাস। আবু ওমার আল-বাগদাদী ﵀ -এর বুদ্ধিমত্তা, ন্যায়পরায়ণতা, সহনশীলতা ও বিনয়। শাইখ আবু হামযা আল-মুহাজিরের তীক্ষ্ণ মেধা, বিচক্ষণতা, অটল থাকার মানসিকতা ও ধৈর্য। তিনি অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছেন। অনেক ফিতনার মোকাবেলা করেছেন। দীর্ঘ ৮ বছর জিহাদের ময়দানে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছেন অনন্য, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তিনি এর উপযুক্ত যে, তার পা ধৌত করে দিলে এবং তথায় চুম্বন করলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হবে। তাকে আমীরুল মু'মিনীন বলা হবে এবং তার জন্য জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করা হবে। আল্লাহর কসম! আমি যা বলেছি আল্লাহ তা'আলা এর সাক্ষী। আমি মনে করি যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্বাচন করেছেন এবং হেফাজত করেছেন এবং কঠিন দিনের জন্য তিনি তাকে বাছাই করেছেন। সুতরাং হে দাওলাহ' র সৈনিকগণ! আমীরুল মু'মিনীন শাইখ আবু বকরকে পেয়ে আপনারা ধন্য।"

শাইখ আবু বকর দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আমীর হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার হাতে ও তার সৈনিকদের হাতে অনেক সুস্পষ্ট বিজয় দান করেন। তার শাসনামলে দাওলাহ শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হয় এবং সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দাওলাহ শামের ভূমিতে সম্প্রসারিত হওয়ার পর খিলাফাহ ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তাকে আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল

মুসলিমীন হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

এই ছিল আমীরুল মু'মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন শাইখ আবু বকর আল -বাগদাদী ﵀ -এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য। এর দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মহান এই শাইখের মধ্যে আলেমদের উল্লেখিত খলীফাহ হওয়ার সকল শর্ত পূরণ হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল প্রত্যেক মানুষের জন্য কি ইমাম তথা খলীফাহ'কে চেনা আবশ্যক?

না, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইমামের ব্যক্তিসত্তা বা তার নাম জানা আবশ্যক নয়। ইমাম মাওয়ারদী ﵀ বলেন, "জুমহুর আলেমগণ এই মতের উপর রয়েছেন যে, ইমামের পরিচয় বিস্তারিত জানা জরুরী নয়। সংক্ষেপে জানাই যথেষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ইমামের ব্যক্তিসত্তাকে চেনা বা তার নাম জানা আবশ্যক নয়। তবে যদি বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাহলে ভিন্ন কথা।... আর যদি উম্মাহ'র প্রত্যেকের জন্য ইমামের ব্যক্তিসত্তাকে চেনা এবং তার নাম জানা জরুরী হত তাহলে অবশ্যই - তাকে চেনার জন্য- তার নিকট হিজরত করা আবশ্যক হয়ে পড়ত। আর দূরবর্তীদের জন্য না যাওয়ার কোন সুযোগ থাকত না। যদি এমনটা হত তাহলে সকল এলাকা জনশূন্য হয়ে যেত। তখন একদিকে এটা স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থি হত এবং অপরদিকে এর কারণে বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টি হত।"[68]

আবু ইয়ালা ﵀ বলেন, "সকল মানুষের জন্য ইমামের ব্যক্তিসত্তা চেনা এবং তার নাম জানা আবশ্যক নয়। তবে নির্বাচনকারীদের কথা ভিন্ন যাদের মাধ্যমে হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠা হয় এবং খিলাফাহ সংঘটিত হয়।"

এখন আমাদের আলোচনা হবে বাইআত সম্পর্কে।

বাইআতের পরিচয়ঃ আল্লামা ইবনে মানযুর বলেন, "বাইআত হচ্ছে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হওয়া এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। যেমন তাদের প্রত্যেকের মালিকানায় যা আছে তা বিক্রি করে দিবে এবং তার নিজের একনিষ্ঠতা, তার আনুগত্য ও তার

[68] আহকামুস সুলত্বনিয়্যাহঃ ১/১৮

কর্মের অভ্যন্তরীণ অধিকার তাকে দিয়ে দিবে।"[69]

আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন, "আপনি জেনে রাখুন, বাইআত হচ্ছে আনুগত্য করার উপর প্রতিজ্ঞা করা। যেমন বাইআতকারী তার আমীরের নিকট এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে তার নিজের বিষয় এবং মুসলিমদের বিষয়াদি বিবেচনা করার অধিকার আমীরের জন্য সমর্পণ করবে, সে কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করবে না এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সাধ্যানুযায়ী আদেশের ক্ষেত্রে তার আনুগত্য করবে।"[70]

অতএব বাইআত হল এমন প্রতিশ্রুতি যা আনুগত্য ও মান্য করার জন্য শারয়ীসম্মত ইমাম এবং মুসলিমদের খলিফাহ'র নিকট দেওয়া হয়।

বাইআতের হুকুমঃ যে ব্যক্তি মু'মিনদের শাসক হবে শারয়ী দিক থেকে তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আবু হুরায়রা رضي الله عنه নাবী ﷺ থেকে থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, "বানী ইসরাঈলদের (দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নাবীগণ। যখনই কোন নাবী মারা যেতেন, তখনই অন্য আরেক নাবী তার প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নাবী নেই, বরং আমার পর অধিক সংখ্যায় খলীফাহ হবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা প্রথম জনের বাইআত পূর্ণ করবে অতঃপর এর পরের জনের বাইআত পূর্ণ করবে। অতঃপর তাদের অধিকার আদায় করবে এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চেয়ে নেবে। কারণ, মহান আল্লাহ তাদেরকে প্রজাপালনের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।"[71]

"তোমরা পূর্ণ করবে"—এটা একটি আদেশ। অর্থাৎ তোমরা প্রথম জনের বাইআত পূর্ণ করবে। আর শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله ছিলেন আমাদের

---

[69] লিসানুল আরব

[70] মুক্বাদ্দামাতু ইবনে খালদুনঃ ২৯০

[71] বুখারি ও মুসলিম

যামানার নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম খলীফাহ। তাই তার বাইআত পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়েছে।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, "যে বাইআত বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।" উক্ত হাদিসে বাইআত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে খলীফাহ'র বাইআত।

হাফিয ইবনে হাজার উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, "জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহিলী যুগের লোকদের মৃত্যুর অবস্থা যারা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত ছিল এবং তাদের কোন মান্যবর নেতা ছিল না। কারণ তারা এ বিষয়টি জ্ঞাতই ছিল না।" এই হাদিসে উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ঐ ব্যক্তি কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। বরং উদ্দেশ্য হল সে পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাইআত না দিয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থেকে পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

তবে কিছু মিথ্যাবাদী অপপ্রচার চালিয়ে বলে যে, কোন ব্যক্তি খলীফাহ'কে বাইআত না দিলে দাওলাতুল ইসলাম তাকে তাকফীর (কাফির সাব্যস্ত) করে। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাবাদীরা হক্বপন্থিদের ব্যাপারে সর্বদাই মিথ্যা ছড়াতে থাকে। যাতে করে তারা মুসলিমদেরকে হক্বপন্থিদের থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। খলীফাতুল মুসলিমীনকে কোন ব্যক্তি বাইআত না দিলে দাওলাতুল ইসলাম তাকে তাকফীর করে না। বরং দাওলাতুল ইসলাম মনে করে সে একটি শারয়ী ওয়াজিব বিষয় পালন করা থেকে বিরত রয়েছে যার কারণে সে গুনাহগার হবে।

বাইআত ভঙ্গের হুকুমঃ

প্রতিশ্রুতি ও ইমামের বাইআত পূর্ণ করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এবং বাইআত ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেক নছ বর্ণিত হয়েছে–তবে যদি আমরা প্রকাশ্য কুফর প্রত্যক্ষ্য করি তাহলে ভিন্ন কথা। বাইআত ভঙ্গ করা একটি গুরুতর বিষয় এবং কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[72]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার আমীর তথা শাসকের থেকে কোন অপছন্দনীয় বিষয় দেখবে সে যেন এব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে। কারণ কেউ জামাআতের বাইরে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে, সে জাহিলী মৃত্যুবরণ করল।" ইবনে আবী হামযাহ বলেন, "বিচ্ছিন্ন হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ আমীরের অর্জিত বাইআত নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করা।"[73] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে বাইআত বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।"

আর হে মুসলিমগণ! রাসুল ﷺ তো বলেছেন, "তোমরা প্রথম জনের বাইআত পূর্ণ করবে অতঃপর এর পরেরজনের বাইআত পূর্ণ করবে।" আমাদের যামানার প্রথম খলীফাহ ছিলেন আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله - তার মৃত্যুর পর ধারাবাহিকভাবে চলে আসা খলীফাগণের মধ্যে এখন হলেন খলীফাহ আবু হাফস আল-হাশিমী حفظه الله - তাই আপনারা রাসুল ﷺ -এর হাদিসের অনুসরণ করে আবু হাফস আল-হাশিমীর বাইআত পূর্ণ করুন! কারণ বাইআত পূর্ণ করা থেকে পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। কেননা বাইআত বিহীন মৃত্যু হল জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু– আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই।

হে আল্লাহ আপনি সকল মুসলিমদেরকে আমীরুল মু'মিনীন আবু হাফস আল -হাশিমী حفظه الله -এর অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন! আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

চিঠির বক্তব্যঃ "শামের ফিতনা পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় সব এলাকার মুজাহিদরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন। এক দল আগের অবস্থানে আর

---

72 সুরা ইসরাঃ ৩৪

73 মুসলিম বর্ণনা করেছেন

এক দল খিলাফাহ'র ব্যানারে। বিষয়টা এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ খিলাফাহ'র মাধ্যমে ঐক্য আসে না। বরং একে অপরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে আসে ঐক্য। আর ঐক্যের ফলে আসবে খিলাফাহ।"

সম্মানিত ভাইগণ! আমরা পূর্বেই বলেছি যে, আবু সুলাইমান খিলাফাহ'র গুরুত্বকে ছোট করে দেখাতে চেয়েছে এবং বর্তমান সময়ের খিলাফাহ রাষ্ট্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে কুটিলতার সাথে। সে তার চিঠিতে কোথাও এই খিলাফাহ'র বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেনি। কিন্তু এটা তার আসল রূপ নয়। সে তার আসল রূপ গোপন করার জন্য অপব্যাখ্যার মুখোশে আড়াল হয়েছে। আর আমরাও এব্যাপারে নিশ্চিত যে, একদিন না একদিন ঠিকই সে তার বিকৃত চেহারা উন্মোচিত করবে ইনশা'আল্লাহ! আমরা আমাদের গত বক্তব্যে খিলাফাহ'র শারয়ী আহকাম এবং বর্তমান সময়ে নবুওয়াতের আদলে প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ'র ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহের জবাব দিয়েছি। আমরা শারয়ী মানদণ্ডের আলোকে বর্তমান খিলাফাহ রাষ্ট্রের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছি–আলহামদুলিল্লাহ। যারা কুরআন এবং সুন্নাহ'র উপর নির্ভর করেন তাদের জন্য আমাদের উপস্থাপিত দলিলগুলো যথেষ্ট হবে। কারণ আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ'র বক্তব্যসমূহ নিজেদের মনমত ব্যাখ্যা না করে সালাফগণের ব্যাখ্যাগুলো গ্রহণ করেছি। আর যারা কুরআন এবং সুন্নাহ'র বক্তব্যের উপর বিভিন্ন মানুষের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়–যেমন অমুক শাইখ কী বলেছেন? অমুক পীর সাহেব কী বলেছেন? অমুক হুজুর কী বলেছেন? অমুক ব্যক্তি তো জিহাদের পথে এতো বছর ব্যয় করেছেন তিনি কী বলেছেন? –আমাদের উপস্থাপিত বক্তব্য তাদের জন্য কখনোই যথেষ্ট হবে না। কারণ আমরা কুরআন এবং সুন্নাহ'র বক্তব্যের উপর অমুক তমুক শাইখের বক্তব্যকে প্রাধান্য দিতে পারব না–ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ। "আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার হিদায়াতকারী কেউ নেই।"

আবু সুলাইমান শামের ফিতনা বলতে বুঝিয়েছে, প্রথমে বিভক্তি তৈরিকারী, তারপর মুহাজিরদের হারাম রক্ত প্রবাহিতকারী এবং পরবর্তীতে ইরতিদাদের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত বিশ্বাসঘাতক জুলানী ফ্রন্ট ও তার সাহওয়াত মিত্রদের সাথে

দাওলাহ'র যুদ্ধ এবং বিভক্তিকে। আবু সুলাইমান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী, নাগরিক আইন দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকারী, ডাকাত ইত্যাদি দলগুলো থেকে মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ'র পৃথকীকরণকে ফিতনা বলার অপচেষ্টা করেছে। কলুষিত এবং ভ্রান্ত আক্বীদাহ-মানহাজের অনুসারী বিশুদ্ধ আক্বীদাহ-মানহাজের অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়াকে সে ফিতনা বলে চালিয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, শামে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো কোন ফিতনা ছিল না। বরং আক্বীদাহ-মানহাজের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া মেরুকরণ। হক্ব এবং বাতিলের মেরুকরণ যা কখনোই ফিতনা নয়। আল-কায়দা তার মানহাজ থেকে বিচ্যুত হওয়াই মূলত এর জন্য দায়ী। আল-কায়দা যে শামের ঘটনার জন্য দায়ী তার সত্যতা সহজেই বুঝা যায়। যদি আল-কায়দা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক দলগুলোকে ও জুলানীসহ অন্যান্য সাহওয়াতদেরকে সমর্থন না করত তাহলে এই বিভক্তি পৃথিবীব্যাপী ছড়ানোর সম্ভাবনা ছিল না–ওয়াল্লাহু আ'লাম। শামের ঘটনাগুলো যে ফিতনা ছিল না তা বোঝার জন্য ঘটনাগুলোর অন্য একটি দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইঃ

- শামে নির্যাতিত মুসলিমদের সাহায্যার্থে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আমীর শাইখ আবু বকর আল-বাগদাদী ﷽ কর্তৃক জুলানীর নেতৃত্বে জাবহাতুন নুসরাহ'কে শামে প্রেরণ।
- জুলানীর প্রাথমিক পদস্খলন।
- দাওলাতুল ইসলাম ফীল ইরাক ওয়াশ শাম ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে জুলানীর বিশ্বাসঘাতকতা।
- পরবর্তীতে জুলানী কর্তৃক যাওয়াহিরীকে বাইআত প্রদানের ঘোষণা এবং যাওয়াহিরীর বাইআত গ্রহণ।
- সাহওয়াতদের পক্ষ থেকে দাওলাহ'র উপর প্রথমে অতর্কিতে হামলা করা।
- যাওয়াহিরী কর্তৃক দাওলাহ'কে ইবনে মুলজিমের উত্তরসূরী আখ্যায়িত করা।

- জুলানী কর্তৃক যাওয়াহিরীর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা।
- জুলানী কর্তৃক এরদোগানের গোলামি করার ব্যাপারটা একদম উন্মোচিত হওয়া –যা এতোদিন আল-কায়দার সাথে সংশ্লিষ্টতার দরুন মানুষের নিকট অস্পষ্ট ছিল। (আসলে আল-কায়দাই জুলানীর অপকর্মগুলো জনসম্মুখে সুশোভিত করে প্রকাশ করত)।
- অবশেষে জুলানী এবং তার সহযোগী সাহওয়াতরা মিলে আল-কায়দার অতি দুর্বল শামের শাখাটির উপর ক্র্যাকডাউন চালানো।
- শামে আল-কায়দা অস্তিত্ব সংকটে পড়া।

প্রিয় পাঠক! একটু ভালোভাবে খেয়াল করুন! জুলানী তার আমীর আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ -এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধ করল। দাওলাতুল ইসলামও তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে শায়েস্তা করার জন্য লড়াই চালিয়ে গেল। জুলানী এবং তার মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যই মূলত দাওলাহ’কে খারিজি অপবাদ দেওয়া শুরু হয়। ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী দাওলাহ’কে খারিজি ফাতাওয়া দেওয়ার মাধ্যমেই পুরো পৃথিবীতে এই বিভক্তি ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী সাহেবের এই ফাতাওয়া পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুজাহিদগণ গ্রহণ করেন নি। যার প্রমাণ মেলে পৃথিবীতে জিহাদরত অধিকাংশ মুজাহিদগণের দাওলাতুল খিলাফাহ’কে বাইআত প্রদানের মাধ্যমে। যাইহোক, যেসমস্ত সাহওয়াত মুরতাদদের সাথে যুদ্ধের কারণে দাওলাহ’কে খারিজি বলেছে তাকফীরী বলেছে তারাই আজ শামে আল-কায়দাকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে! আল্লাহ ডাক্তারের ষড়যন্ত্রকে তার দিকেই ঘুরিয়ে দিয়েছেন। ডাক্তারও জুলানীর বিশ্বাসঘাতকতার তিক্ত স্বাদ আস্বাদন করেছে। আজ শাম থেকে আল-কায়দা বিলুপ্তির পথে। কয়েক বছর পর একটি ছোট হামলা করা ছাড়া এর কোন কার্যক্রমই দেখা যায়নি। এমনকি ওয়েবসাইটে বিবৃতিও পাওয়া যায়নি। এসব কিছুর জন্য ডাক্তারই দায়ী। তিনি যথার্থই বলেছেন, যে তাকে সাফীহুল উম্মাহ আখ্যা দিয়েছেন। সত্যই সাফীহুল উম্মাহ’র কারণেই পুরো পৃথিবীতে

বিভক্তি তৈরি হয়েছে। তিনি যাদের কারণে দাওলাহ'কে খারিজি বলেছেন তাদের অবস্থা আজ উম্মাহ'র সামনে পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট। তাদের আক্বীদাহ-মানহাজ থেকে বিচ্যুতি এবং রিদ্দাহমূলক কাজ দিবালোকের সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট। ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরীর জুলানীর পক্ষ নেওয়াটাই ছিল বিরাট ভুল–যার মাশুল তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সাফীহুল উম্মাহ'র সাফাহাতের কারণেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কারণ তিনিই আল-কায়দাকে পরিবর্তন করেছেন। ডাক্তারের এই সাফাহাত ইতিহাসের পাতায় কালো অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে–বি-ইযনিল্লাহ।

একদল (আল-কায়দার) প্রথম প্রজন্মের মানহাজের (আগের অবস্থানে) উপর টিকে থেকে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করলেন আর একদল আল-কায়দার ব্যানারে বিচ্ছিন্নতাকে বেছে নিল। যারা পরিবর্তন হয়েছে এবং পদস্খলিত হয়েছে তারা হক্বপন্থিদের সাথে এক পথে চলতে পারবে না। তাই বিষয়টা এরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। হক্ব এবং বাতিল কখনোই কাধেকাধ মিলিয়ে চলতে পারে না। হক্ব এবং বাতিলের মাঝে সমন্বয় সাধন কস্মিনকালেও সম্ভব না।

আবু সুলাইমান চিঠিতে বলেছে, "প্রায় সব এলাকার মুজাহিদরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন।" আবু সুলাইমানের এই বক্তব্যটি পরিপূর্ণ সঠিক নয়। কারণ পৃথিবীতে মুজাহিদদের তিনটি ময়দানের সব মুজাহিদ পরিপূর্ণভাবে খিলাফাহ'কে বাইআত দিয়ে এর কাফেলাতে শরীক করেছেন। উক্ত তিনটি অঞ্চল হল- সিনাই, নাইজেরিয়া এবং ফিলিপাইন। প্রত্যেক এমন স্থান যেখানে আল-কায়দার শাখা আছে সেখানে তারা আল-কায়দাকে ত্যাগ করে মুসলিমদের একজন খলীফাহ'র অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে বেছে নিয়েছেন। ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা পৃথিবীব্যাপী এতো এতো মিথ্যাচার চালিয়েছে, খারিজি খারিজি স্লোগানে কান ভারি করে তুলেছে তথাপি অধিকাংশ মুজাহিদগণ যাওয়াহিরীর বক্তব্য ও তার বিবর্তিত আল-কায়দাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যাওয়াহিরী ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যদি দাওলাহ'কে খারিজি বলে ফাতাওয়া না দিত এবং বিভিন্ন অপপ্রচার না চালাত আল্লাহ চাইলে হয়তোবা সবাই একজন খলীফাহ'র অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদগণ খিলাফাহ'র কাফেলায় শামিল হওয়ার মাধ্যমেই যাওয়াহিরীর

খারিজি ফাতাওয়াকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুজাহিদগণ খিলাফাহ'র সারিতে শামিল হওয়ার মাধ্যমেই শামে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে হক্বপন্থিদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন—আলহামদুলিল্লাহ।

আবু সুলাইমান তার চিঠিতে অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে বুঝাতে চেয়েছে, খিলাফাহ'র মাধ্যমে ঐক্য আসে না, ঐক্য আসে একে অপরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে। আর ঐক্যের মাধ্যমে আসে খিলাফাহ (!!)।

সম্মানিত ভাই! কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র শারয়ী, সিয়াসী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ব্যাপারে অজ্ঞ হলেই একথা বলতে পারে। আবু সুলাইমানের বক্তব্য যে, চরম অজ্ঞতাপূর্ণ তা প্রমাণসহ পেশ করব ইনশা'আল্লাহ। একজন খলীফাহ নির্ধারণ করা এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মুসলিমদের মাঝে ঐক্য তৈরি হয়। চলুন এব্যাপারে দেখে নেই সুরা বাকারাহ'র ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ক্বুরতুবী رحمه الله কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, "এই আয়াত হল একজন ইমাম ও খলীফাহ নিয়োগ করার ব্যাপারে একটি মূলনীতি—যার আনুগত্য করা হবে; যাতে এর মাধ্যমে কালিমা এক হয় এবং খলীফাহ'র হুকুমগুলো এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়।" প্রিয় ভাই, আপনি ইমাম ক্বুরতুবী رحمه الله -এর বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করুন! তিনি বলেছেন, 'যাতে কালিমা এক হয়'—কিসের মাধ্যমে কালিমা এক হবে? খলীফাহ নিয়োগ করার মাধ্যমে কালিমা এক হবে। খলীফাহ কেন নিয়োগ করা হবে? যাতে মুসলিমদের কালিমা এক হয়। ইমাম ক্বুরতুবী رحمه الله একজন ইমাম ও খলীফাহ নিয়োগ করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "لتجتمع به الكلمة" অর্থাৎ যাতে এর মাধ্যমে কালিমা এক হয়। সুতরাং এখানে বক্তব্য একদম স্পষ্ট। তিনি একজন খলীফাহ নিয়োগ করার যে হিকমা উল্লেখ করেছেন তা হল মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাই আমরা আমাদের সালাফগণের সুরে সুর মিলিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলি, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করা এবং একজন খলীফাহ নিয়োগ করার দ্বারাই মুসলিমদের ঐক্য আসে। প্রিয় পাঠক! আপনারাই বলুন, আমরা কি আবু সুলাইমানের হঠকারিতা মূলক বক্তব্য মেনে নেব নাকি সালাফগণের অনুসরণ করব? সুতরাং সালাফগণের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আবু সুলাইমানের এ বক্তব্যঃ খিলাফাহ'র মাধ্যমে

ঐক্য আসে না–তা বাতিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমগণ খিলাফাহ’র মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ হন। আমরা যদি ইতিহাসের পাতা খুলি তাহলে দেখতে পাই, পৃথিবীতে মুসলিমদের অনেকগুলো সালতানাত গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেসব সালতানাতের সুলতানগণ মুসলিমদের খলীফাহ’র কাছে বাইআতবদ্ধ হওয়া ও তাদের আনুগত্য মেনে নেওয়ার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থেকেছেন। আপনি সেলজুক সম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, গজনবী সম্রাজ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করুন, পৃথক পৃথক সালতানাতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন খলীফাহ’র অধীনে। যুগ যুগ ধরে খিলাফাহ এবং খলীফাহ’ই ছিলেন মুসলিম উম্মাহ’র ঐক্যের প্রতীক–এর ভূরি ভূরি উদাহরণ বিদ্যমান। (বইটির কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে তা উল্লেখ করছি না)। আবু সুলাইমান কি এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করবে? সে কি তার কয়েকটি কথা দ্বারা এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে ধামাচাপা দিতে পারবে বা লুকাতে পারবে? সে কখনো এগুলোকে আড়াল করতে পারবে না। সে বা তার নব্য অনুসরণীয় শাইখ(!)রা যতই অপপ্রচার চালাক না কেন মুসলিম উম্মাহ তাতে কর্ণপাত করেও নি আর আল্লাহর ইচ্ছায় করবেও না। মুজাহিদগণ যদি তাদের চেঁচামেচি বিবেচনায় নিত তবে অধিকাংশ মুজাহিদগণ খিলাফাহ’র সারিতে যোগদান করত না। আমরা খিলাফাহ’র বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তোমরা যত পার এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আর কোন অবকাশ দিও না। আল্লাহই এই মাজলুম দাওলাতুল খিলাফাহ’র জন্য যথেষ্ট। হক্বপন্থিদের বিরুদ্ধে তোমাদের ষড়যন্ত্র কোনই কাজে আসবে না। বরং তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের আঁস্তকুড়ে। আর দাওলাতুল খিলাফাহ টিকে আছে (আল্লাহর অনুগ্রহে) এবং টিকে থাকবে বি-ইযনিল্লাহ। দাওলাতুল খিলাফাহ ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় হিসেবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ইনশা’আল্লাহ।

প্রিয় পাঠক! আমরা ইতোমধ্যেই আবু সুলাইমানের বর্ণিত মনগড়া মূলনীতি বাতিল প্রমাণিত করেছি। এখন আমরা তার মনগড়া মূলনীতির বাদবাকি কিছু বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করব ইনশা’আল্লাহ। তাহলে চলুন একটি ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক! সেই ঘটনাটি হল- উসমান رضي الله عنه -এর মৃত্যু পরবর্তী আলী ইবনে

আবী তালিব رضي الله عنه -এর খিলাফাহ’র দায়িত্বভার গ্রহণের ঘটনা। মুসলিমদের তৃতীয় খলীফাহ উসমান رضي الله عنه ঘাতকের হাতে নিজ বাড়িতেই নিহত হন। মুআবিয়া رضي الله عنه সহ অনেকেই উসমান হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন। আহলুল হাল্লী ওয়াল-আকদের ব্যক্তিবর্গের একাংশ আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه কে বাইআত প্রদান করেন। তিনি খিলাফাহ’র দায়িত্ব নেন। কয়েকজন বদরী সাহাবীসহ অনেক বড় বড় সাহাবীগণও তাকে বাইআত দেননি। যারা তাকে খলীফাহ হিসেবে বাইআত দেননি তাদের মধ্যে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণও ছিলেন। তাদের দাবি ছিল আগে উসমান হত্যার বিচার হবে এরপর খলীফাহ নির্ধারণ করা হবে।

প্রিয় ভাই! আলী رضي الله عنه-এর বিরোধিতাকারীদের দাবির বাস্তবতা ছিল খলীফাহ নিয়োগ কিছুটা বিলম্বিত হয় হোক কিন্তু খলীফাহ নিয়োগের আগে উসমান رضي الله عنه -এর হত্যার বিচার হবে। আপনি লক্ষ্য করুন! সাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। তারপরেও আলী رضي الله عنه খিলাফাহ’র দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সবাইকে তার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আলী رضي الله عنه কিন্তু আবু সুলাইমানের মত অনুযায়ী(!) একে অপরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে নেমে পড়েন নি। তিনি কিন্তু আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য খলীফাহ নির্ধারণের পূর্বে উসমান হত্যার বিচার করেন নি। আলী رضي الله عنه -এর শাসনকালে চরম মতানৈক্য ছিল তথাপি খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর হাদিস অনুযায়ী তার খিলাফাহ ছিল নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। আর তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশিদাহ’র অন্তর্ভুক্ত। আমরা এমন একজনের ব্যাপারে বলছি যার শানে রাসুল ﷺ বলেছেন, “তুমি কি এতে খুশী নও যে, তোমার সম্মান আমার নিকট তেমন মুসার নিকট হারূন যেমন।”[74] রাসুলুল্লাহ ﷺ আলীর উদ্দেশ্যে আরো বলেছেন, “হে আল্লাহ! আমি যার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক, আলীও তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক। হে আল্লাহ! যে তার সাথে সম্পর্ক রাখবে, আপনি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন। আর যে তার সাথে শত্রুতা করবে, আপনিও তার সাথে শত্রুতা বজায় রাখুন।”[75] আমরা আলী

[74] সহীহ মুসলিম

[75] আহমাদ

ইবনে আবী তালিব ﵁ -এর উল্লেখিত কর্মে ‘একে অপরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার’ কী বাস্তবতা পেলাম? অথচ আস্থা ফিরিয়ে আনতে দরকার ছিল উসমান ইবনে আফফান ﵁ হত্যার বিচার করা! তিনি কি তা করেছেন? তিনি তা করেন নি। কারণ ‘আস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ঐক্য আসে আর ঐক্যের মাধ্যমে আসে খিলাফাহ’– এমন কথা আল্লাহ এবং তার রাসুল ﷺ বলেন নি। সুতরাং আবু সুলাইমানের মূলনীতিটি একটি নতুন সৃষ্ট বিদআতী মূলনীতি, একটি মনগড়া মূলনীতি–কুরআন এবং সুন্নাহ’তে যার কোন অস্তিত্ব নেই। আলী ﵁ জানতেন যে, মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ হবেন একজন খলীফাহ’র কথা শোনা-মানার মাধ্যমে একে অপরের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে নয়। তাই প্রথমে বাইআত গ্রহণ করেন এবং তারপর উসমান ইবনে আফফান ﵁ হত্যার বিচারের আশ্বাস দেন। আলী ইবনে আবী তালিব ﵁ -এর খিলাফাহ’র সময়কালে চরম মতানৈক্য ও একে অপরের রক্তঝরানো সত্ত্বেও তার খিলাফাহ ছিল নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। মতানৈক্য থাকার কারণে কিন্তু তার খিলাফাহ বাতিল হয়ে যায়নি। আমাদের মনে হয় আবু সুলাইমানের মত লোকজনও আলী ﵁ -এর খিলাফাহ বাতিল–একথা বলার সাহস করবে না।

দাওলাতুল ইসলাম শারীয়াহ’র নির্দেশিত পদ্ধতিতে মুসলিমগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সর্বদা সচেষ্ট। একারণেই তারা একজন খলীফাহ নির্ধারণ করেছেন যেন মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন তার অধীনে। এমনকি এখনো যারা খলীফাহ’র অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়নি তাদেরকে দলিল ও প্রমাণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য দরদমাখা আহ্বান করেই যাচ্ছে। দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ গঠন থেকে নিয়ে আজ অব্দি পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানা এবং কর্তৃত্বাধীন যমীনে পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দাওলাতুল ইসলাম মুসলিমগণের আস্থা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে–আলহামদুলিল্লাহ। দাওলাহ এবং এর সন্তানগণ কখনোই এমনটা মনে করে না যে, ‘আস্থা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে ঐক্য আসবে এবং ঐক্যের মাধ্যমে আসবে খিলাফাহ।’ তারপরেও তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে মুসলিমগণের আস্থা অর্জন করে নিয়েছেন। “যখন আল্লাহ তা’আলা কোন বান্দাকে

ভালোবাসেন, তখন জিবরীল عليه السلام কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসী, তুমিও তাকে ভালোবাসো। অতঃপর জিবরীল عليه السلام -ও তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং আসমানে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা’আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর সে বান্দার জন্য যমীনেও স্বীকৃতি স্থাপন করা হয়। আর যখন আল্লাহ তা’আলা কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরীল عليه السلام কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা করো। অতঃপর জিবরীল عليه السلام -ও তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা’আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা করো এবং আসমানবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। অতঃপর তার জন্য যমীনেও ঘৃণা স্থাপন করা হয়।”[76] দাওলাতুল ইসলাম শারয়ী পদ্ধতি অনুসরণ করে মুসলিমগণের আস্থা ধরে রেখেছে, যার প্রমাণ হল - দাওলাতুল ইসলাম খিলাফাহ ঘোষণা করার পর অনেক অপপ্রচার সত্ত্বেও সকল অঞ্চলের মুজাহিদগণ একে বাইআত প্রদান করেছেন। এর থেকে আস্থার আর বড় প্রমাণ কী হতে পারে?

প্রিয় পাঠক! দ্বীনের কিছু বিষয়ে আপোষ করে কিছু বিষয়ে ছাড় দিয়ে গণতন্ত্রপন্থি, সেকুলারপন্থি, জাতীয়তাবাদী, আরব জোটের অনুসারী এবং অন্যান্য সাহওয়াতদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার নাম আস্থা অর্জন করা নয়। যদি আবু সুলাইমান আশা করে থাকে যে, যারা মনে করে এখনই খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার সময় না এবং উপরে উল্লেখিত দলগুলো দাওলাহ’র উপর আস্থা রাখবে এমন কাজ দাওলাতুল ইসলামের করা উচিৎ ছিল! তবে ভালোভাবে মনে রাখবেন, দাওলাহ এমন কাজ করে না যাতে স্রষ্টা অসন্তুষ্ট হন আর এমন এই কল্পিত আস্থার ধারও ধারে না। কারণ দাওলাতুল ইসলামের দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ খুব ভালোকরেই জানেন যে, আক্বীদাহ-মানহাজকে এক পাশে রেখে এই খিচুড়ি মার্কা আস্থার পরিণাম ৮০ এর দশকে আফগান যুদ্ধের মত হতে বাধ্য। এই কল্পিত আস্থা নামক মরীচিকার পিছনে ছুটে ডাক্তার সাহেব চরম হোঁচট খেয়েছেন। তিনি তিউনিসিয়ায় হোঁচট খেয়েছেন,

[76] মুসলিম

লিবিয়ায় হোঁচট খেয়েছেন এবং শামেও হোঁচট খেয়েছেন। এই কল্পিত আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে চলতে গিয়ে আল-কায়দার দু'টি ফ্রন্ট একেবারেই শেষ। আরেকটি বিলুপ্ত প্রায়—তাদের মিত্রদের আস্থার (!!!) কারণে। শারয়ী পদ্ধতিতে আস্থা তৈরি করতে মনোযোগী না হওয়ার এক নির্মম পরিণাম ভোগ করছে যাওয়াহিরী ও তার পরিবর্তিত আল-কায়দা—والقادم أدهى وأمر بإذن الله

সম্মানিত ভাই! আমরা আবারো আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যেকোনো ঐক্যের মাধ্যমে খিলাফাহ আসে না। এব্যাপারে সর্বশেষ একটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করব। আপনিই বলুন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানে যে সকল দল যুদ্ধ করেছিল তাদের মাঝে কি আস্থা ছিল না? তাদের মাঝে কি ঐক্য ছিল না? আবু সুলাইমানই তো তার চিঠিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদেরকে ঐক্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করতে চেয়েছে! তাহলে কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা হয়নি? কেন হয়নি? কেন? কারণ আবু সুলাইমানের নতুন সৃষ্ট (বিদআতী) মূলনীতি সঠিক নয়। শারয়ী মানদণ্ডেও সঠিক নয় এবং প্র্যাক্টিক্যালীও সঠিক নয়। সবদিক থেকেই তার মনগড়া মূলনীতিটি বাতিল। এর বিপরীতে খিলাফাহ'র মাধ্যমেই ঐক্য আসে। এব্যাপারটি শারয়ী মানদণ্ডে উত্তীর্ণ, সাহাবীগণের কথা এবং কর্মে বাস্তবায়িত। আর সালাফগণও এ পথেই চলেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলিও এর স্বপক্ষে প্রমাণ বহন করে। খিলাফাহ'র মাধ্যমেই ঐক্য আসে—এই চির সত্যটি বর্তমান সময়েও পৃথিবীবাসীর সামনে উদ্ভাসিত। আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী رحمه الله থেকে আমীরুল মু'মিনীন আবু হাফস আল-হাশিমী حفظه الله -এর অধীনে পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ আছেন সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়, ঐক্যবদ্ধ আছেন এক দেহের ন্যায়। আর এমন ঐক্য ও সংহতি দেখে শত্রুরা ক্রোধে জ্বলে পুরে মরছে। তাই আমরা শত্রুদের বলি, موتوا بغيظكم!

চিঠির বক্তব্যঃ "বিষয়টি যদি খিলাফাহ মানা না মানার দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলেও হয়তো কিছু আশার আলো বাকি থাকতো। কিন্তু কারণ শুধু খিলাফাহ বা বাইয়াহ বা তামকীন অর্জন কেন্দ্রীক দ্বন্ধ এর আগেও ছিল। স্বয়ং

সাহাবীদের সময়ও অনেক রক্তপাত হয়েছে এ নিয়ে। কিন্তু বিষয়টা শুধু যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। এর চেয়ে হাজার গুণ বড় ফিতনা গ্রাস করল প্রায় সবাইকে। তা হল ‘তাকফীর ও তাবদী’ (কাউকে বিদআতী যেমন খারিজি বলা)।”

জি হ্যাঁ! বিষয়টি যদি খিলাফাহ মানা না মানার দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলেও হয়তো কিছু আশার আলো বাকি থাকত। কারণ শুধুমাত্র কোন একজন খলীফাহ’কে বাইআত দেওয়া না দেওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব বা তামকীন অর্জন কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব এর আগেও ছিল। এমনকি সাহাবীগণের যুগেও ছিল। অনেক রক্তপাত হয়েছে এ নিয়ে। কিন্তু বিষয়টা শুধু যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না।

আবু সুলাইমান সবকিছু জেনে বুঝেও না বুঝার ভান ধরেছে। সে যেহেতু বেঙ্গল অঞ্চলে দাওলাহ’র একজন বড় দায়িত্বশীল ছিলো তাই সে যখন কোন মিথ্যাচার করবে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে তখন অন্য যে কেউ কিছুটা বেশি সন্দেহ প্রবণ হবে। এটা একটা স্বাভাবিক বিষয়। আমরা পাঠকদের প্রশ্ন করতে চাই, দাওলাতুল ইসলামের সৈনিক এবং আল-কায়দার সাধারণ অনুসারীরাও কি জানে না যে, দাওলাহ এবং আল-কায়দার মাঝে পার্থক্য হল আক্বীদাগত পার্থক্য এবং মানহাজগত পার্থক্য? এটা কে না জানে? দাওলাহ এবং আল-কায়দার মাঝে কয়েকটি স্থানে লড়াই হচ্ছে তা আক্বীদাহ এবং মানহাজগত পার্থক্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এই বিষয়টা আবু সুলাইমান আরো ভালভাবে জানে, কারণ আমাদের সাবেক মুখপাত্র শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী رحمه الله অনেকবার বলেছেন যে, ‘দাওলাহ এবং আল-কায়দার মধ্যে দ্বন্দ্ব কে কাকে বাইআত দিল আর কে কার বাইআত ভঙ্গ করল তা নিয়ে নয় বরং আমাদের দ্বন্দ্ব হল মানহাজগত দ্বন্দ্ব’। আর আবু সুলাইমান তো দীর্ঘ সময় এই কথা মানুষকে বুঝানোর মাধ্যমেই অতিবাহিত করেছে। সুতরাং যে কেউ বুঝতে পারছেন যে, আবু সুলাইমান জেনে-বুঝেও বিষয়টি বেমালুম চেপে গেছে।

সম্মানিত ভাই! আল-কায়দার সাথে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের বিষয়টি শুধুমাত্র এভাবে বোঝা যাবে না যে, কে আগে যুদ্ধ শুরু করেছে? বা আল-কায়দার পক্ষ থেকে খিলাফাহ মেনে নেয়নি। বর্তমানের যে পরিবর্তিত আল-কায়দাকে দেখছেন—এর

আক্বীদাহ-মানহাজ যখন আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করব তখনই আপনার সহজে বুঝে ফেলবেন যে, এ লড়াই আক্বীদাহ'র লড়াই। এ লড়াই মানহাজের লড়াই। এ লড়াই হক্ব বাতিলের লড়াই। ব্যাপারটি আর কেবলই যুদ্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। **বরং এর চেয়ে হাজারগুণ বড় ফিতনা গ্রাস করল তালেবান ও তালেবানের অনুসারী আল-কায়দাকে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র মত মহান আক্বীদাহ'কে ধ্বংস করেছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আম্মাজান আয়িশা رضي الله عنها কে গালি দানকারী এবং অপবাদ আরোপকারীদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আবু বকর, ওমার, উসমান رضي الله عنهم সহ অধিকাংশ সাহাবীগণকে তাকফীরকারী এবং লা'নতকারীদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা উইঘুরে মুসলিমদের নির্যাতনকারী এবং রাখাইনে মুসলিমদের নির্যাতনকারীদের মদদদাতা চীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আল্লাহর রাসুল ﷺ কে নিয়ে ব্যঙ্গ ও কটূক্তিকারী ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চায়। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতা সৌধে ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়–শারয়ী বাক্যে এভাবে বলা হবে, যারা খাম্বা পূজা করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা ICC ক্রিকেট খেলার বৈধতা দেয়।** ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা জাযিরাতুল আরবে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ সফলভাবে আয়োজনের জন্য কাতারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা আফগান, শাম, সোমালিয়ায় মুসলিমদের হত্যাকারী তাগুত এরদোগানকে মহান মুসলিম আলেম হিসেবে আখ্যায়িত করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা শিরকী চিহ্ন ও স্থাপনাসমূহ রক্ষা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে–ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের বাহনা দিয়ে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আহ্বান করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফিতনা গ্রাস করেছে তাদেরকে যারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের হত্যা করার কারণে নিন্দা জ্ঞাপন করে। ফিতনা তাদেরকে গ্রাস করেছে যারা বিপাদপদের সময় পদস্খলিত হয়েছে এবং যারা মুসলিমদের খলীফাহ'র বাইআত ভঙ্গের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের মধ্যে পতিত

হয়েছে। চলুন কিছুটা গোছালো ও বিস্তারিতভাবে জেনে নেই ফিতনাগ্রস্থ হওয়ার কিছু চিত্র। প্রথমেই আসি তালেবান প্রসঙ্গেঃ

◆বড় ফিতনা গ্রাস করেছে আল-কায়দার উমারা তালেবানকে।

আমরা বিগত সময়গুলোতে দেখেছি এবং এখনো দেখছি, তালেবান জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করার ঘোষণা দিয়েছে, জাতিসংঘের প্রচারপত্র রক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছে এবং তালেবান জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তালেবান সুহাইল শাহীনকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে।

প্রিয় ভাই! জাতিসংঘের সাথে তালেবানের এই দহরম-মহরমের বিষয়টি তো আমরা তালেবানের বিভিন্ন নেতা আর তালেবানের অফিসিয়ালি ওয়েবসাইট থেকেই জানতে পেরেছি। তালেবান তাদের একাজগুলোকে ভুল তো মনে করেই না উপরন্তু তারা এগুলো গর্বের সাথে প্রকাশ করে।

জাতিসংঘ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠাই হয়েছে ইসলাম ও মুসলিমদের নিঃশেষ করার জন্য, অশ্লীলতা প্রচার করার জন্য, ইসলামী শারীয়াহ’কে বিলুপ্ত করার জন্য। আমরা জানি যে, এই শতাব্দীর মুজাহিদ আলেমগণ আরবের শাসকদেরকে তাকফীর করার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে জাতিসংঘে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। বিশেষত আল-কায়দার অনেক শাইখ সৌদি, কাতার, কুয়েত–এই সমস্ত দেশের শাসকদের যেসকল কুফরির কারণ বর্ণনা করেছেন এর একটি হচ্ছে জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কারণ জাতিসংঘ হচ্ছে একটি কুফরি জোট। জাতিসংঘ হচ্ছে তাগুত। এই জাতিসংঘ মুসলিমদের মুরতাদ হওয়ার আহ্বান করে। এই জাতিসংঘ আল্লাহর শারীয়াহ বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করার আহ্বান করে। এই তাগুতী সংস্থা অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দিকে আহ্বান করে। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার ব্যাপারে ডাক্তার আইমান আয-যাওয়াহিরী বলেন, “এটা এমন এক সংস্থা যা আল্লাহর শারীয়াহ’র প্রতি দায়বদ্ধ নয়, ধর্মহীনতা ও মুরতাদ হওয়ার আহ্বান জানায় এই সংস্থা, ইসলাম ও মুসলিমদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ কে গালি দেওয়া এবং

মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা করাই এই সংস্থার চরিত্র। ইসলামী শারীয়াহ'র প্রতি ভালবাসা পোষণকারী, রিদ্দাহ ও ধর্মহীনতায় নাখোশ, এসবে বারণকারী, আল্লাহর দ্বীন ও নাবী ﷺ -এর প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং মুসলিম ভাইদেরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা লালনকারী কোন মুসলিমের পক্ষে কিভাবে এই জাতিসংঘের সদস্য হওয়াটা মেনে নেওয়া সম্ভব? কিভাবে সম্ভব?"[77]

শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ান ﷾ বলেন, "অতঃপর শারয়ী কিছু হুদুদ এবং সুনির্দিষ্ট অংশ অপসারণের ব্যাপারে জাতিসংঘের চুক্তিগুলো মেনে নেয়া। উদাহরণস্বরূপ জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা। প্রতিটি এমন দেশ যারা জাতিসংঘের চুক্তিসমূহ মেনে চলে, তাদের জিহাদ আত-ত্বলাব তথা আক্রমণাত্মক জিহাদকে অপরাধ সাব্যস্ত করা আবশ্যক হয়। আল্লাহর ফরজ বিধানসমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ বিধানকে অপরাধ সাব্যস্ত করা–কোন মুসলিম এব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না যে, এটি একটি ঈমান ভঙ্গকারী বিষয়।"

আমরা জানি যে, তালেবান ২০২১ সালের ১৫ ই আগষ্ট আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের দিন কয়েক পরে জাতিসংঘে যাওয়ার জন্য আবেদন করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তালেবানের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে কথা বলার জন্য সুহাইল শাহীনকে প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এখনই তালেবানকে গ্রহণ করেনি বিধায় তালেবান জাতিসংঘের অধিবেশনে যেতে পারছে না। কিন্তু যখন জাতিসংঘ এব্যাপারে সম্মতি দিবে তখন তালেবান জাতিসংঘে যাবে। যার জন্য তালেবান সুহাইল শাহীনকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে রেখেছে।

এখন কেউ বলতে পারে, মোল্লা ওমার ﵀ -এর সময় তো তালেবান জাতিসংঘের স্বীকৃতি চেয়েছিল। আমরা বলি, প্রথমতঃ স্বীকৃতি চাওয়ার আলোচনা উঠা আর জাতিসংঘে যোগদান করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা এক বিষয় নয়। এরপরেও আমরা ইউসুফ আল-উআইরী ﵀ -এর বক্তব্যটি এখানে নক্বল করছিঃ

[77] নাসীহাতুল উম্মাতিল মুওয়াহহিদাহ বি-হাক্বীকতিল উমামিল মুত্তাহিদাহ

তিনি বলেছেন, “যখন আমি মুফতি নিজাম উদ্দীন শামজাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা শুনেছি যে, তালেবান জাতিসংঘে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেছে, (এটা কি সত্য)? - তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, এটা সত্য। আমি নিজে এবং কয়েকজন উলামা গিয়ে আমীরুল মু’মিনীনকে পরামর্শ দিলাম। তাই তিনি (আমীরুল মু’মিনীন) বললেন, আমি (ইসলামী ইমারাতের) স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই চাই না এবং আমরা শুধুমাত্র তাদের আইন থেকে সেই আইন প্রয়োগ করব যা শারীয়াহ’র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমরা তাকে বলেছিলাম, আজকের বাস্তবতায় এটা সম্ভব নয়- শুধুমাত্র জাতিসংঘে প্রবেশ করাই কুফর, কুফরি প্রবিধান থেকে তারা যা বাধ্যতামূলক করে তার কারণে। তাই আমরা তাকে ছেড়ে দিলাম এবং সে সন্দেহ ও অনিশ্চিত রয়ে গেল। এবং এই বছর যখন আমরা তাকে দেখতে গিয়েছিলাম, তখন আমরা দেখতে পেয়েছি যে, এই ধারণাটি তার মনের মধ্য থেকে মুছে গেছে।” সুতরাং শাইখ এখানে উল্লেখ করেছেন, কেবলমাত্র জাতিসংঘে প্রবেশ করাই একটি কুফরির কারণ। আর তৎকালীন আল-কায়দার শাইখগণ যখন এ বিষয়টি শুনেছেন তখন তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বিষয়টি যাচাই করেছেন। কিন্তু যখন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله স্বীকৃতির বিষয়টিও মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন তখন বাকিরা সকলেই স্বস্তি অনুভব করেন।

এখন কেউ বলতে পারে যে, মোল্লা ওমার رحمه الله তো জাতিসংঘের স্বীকৃতি চাওয়ার কথা বলেছিল। এক্ষেত্রে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে- মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله যখন জাতিসংঘের স্বীকৃতি চাওয়ার কথা বলেছিলেন তখনই মুহাক্কীক্ব কিছু আলেম মোল্লা ওমার رحمه الله -এর সাথে সাক্ষাৎ করে জাতিসংঘে যোগদানের ভয়াবহতা সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। তারা মোল্লা ওমার رحمه الله কে বুঝাতে সক্ষম হন যে, জাতিসংঘে প্রবেশ করা কুফর। তখন তিনি এ থেকে বিরত থাকেন। এখানে একজন ব্যক্তি একটি কাজের কথা চিন্তা করেছে কিন্তু যখন এই কাজের ব্যাপারে শারয়ী হুকুম তাকে অবহিত করা হয়েছে তখন সে এই কাজ করার চিন্তাই বাদ দিয়েছে। ঠিক মোল্লা ওমার رحمه الله -এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে। আর ঐ সময়টাতে ইসলামের ব্যাপারে জাতিসংঘের এতো নিকৃষ্ট কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক

মুসলিমই অনবহিত ছিল। কিন্তু নতুন করে পশ্চিমারা মুসলিমদের দেশগুলোতে আগ্রাসন চালানোর পর বিষয়টি সবার সামনেই স্পষ্ট হয়ে যায়। যাইহোক, কিন্তু এবার তালেবান যখন জাতিসংঘে যাওয়ার আবেদন করল এবং একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করল তখনও আমরা দেখেছি তালেবানের অনুগত ডাক্তার যাওয়াহিরী জাতিসংঘে প্রবেশের কুফল সম্পর্কে সতর্ক করলেন। কিন্তু তার এ সতর্ক করাতে কোন লাভই হয়নি। জাতিসংঘে যাওয়ার ব্যাপারে তালেবান কোন নীতি-ই চেঞ্জ করেনি। বরং তালেবানের ঊর্ধ্বতন নেতাদের বক্তব্যে ও বিবৃতিতে জাতিসংঘ সম্মতি দিলে তালেবানের যোগদানের বিষয়টি আরো স্পষ্ট হচ্ছে। এমনকি সেই স্থায়ী প্রতিনিধি দিন কয়েক আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছে, জাতিসংঘে তাদের স্থানে যাওয়ার জন্য তারা জোড় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তবে এখানে আরো একটি বিষয় হচ্ছে তালেবান ক্ষমতায় যাওয়ার আগে জাতিসংঘের প্রচারপত্র রক্ষা করার এবং জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ঘোষণা দিয়েছে। জাতিসংঘের সবকিছুই শারীয়াহ বিরোধী–বিষয়টি ডাক্তার যাওয়াহিরীও তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন। জাতিসংঘ যে একটি তাগুতী সংস্থা এতে তো কারো দ্বিমত নেই। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তালেবান জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক রাখে? আপনি চিন্তা করুন– যারা সর্বত্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এমন একটি কুফরি জোটের সাথে কিভাবে তালেবান সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। এমনকি জাতিসংঘের সবচেয়ে নিকৃষ্ট একটি সংস্থা হচ্ছে ইউনেস্কো। এই ইউনেস্কো জাতিসংঘের সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংস্থা। অশ্লীলতা, যিনা-ব্যভিচার, নারী অধিকারের নামে মুসলিমা নারীদেরকে কুফরিতে লিপ্ত করাসহ আরো অনেক অপকর্মের প্রচারক হচ্ছে এই ইউনেস্কো। এই ইউনেস্কো আফগানিস্তানে এখনো কাজ করে যাচ্ছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله -এর তালেবান যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তো আফগানিস্তানে জাতিসংঘের এতো আনাগোনা ছিল না। কিন্তু এখন কেন আফগানে জাতিসংঘের অফিস বিদ্যমান, তাদের কার্যক্রম বিদ্যমান?! আমরাও দেখি তালেবান জাতিসংঘের নারী প্রতিনিধিসহ অনেকের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে যাচ্ছে। অথচ তাদের উপর আবশ্যক ছিল পরিপূর্ণভাবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালিদাতা, অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রচারকারী এবং মুসলিমদেরকে রিদ্দায়

নিক্ষেপকারী এই কুফরি তাগুতী জাতিসংঘের থেকে বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করা। জাতিসংঘ একটি তাগুতী কুফরি সংস্থা এটা কি তালেবান জানে না? কিছুদিন পূর্বেই তো তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাতিসংঘ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো ইয়েমেন, সোমালিয়া, মালি, কঙ্গোতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আল্লাহ তো এই সমস্ত তাগুতকে অস্বীকার করতে বলেছেন, বলেছেন তাদের সাথে শত্রুতা করতে। জাতিসংঘের সাথে সুসম্পর্ক করা কি কাফিরদের সাথে ওয়ালা করার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তাগুতকে অস্বীকার না করার অন্তর্ভুক্ত নয়? অথচ তালেবান জাতিসংঘে যোগ দিতে চাচ্ছে এবং তাদের পক্ষ থেকে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ দিয়েছে—যা সুস্পষ্ট কুফর।

শাইখ আবু হাফস আশ-শামী ﷾ বলেন, “আমরা জাতিসংঘ সংস্থার কুফরির দিকগুলো স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। তাই আমরা বলি, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে এই সংস্থাকে সমর্থন করবে সে কাফির, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জাতিসংঘের চুক্তিপত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা একে স্বীকৃতি দেয় বা তা মেনে চলে অথবা একে শ্রদ্ধা করার ঘোষণা দেয় সে একজন কাফির। এই মাস’আলাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস’আলা। প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে জাতিসংঘের চুক্তিপত্র শ্রদ্ধা করার ঘোষণা দেয় সে একজন কাফির। এটা ঐ ব্যক্তির মত যে কুফরকে শ্রদ্ধা করার এবং স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেয়।”[78]

◆ বড় ফিতনা গ্রাস করেছে হাইবাতুল্লাহ’র তালেবানকে।

তালেবান কাতারে তাদের রাজনৈতিক অফিস খোলার পরে একটি সংবাদ সম্মেলন করে। সেই সম্মেলনে তালেবানের রাজনৈতিক অফিসের মুখপাত্র ড. নঈম বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতি প্রদানকালে ড. নঈম বলে, তালেবান আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করে। কিছু দিন পূর্বে তালেবানের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ ফ্রান্স টুয়েন্টি ফোরকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে ফ্রান্সের সাথে সম্পর্ক তৈরির কথা প্রসঙ্গে বলেছে, “ফ্রান্সের সাথে আমরা আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বন্ধুত্বপূর্ণ

---

[78] দুরূসুন ফীত-তাওহীদ

সম্পর্ক করতে চাই।” এছাড়াও তালেবানের নেতাদের বিভিন্ন বিবৃতি ও সাক্ষাৎকারে আন্তর্জাতিক আইন স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে।

গেল কিছু দিন পূর্বে ফিলিস্তিনে ইসরাইলের নৃশংস হামলার প্রেক্ষিতে তালেবানের প্রধান বিচারপতি আব্দুল হাকিম হাক্কানী বিবৃতি দিয়েছে। সেই বিবৃতিতে তালেবানের প্রধান বিচারপতি বলেছে, “আমরা আন্তর্জাতিক আদালত ও ট্রাইব্যুনালকে আহ্বান জানাই, **তারা যেন দখলদার ইহুদিবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে** গুরুত্বের সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়। এই দখলদার বাহিনী সময়ের সাথে সাথে নিজেরাই নিজেদের বর্বরতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে।”[79] ইহুদীরা ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নৃশংস নির্যাতন চালাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের জন্য কি আন্তর্জাতিক আদলতের দ্বারস্থ হতে হবে?

আমরা সকলেই জানি যে, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে কুফরি আইন। এই আইনের প্রণেতারা হচ্ছে কাফির। কিভাবে একজন ব্যক্তি কুফরি আইনকে শ্রদ্ধা করার কথা বলতে পারে! হারবী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তাও আবার তাদের আইন অনুসারে! আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় চাই। তালেবানের পক্ষ থেকে এই আইনকে শ্রদ্ধা করার ঘোষণা কি এই আইনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা নয়? অথচ আমরা জানি যে, আহলুল ইলমগণ বর্ণনা করেছেন, “কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াও কুফর।” তাহলে তালেবান আজ কোন পথে হাটছে! কিভাবে তালেবানের প্রধান বিচারপতি আন্তর্জাতিক তাগুতী আদলতকে বিচার করার জন্য আহ্বান জানাতে পারে! শাইখ আবু হাফস আশ-শামী ﷾ বলেন, “এমনিভাবে প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আন্তর্জাতিক আইনকে অথবা এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে বা এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য আহ্বান করবে সে কাফির। আমরা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যে, আন্তর্জাতিক আইন হচ্ছে এমন পরিভাষা যার মাধ্যমে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত এবং নিরাপত্তা পরিষদের আইনসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়। তাই প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে আন্তর্জাতিক আইনকে এবং এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করবে অথবা এর সিদ্ধান্ত

[79] আল-ফিরদাউস নিউজ, তারিখ ০৬/১১/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান করে সে একজন কাফির।”[80]

আবার কেউ কেউ বলে যে, “মাসলাহার কারণে তালেবান এই ধরনের বিবৃতি দিচ্ছে এতে কোন সমস্যা নেই।” শাইখ উসামা رحمه الله বলেন, “রাষ্ট্রের মাসলাহা থেকে শারীয়াহ’র মাসলাহা অনেক বড়।”[81] আমাদের বক্তব্য হবে সালাফগণের বক্তব্যের আলোকে। আমরা জানি যে, মাসলাহার কারণে কুফরি কথা বলা বৈধ নয়। যেমন ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন, “উম্মাহ’র মাঝে এব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই যে, কোন মাসলাহা বা স্বার্থের কারণে কুফরি কথা বলার অনুমিত দেয়া জায়েয নেই। তবে যাকে বাধ্য করা হয় সে ব্যতীত যখন তার অন্তর ঈমানের প্রতি প্রশান্ত থাকে।”[82] তাহলে কি ড. নঈম আর জবিহুল্লাহ মুজাহিদসহ তালেবানের নেতারা আন্তর্জাতিক আইনকে শ্রদ্ধা করা এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে নেয়ার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে? ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, “শিরক করা, ইলমহীন আল্লাহর ব্যাপারে কথা বলা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা এবং জুলুম—এগুলোর মধ্যে কোন মাসলাহা নেই।”[83]

সুতরাং যারা তালেবানের এই ধরনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে মাসলাহার অজুহাত দেয় তাদের যুক্তি সালাফগণের বক্তব্য অনুসারে প্রত্যাখ্যাত। বাস্তবিকপক্ষে তালেবানও তাদের এই ধরনের কাজের ব্যাপারে মাসলাহার অজুহাত দেয় না।

- বড় ফিতনা গ্রাস করেছে তালেবানকে।

আমরা জানি যে, তালেবান মুশরিক রাফিদীদেরকে তাদের দলভুক্ত করেছে, তাদের নিরাপত্তা দিচ্ছে। এমনকি তালেবান রাফিদীদেরকে আশুরার নামে শিরকী উৎসব পালন করার অনুমতি দিচ্ছে এবং সেই উৎসব সফলভাবে পালন করার জন্য

---

80 দুরূসুন ফীত-তাওহীদ

81 খুতওয়াতুন আমালিয়্যাহ লি-তাহরীরি ফিলিস্তিন

82 ই’লামুল মুআক্কিয়ীনঃ ৩/১৭৮

83 মাজমুউল ফাতাওয়াঃ ১৪/৪৭৬

নিরাপত্তা দিচ্ছে। আর রাফিদীদের সেই আশুরা উৎসবে কী পালিত হয়? তারা সেই উৎসবে সাহাবীদেরকে গালি দেয়, উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها কে ব্যভিচারিণী আখ্যায়িত করে তার প্রতিকৃতি বানিয়ে রজম করে, আলী এবং হুসাইন رضي الله عنهما -তাদের ইবাদাত করাসহ প্রভৃতি শিরকী বিষয় পালন করে। তারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এক মুরতাদ সম্প্রদায়। রাফিদীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করার ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে। কিন্তু তালেবান রাফিদীদের এই সমস্ত শিরকী কর্মকাণ্ড অপসারণ বা উৎখাত তো করেই না উল্টো যারা সাহাবীদের গালিদাতা রাফিদীদের শিরকী কর্মকাণ্ড উৎখাত করার চেষ্টা করে তালেবান তাদেরকে হত্যা করে, বন্দি করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এরচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে তালেবান এই রাফিদীদের আক্বীদাসমূহকে সম্মান করে–ওয়াল-ইয়াযু বিল্লাহ। তালেবান ঘোষণা দিয়েছে যে, রাফিদীরা তাদের আক্বীদাহ চর্চা করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তালেবানের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী শের আব্বাস স্টানিকজাই মিডিয়াকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছে, "আফগানিস্তানে জাফরী ফিক্বহের আমাদের শিয়া ভাইদের প্রতি, আমরা তাদের আক্বীদাহ এবং উসুলকে ইহতিরাম তথা সম্মান করি। আমরা তাদের উপর কখনো জুলুম করিনি এবং পূর্বেও তাদের সাথে আমাদের কোন সমস্যা ছিল না। আর এখনোও তাদের সাথে আমাদের কোন সমস্যা নেই। আমরা তাদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আর তারা তাদের আক্বীদাহ চর্চার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ধন্যবাদ।"

জাফরী শীয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে - "আমরা তাদের আক্বীদাহ এবং উসুলকে সম্মান করি"–এই অংশটুকু। তালেবান রাফিদীদের আক্বীদাহ এবং উসুলকে সম্মান করে যা দ্বীন ভঙ্গকারী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এখন আমাদের রাফিদীদের কিছু আক্বীদাহ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। জাফরী শীয়ারা বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদী। আর বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীদের অসংখ্য শিরকী আক্বীদাহ রয়েছে। যেমন তারা মনে করে আমাদের মাঝে বিদ্যমান পবিত্র কুরআন হচ্ছে বিকৃত। তারা মনে করে বিপাদপদে আলী এবং হুসাইন رضي الله عنهما তাদেরকে সাহায্য করে। রাফিদীরা মনে করে উম্মুল

মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها হচ্ছে ব্যভিচারিণী–নাউজুবিল্লাহ। রাফিদীরা অধিকাংশ সাহাবীদেরকে তাকফীর করে। তারা সর্বদাই আবু বকর এবং ওমার رضي الله عنهما কে লা'নত করে। এছাড়াও রাফিদীদের আরো অনেক নিকৃষ্ট শিরকী আক্বীদাহ রয়েছে। কিভাবে তালেবান রাফিদীদের এই সমস্ত শিরকী আক্বীদাহসমূহকে ইহতিরাম করতে পারে? আর কিভাবেই বা যারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها কে গালি দেয় তাদেরকে তালেবান ভাই বলে সম্বোধন করতে পারে? যারা সাহাবীদেরকে গালি দেয় তালেবান কিভাবে তাদের জন্য মুসলিম মুওয়াহহিদদেরকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করে? তালেবানের গায়রত কি এতোটাই নিচে নেমে গেছে? নাকি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা সিদ্দীকা رضي الله عنها এবং সাহাবীদেরকে গালি দিলে তালেবানের গায়রতে লাগে না? গেল আশুরায় রাফিদীদের শিরকী অনুষ্ঠানে তালেবান ঘোষণা দিয়েছে, রাফিদীদের সাথে তাদের পার্থক্য শাখাগত মাজহাবী পার্থক্য। সুবহানাল্লাহ! যারা আলী رضي الله عنه কে ইলাহ সাব্যস্ত করে তাদের সাথে কি ইসলামের শাখাগত পার্থক্য? যারা মনে করে কুরআন বিকৃত তাদের সাথে কি মুসলিমদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত? আল্লাহর কসম! কখনোই না। ইসলামের সাথে রাফিদীদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত নয় পার্থক্য হচ্ছে মৌলিক পার্থক্য, পার্থক্য হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের পার্থক্য। তাহলে কিভাবে তালেবান তাদের শিরকী কুফরি আক্বীদাহ ও উসুলকে সম্মান করতে পারে! কিভাবে তালেবান এই সকল শিরকী আক্বীদাহ চর্চার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে পারে? আর কিভাবেই বা তালেবান রাফিদীদের শিরকী উৎসবগুলোকে বন্ধ না করে সেগুলোকে পালন করার জন্য নিরাপত্তা দিতে পারে? বরং যারা এই সমস্ত শিরকী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে চায়, যারা এই মুশরিক রাফিদীদের উৎখাত করতে চায় তালেবান তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে!

শাইখ ফারিস আলু শুআইল আয-যাহরানী رحمه الله সৌদি শাসকদের তাকফীর করার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, "তারা কাফির কারণ তারা শিরকে আকবার তথা বড় শিরকের অনুমোদন দেয়, এটি পরিবর্তন করার চেষ্টাও করে না এবং অন্য কাউকে এটি পরিবর্তনের সুযোগও দেয় না–এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল যা মাসজিদে নববীতে ঘটেছে অপবিত্র রাফিদীদের কার্যক্রম।" অর্থাৎ

শাইখ যাহরানী ﷾ মাসজিদে নববীতে রাফিদীদের কার্যক্রম পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়ার কারণে সৌদি শাসকদেরকে তাকফীর করার একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তালেবান কি কেবলমাত্র রাফিদীদেরকে তাদের কার্যক্রম করার অনুমতি দিচ্ছে? না, বরং তালেবান রাফিদীদের শিরকী উৎসবগুলোতে সশস্ত্র পাহারা দিচ্ছে। এরচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে তালেবান যারা রাফিদীদের ভাই বলে সম্বোধন করে এবং মনে করে ইসলামের সাথে রাফিদীদের দ্বীনের পার্থক্য শাখাগত ফিক্বহী মাজহাবী পার্থক্য। এরচেয়েও আরো ভয়াবহ হচ্ছে রাফিদীদের শিরকী কুফরি আক্বীদাহ ও মূলনীতিসমূহকে তালেবানের পক্ষ থেকে সম্মান করার ঘোষণা দেওয়া। তালেবানের এ ঘোষণা দেওয়া কি সুস্পষ্ট কুফর নয়?

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ﵀ বলেন, “কোন মানুষ যখন মুশরিকদের জন্য তাদের দ্বীনের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করবে–তাদের থেকে ভয়ের আশঙ্কা করে অথবা সৌজন্যমূলক আচরণ করে অথবা তাদের অনিষ্টতা প্রতিরোধ করার জন্য চাটুকারিতা করে তাহলে নিশ্চয়ই সে তাদের মত কাফির হয়ে যাবে। যদিও সে তাদের দ্বীনকে অপছন্দ করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং ইসলাম ও মুসলিমদের ভালবাসে।”[84] তালেবান কি রাফিদীদের ভয়ে তাদের শিরকী আক্বীদাহ’কে সম্মান করার ঘোষণা দিয়েছে? রাফিদীদের আক্বীদাহ এবং উসুল যে শিরকী আক্বীদাহ ও উসুল এটা কি কোন মুসলিম অস্বীকার করতে পারবে?

এখন কেউ বলতে পারে যে, তালেবানের কয়েকজন নেতার বক্তব্য কি তালেবানের বক্তব্য হিসেবে ধরা হবে? হ্যাঁ, তালেবানের কয়েকজন নেতার বক্তব্য তালেবানের বক্তব্য হিসেবে ধরা হবে; কারণ দল বা রাষ্ট্র যখন কোন বিবৃতি প্রকাশ করে তখন সেই দল বা রাষ্ট্র তার কোন একজন কর্মকর্তার মাধ্যমে তা প্রকাশ করে। আর শের আব্বাস স্টানিকজাই একজন উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সে এই বক্তব্য তালেবানের মন্ত্রীপরিষদের ব্যক্তিদের সামনে দিয়েছে। সুতরাং তার বক্তব্য তালেবানের বক্তব্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। আর তালেবান রাফিদীদের সম্পর্কে এই

[84] আদ-দালাঈল ফী হুকমি মুওয়ালাতি আহলিশ শিরক

ধরনের বক্তব্য বিগত কয়েকবছর আগ থেকেই দিয়ে আসছে। এছাড়াও তালেবানের কর্মকাণ্ডও শের আব্বাসের কথার প্রতিনিধিত্ব করে।

◆ বড় ফিতনা গ্রাস করেছে তালেবানকে।

প্রথমতঃ আমরা জানি যে, রাফিদীরা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক সম্প্রদায়। এব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। রাফিদীরা বারো ইমামে বিশ্বাসী। তাই তাদেরকে ইমামিয়্যাহও বলা হয়। তাদেরকে তাকফীরের ব্যাপারে সামআনী رحمه الله ইজমা উল্লেখ করেছেন। তিনি رحمه الله ‘আল-আনসাব’ গ্রন্থে বলেন, “ইমামিয়্যাদেরকে তাকফীর করার ব্যাপারে উম্মাহ একমত হয়েছে। কেননা ‘সাহাবীগণ পথভ্রষ্ট হয়েছেন’ তারা এই আক্বীদাহ পোষণ করে, তারা সাহাবীগণের ইজমাকে অস্বীকার করে এবং তারা সাহাবীগণকে এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে যার যোগ্য তারা নয়।”

মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ যখন খোরাসানে মুশরিক রাফিদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন তখন তালেবান এই মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উজবেক মুজাহিদ গ্রুপ দাওলাতুল ইসলামকে বাইআত দেওয়ার পূর্বে আফগানিস্তান থেকে কিছু মুশরিক রাফিদীদের বন্দি করে নিয়ে যায়। মুজাহিদদের উদ্দেশ্য ছিল এই রাফিদীদের বিনিময়ে আফগান সরকারের কাছ থেকে কিছু মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করা। আফগান সরকার প্রায় ৯ মাস যাবৎ অভিযান চালিয়ে মুজাহিদদের কাছ থেকে সেই বন্দিদের মুক্ত করতে পারছিল না। তখন তালেবান নিজ উদ্যোগে রাফিদীদের সাথে মিলে উজবেক মুজাহিদদের আক্রমণ করে তাদেরকে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের হত্যা করে সেই মুশরিক রাফিদীদের মুক্ত করে। তালেবান এই কাজ করার পর নিজেদের ওয়েবসাইটে গর্বভরে প্রকাশ করে যে, আফগান সরকার যা ৯ মাস ধরে করতে পারেনি তালেবান তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করেছে। আমরা জানি যে, রাফিদীরা হচ্ছে মুরতাদ মুশরিক সম্প্রদায়। কেউ কেউ মনে করে তালেবান হানাফী মাজহাবের অনুসরণ করে বিধায় তারা রাফিদীদের সাথে এমন আচরণ করে। আমরা পূর্বে রাফিদীদেরকে তাকফীরের ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করেছি যা ইমাম সামআনী বলেছেন। আর হানাফী মাজহাবের প্রসিদ্ধ মহান দুই ইমাম আবু হানীফা এবং আবু ইউসুফ رحمهما الله –তাদের

বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। যখন ইমাম আবু হানীফার নিকট শীয়াদের কথা আলোচনা করা হত তখন তিনি সর্বদাই এ উক্তি পুনরাবৃত্তি করতেন, "যে ব্যক্তি এদের কুফরির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে সে তাদের মতই একজন কাফির।"[85] কাযী আবু ইউসুফ رحمه الله বলেন, "আমি কোন জাহমিয়্যাহ'র পিছনে, কোন রাফিদীর পিছনে এবং কোন কাদেরিয়্যাহ'র পিছনে সালাত পরি না।"[86]

সুতরাং আহলুস সুন্নাহ'র সকল আলেমগণ একমত যে, রাফিদীরা কাফির মুশরিক। তাহলে তালেবান কিভাবে এই মুশরিকদের পক্ষে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে! এটা কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা নয়? যারা উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা رضي الله عنها কে গালি দেয় এবং জাহান্নামী আখ্যায়িত করে তালেবান তাদের পক্ষে গিয়ে কিভাবে মুসলিমদের হত্যা করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিদীদের সাহায্য করে এবং এই রাফিদীদের পক্ষে মুসলিম মুওয়াহহিদদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে?! তালেবানের এ কাজ কি মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিক রাফিদীদের সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত নয়? আমরা আল্লাহর নিকট এ কুফর থেকে আশ্রয় চাই।

খোরাসানে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ যখন আফগানিস্তান-ইরান সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন তখন ইরান তালেবানের সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে একটি চুক্তি করে। সেই চুক্তির সারমর্ম ছিল এরূপঃ তালেবান দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের থেকে আফগানিস্তানের সাথে ইরানের লাগোয়া সীমান্ত নিরাপদ রাখবে আর ইরান এক্ষেত্রে তালেবানকে যুদ্ধাস্ত্র দিবে। এটা কি কল্পনা করা যায় যে, ইরানের মত এক নিকৃষ্টতম মুরতাদ রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার জন্য তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর এর বিনিময় হিসেবে তালেবান কিছু যুদ্ধাস্ত্র পাবে? ইরানের মাজুসীরা যে মুশরিক এব্যাপারে কোন মুসলিম কি সন্দিহান থাকতে পারে? আল্লাহর কসম! তালেবান এভাবেই রিদ্দায়

85 আল-কিফায়াহ

86 লালাকাঈ 'উসুলু ই'তিক্বাদী আহলিস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'তে বর্ণনা করেছেন।

পতিত হয়েছে। তারা মুশরিকদের পক্ষ নিয়ে মুসলিমদের হত্যা করছে।

দ্বিতীয়তঃ আমরা সকলেই জানি যে, তালেবান আমেরিকার সাথে কিছু শর্তের আলোকে চুক্তি করে আফগানিস্তানের ক্ষমতা পেয়েছে। সেই শর্তগুলোর অন্যতম একটি শর্ত ছিল, আফগানিস্তানের ভূমি ব্যবহার করে আমেরিকার ও তার মিত্রদের ক্ষতি করবে–তালেবান এমন কাউকে এব্যাপারে অনুমতি দিবে না এবং তালেবান আফগানিস্তান থেকে দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের নিশ্চিহ্ন করবে। এই শর্তের উপর তালেবান কাজ করবে আর আমেরিকা আফগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে। বিষয়টি কি এমন নয় যে, যেই আফগানের ভূমি ব্যবহার করে শাইখ উসামা আমেরিকাকে আঘাত করেছিলেন আজ তালেবান সেই আফগানের ভূমি ব্যবহার করে কাউকে আমেরিকার উপর আঘাত হানতে দিবে না? পাশাপাশি যারা শাইখ উসামার মত আফগানের ভূমি ব্যবহার করে ইসলামের অন্যতম শত্রু আমেরিকা ও তার মিত্রদের ক্ষতি করবে তালেবান তাদেরকেই দমন করবে। আমরা জানি যে, আল-কায়দা শাইখ উসামা ﵀ -এর মৃত্যুর কয়েকবছর পরই খোরাসান শাখা বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে। সুতরাং খোরাসানে আল-কায়দার নামে কোন কাজ হবে না। তালেবান সেই চুক্তিতে স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, তারা আল-কায়দাকে আফগানের ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না। এখন বাকি থেকে যায় দাওলাতুল ইসলাম। তালেবান এটাও স্পষ্ট করেছে যে, তারা দাওলাতুল ইসলামকেও আফগান ভূমি ব্যবহার করতে দিবে না–এটা কখন করেছে যখন তালেবানের হাতে পুরো আফগানের ভূমির কর্তৃত্ব নেই। তালেবান দাওলাতুল ইসলামের ব্যাপারে বাড়তি আরো একটি কয়েদ যুক্ত করেছে– তা হল, তালেবান আফগানিস্তান থেকে দাওলাতুল ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করবে। একটু লক্ষ্য করুন! কাদের সাথে এই চুক্তি করেছে? তালেবান এই চুক্তি করেছে হারবী কাফিরদের সাথে–যারা আজ অব্দি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের কারাগারগুলোতে মুসলিমদেরকে বন্দি করছে, ফিলিস্তিনের মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সমর্থন দিচ্ছে এবং মুসলিমদের দেশগুলোতে তাগুত শাসকদের শেল্টার দিচ্ছে। চুক্তির অন্যতম শর্ত কী ছিল? চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল, যেসকল মুসলিমরা আল্লাহর যমীনে পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন

করতে চায় এবং পূর্বে উল্লেখিত সিফাতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হারবী কাফির আমেরিকার ক্ষতি করতে চায় তালেবান তাদেরকে দমন করবে। তালেবান সেই শর্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি, তালেবান যখন কাবুলের ক্ষমতা দখলে নিয়েছে তখন তালেবান কাবুলের কারাগার থেকে সকল বন্দিদের ছেড়ে দিয়েছিলো কেবলমাত্র দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের ব্যতীত। তালেবান যেদিন ক্ষমতা দখল করেছে এরপরের দিন দাওলাতুল ইসলামের একজন দায়িত্বশীলকে সবার সামনে হত্যা করেছে। সেই দায়িত্বশীলকে তো তালেবান বন্দি করেনি! তাহলে কী কারণে তালেবান তাকে হত্যা করেছে? কারণ তিনি ছিলেন দাওলাতুল ইসলামের একজন সৈনিক। আফসোস! তালেবানের কাছে রিদ্দায় পতিত আফগান সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং আমেরিকার সহযোগীরা ক্ষমা পেয়ে যায় কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা তালেবানের কাছে ক্ষমা পায়নি। হামিদ কারযাওয়ীর মত তাগুত, ইসলাম বিদ্বেষী ও শারীয়াহ বিরোধী আইন প্রণেতা নিরাপত্তা ও ক্ষমা পেয়ে যায় কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের একজন সৈনিকও ক্ষমা পায় না! এর মূল কারণ হচ্ছে তালেবান দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকদের ছেড়ে দিলে আমেরিকা নাখোশ হবে। আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তির অন্যতম শর্তই ছিল তালেবান আফগানিস্তানে দাওলাতুল ইসলামকে দমন করবে। আমরা আমেরিকার সাথে তালেবানের চুক্তির এই শর্তের বিষয়টি কোথা থেকে জানতে পেরেছি? আমেরিকার মিডিয়া থেকে? কখনোই না। আমরা এগুলো তালেবানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শের আব্বাস স্টানিকজাই, ড. নঈম, আব্দুস সালাম যাইফী, সুহাইল শাহীন, জবিহুল্লাহ মুজাহিদ, আমীর খান মুত্তাকী—এদের মুখ থেকেই জানতে পেরেছি। সুতরাং তালেবানের এ কাজ কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার সাথে সুস্পষ্ট ওয়ালা নয়? শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেয়া এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “এমনকি কথার মাধ্যমে যে তাদের (ইহুদী-খ্রিষ্টানদের) সাহায্য করবে সে রিদ্দায় পতিত হবে যা রিদ্দায়ে জামিহার অন্তর্ভুক্ত—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। এ কাজ কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হল আল্লাহ سبحانه وتعالى -এর বিধান যার সুস্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ তা’আলার কিতাবে রয়েছে। আর এটা স্পষ্ট বিধানের একটি। প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনি আমর বলেন বা যায়েদ বলেন তাতে আমাদের কিছু যায়

আসে না। আপনি হক্ব চিনতে পারলে হক্বপন্থিদের চিনতে পারবেন। ব্যক্তি দ্বারা হক্বকে চিনবেন না। এটা হল আল্লাহ ﷻ-এর কিতাব যা আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত। যদি এর কোন বিষয়কে পরিবর্তন করার জন্য পুরো দুনিয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলেও তা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না এবং আমাদের প্রত্যয়ের কোন অংশই পরিবর্তন হবে না। হয় তা হক্ব হবে অথবা বাতিল হবে। হয় ইসলাম হবে নতুবা কুফর হবে।”

শাইখ উসামা رحمه الله বলেছেন, একটি কথার মাধ্যমেও যদি কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে তাহলে সেটা রিদ্দায়ে জামিহা হবে। তালেবান কিভাবে “মুসলিমদের হত্যা করবে” এই শর্ত রেখে আমেরিকার সাথে চুক্তি করতে পারে? কিভাবেই বা তালেবান মুসলিমদের বিরুদ্ধে রাফিদীদের সাহায্য করছে? সকল আহলুস সুন্নাহ’র মতে তো বারো ইমামে বিশ্বাসী রাফিদীরা কাফির মুশরিক। আর কিভাবেই বা তালেবান মাজুসী ইরানের সীমান্ত রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিমদের হত্যা করে? আল্লাহর নিকট আমরা এর থেকে আশ্রয় চাই।

তালেবানের একজন উল্লেখযোগ্য আলেম শাইখ উস্তাদ ইয়াসির যিনি ২০০৯ সাল থেকে পাকিস্তান কারাগারে বন্দি রয়েছেন, তিনি বলেন, “(কুফফারদের ক্ষেত্রে) ইসলামের স্বতন্ত্র বিধান রয়েছে। হারবী কাফির হল তারা, যারা যেকোনোভাবে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। হারবী কাফির কারা? এমন কাফির যারা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তারা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হারবী কাফির হিসেবে বিবেচিত। তখন পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে বসবাসরত মুসলিমের জন্য তাদের (হারবী কাফিরদের) সাথে মৈত্রী করার, তাদের সাথে চুক্তি করার, তাদেরকে সাহায্য করার, তাদেরকে অভিবাদন (সালাম) জানানোর, তাদের সাথে ব্যবসা করার, তাদের থেকে ক্রয়বিক্রয় করার অধিকার নেই। কেননা এইরকম কাফিররা হল যুদ্ধরত শত্রু, তাই তাদের সাথে শত্রুর মতই আচরণ করা হবে। যেমন- তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যায় হত্যা করা হবে, তাদের রক্ত মুসলিমদের নিকট হালাল, তাদের সম্পদকে যুদ্ধের গনিমত হিসেবে নেওয়া হবে এবং তাদের পরিবারকে দাসদাসী হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এগুলো (হারবী কাফিরদের ক্ষেত্রে) ইসলামের ফিক্বহী বিধান। তাই এই ধরনের কাফিরদের প্রতি নম্রতা দেখানো

ইসলামে হারাম। অন্যথায় এটা হবে মুসলিমদের জন্য আত্মসমর্পণ এবং পরাজয় মেনে নেওয়ার নামান্তর।” আর মোল্লা দাদুল্লাহ رحمه الله তো বলেছেন, যে আমেরিকা ও আফগান সরকারের সাথে চুক্তি করার কথা বলবে তাদের সাথে সাথে তার মাথাও কেটে ফেলা হবে।

আমরা দেখেছি, তালেবান যখন এই কুফরি শর্ত রেখে আমেরিকার সাথে চুক্তি সম্পন্ন করেছে তখন আল-কায়দার মত সংগঠন এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা এই চুক্তিকে মুশরিকদের সাথে রাসুল ﷺ -এর হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিকে তুলনা করে। অথচ আমরা জানি যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি যে শর্তের আলোকে হয়েছিল সেগুলো কেবলমাত্র আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর জন্য খাছ ছিল। আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর পরে এই ধরনের চুক্তি আর কারো জন্য করা জায়েয নেই। এটা কি শুধুই আমাদের বক্তব্য? না, বরং এটা সালাফগণের বক্তব্য।

ইবনে হাযম رحمه الله আবু জান্দালের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, “নাবী ﷺ ঐ সময়ে মুসলিমদের মধ্য থেকে কাউকে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দেননি তবে আল্লাহ عز وجل তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে ফিতনায় পতিত হবে না এবং তারা নিশ্চিতভাবেই মুক্তি পাবে।” অতঃপর তিনি নাবী ﷺ -এর উক্তি উল্লেখ করেন, “আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের নিকট চলে যাবে আল্লাহ তাকে দূরে রাখবেন। আর তাদের মধ্য থেকে আমাদের নিকট যে আসবে আল্লাহ অচিরেই তার জন্য একটি উপায় ও সুযোগ তৈরি করে দিবেন।” ইবনে হাযম বলেন, “আল্লাহ عز وجل নাবী ﷺ -এর গুণ বর্ণনা করে বলেন,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা কেবলই ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।” আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নাবী ﷺ -এর ঐ সংবাদ দেওয়া কুরাইশ কাফিরদের থেকে যে আসবে আল্লাহ তার জন্য অচিরেই একটি পথ ও উপায় তৈরি করে দিবেন—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ওহী। তাই

সন্দেহাতীতভাবেই দুনিয়া ও আখিরাতের অপছন্দনীয় বিষয় থেকে ঐ ব্যক্তির জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, যে তাদের মধ্য থেকে নাবীর নিকট আসবে। এমনকি কাফিরদের কবল থেকে তার মুক্তি হবে। একজন দূরদর্শী মুসলিম সন্দিহান হবে না। আর এটা এমন এক বিষয় যা নাবী ﷺ ব্যতীত মানুষের মধ্য থেকে কেউ জানবে না।” অতঃপর তিনি - অর্থাৎ ইবনে হাযম বলেন, “কোন মুসলিমের জন্য এই শর্তে শর্তযুক্ত করা বৈধ নয় এবং এই শর্ত পূরণ করাও বৈধ নয়। কারণ তার নিকট কোন ইলমুল গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তার রাসুলের প্রতি ওহী করেছিলেন।”[87] তার উক্তি শেষ।

এমনিভাবে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী رحمه الله বলেন, “যে ব্যক্তি মুসলিম হবে তাকে তাদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে–এই চুক্তি করা নাবী ﷺ -এর পরে কারো জন্য জায়েয নেই। আল্লাহ এটাকে তার জন্য জায়েয করেছিলেন কারণ তিনি এব্যাপারে হিকমাহ জানতেন এবং মাসলাহার কারণে ফায়সালা করেছেন।”[88]

কিভাবে আল-কায়দা এই ধরনের চুক্তিকে হুদাইবিয়ার সাথে তুলনা দিতে পারে? যেখানে চুক্তির অন্যতম শর্তই ছিল মুসলিম মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

এখন কেউ কেউ দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বলে থাকে যে, দাওলাতুল ইসলাম আসলী কাফিরদের সাথেও চুক্তি করার বিরোধী, অথচ ইসলামে তো আসলী কাফিরদের সাথে চুক্তির কথা বলা আছে। আর আমেরিকা হচ্ছে আসলী কাফির। সুতরাং এখানে সমস্যা কোথায়?

দাওলাতুল ইসলাম প্রথমত কুরআন ও সুন্নাহ’র বক্তব্যকে অনুসরণ করে। এরপর কুরআন এবং সুন্নাহ’র বুঝ থেকে নেওয়া সালাফগণের বক্তব্যকে অনুসরণ করে। আর এই শতাব্দীর জিহাদের ময়দানে আমাদের সালাফ হচ্ছে শাইখ উসামা,

---

87 আল-ইহকাম ফী-উছুলিল আহকামঃ ৫/২৬

88 আহকামুল কুরআন লি ইবনে আরাবীঃ ৪/২৩১

আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী, আনওয়ার আল-আওলাক্বী, আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী এবং মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের মত তারকা সদৃশ ব্যক্তিরা। আল-কায়দার প্রথম সারির অন্যতম একজন হলেন মোস্তফা আবুল ইয়াযীদ ﷺ - মোস্তফা আবুল ইয়াযীদ ﷺ কে সেই একই প্রশ্ন করা হয়েছিলো। সাংবাদিক শাইখকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি মনে করেন, আমেরিকার সাথে আল-কায়দার আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া সম্ভব?" শাইখ বললেন, "কেন সম্ভব হবে না। আমেরিকা যখন আমাদের শর্তগুলো মেনে নিবে। আর সেগুলো হলঃ

- তারা মুসলিমদের দেশগুলো থেকে বের হয়ে যাবে।
- তারা ফিলিস্তিনে দখলদার ঘোরাওকারী ইহুদীদেরকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে।
- তারা মুসলিমদের দেশগুলোতে অবস্থানরত মুরতাদ সরকারদেরকে সমর্থন করা বন্ধ করবে।
- তাদের কারাগারগুলো থেকে বন্দিদের মুক্তি দিবে।

যখন তারা এ শর্তগুলো মেনে নিবে তখন আমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ হবে। কিন্তু এটা স্থায়ী সময়ের জন্য হবে না। অর্থাৎ সন্ধি হবে যেমন ধরুন দশ বছরের জন্য। আর আমরা তখন থেকে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে চিরকালের জন্য আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে - আর আমরা দাওলাতুল ইসলাম, দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে যাচ্ছি ইনশা'আল্লাহ। অতঃপর আমরা তাদেরকে নতুন করে আবার ইসলামের দিকে আহ্বান করব। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তখন আমরা তাদেরকে ইসলামের হুকুম জিযয়া প্রদানে বাধ্য করব। আর ইসলামের এই পদ্ধতিতেই আমেরিকানদের সাথে এবং অন্যদের সাথে সন্ধি হবে। আমরা মনে করি না যে, তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করবে। আর উম্মাতে ইসলামের উপর আবশ্যক হচ্ছে তারা এই পথকেই গ্রহণ করবে– তা হচ্ছে শক্তি অর্জন করা এবং আল্লাহ ﷻ -এর পথে জিহাদ

করা।”[89] এটাই ছিল আল-কায়দা। আর এরাই ছিল আল-কায়দার প্রথম প্রজন্ম এবং নক্ষত্ররাজি। দাওলাতুল ইসলাম এদের মত নক্ষত্ররাজিদেরকেই অনুসরণ করে। কিন্তু আফসোস! আজকের আল-কায়দা কোথায় গেল! আমেরিকা কি মুসলিমদের দেশগুলোতে হামলা চালানো বন্ধ করেছে? আজো আমেরিকা ইরাক, শাম, ইয়েমেন, সোমালিয়াতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আমেরিকা কি ফিলিস্তিনের দখলদার ইহুদীদের সমর্থন দেওয়া বন্ধ করেছে? নাকি এখনো আমেরিকা ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দিয়েই যাচ্ছে। মুসলিমদের দেশগুলোতে অবস্থানরত মুরতাদ শাসকদের সমর্থন দেওয়া কি আমেরিকা বন্ধ করেছে? নাকি সবমসময় তাদের সমর্থন করেই যাচ্ছে! তাহলে কিসের ভিত্তিতে তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি করল? আর কোন শারয়ী নীতির আলোকে আল-কায়দা এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন বলল?!

আমরা দেখেছি, তালেবান আমেরিকার সাথে চুক্তি করার পরপরই আল-কায়দার সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে যেখানে তারা তালেবানের এই চুক্তিকে ফাতহে মুবীন হিসেবে উল্লেখ করেছে। তাহলে শাইখ উসামা এবং মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের আল-কায়দা আর যাওয়াহিরী এবং সাইফ আল-আদেলের আল-কায়দার মাঝে তো বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়! আমরা শাইখ উসামার এবং মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের আল-কায়দাকেই অনুসরণ করি। তাইতো আমরাও বলি, আমেরিকা যতদিন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দিবে, যতদিন আমেরিকা মুসলিমদের কোন একটি ভূখণ্ডে হামলা চলমান রাখবে এবং মুসলিমদের দেশগুলোতে তাগুত মুরতাদ সরকারদের সমর্থন দিতে থাকবে ততদিন আমরা আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করেই যাবো এবং তাদের সাথে কোন চুক্তি হবে না। আর যেদিন আমেরিকা ফিলিস্তিনে ইহুদীদের পক্ষে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে, মুসলিমদের উপর হামলা বন্ধ করবে এবং মুরতাদ সরকারদেরকে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করবে সেদিনই আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করব এবং সন্ধি চুক্তি নিয়ে আলোচনা করব। কারণ এটাই ইসলামের নির্দেশনা। আল-কায়দার কর্মপন্থাও

[89] আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া শাইখ মোস্তফা আবুল ইয়াযীদের সাক্ষাৎকার

এমনই ছিল। কিন্তু ডাক্তার যাওয়াহিরী শাইখ উসামার আল-কায়দাকে কোথায় নিয়ে গেল!

সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম আসলী কাফিরদের সাথে সন্ধি চুক্তি তখনই করবে যখন সেটা সকল শারয়ী শর্ত পালন করবে। কিন্তু আল-কায়দার উমারা তালেবানের মত শারীয়াহ বহির্ভূত পদ্ধতিতে কুফরি শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি চুক্তির পক্ষে নয়। আল্লাহর নিকট এ থেকে আমরা আশ্রয় চাই।

◆ বড় ফিতনা গ্রাস করেছে তালেবানকে।

আলা-ওয়ালা ওয়াল-বারা তথা আল্লাহর জন্য সম্পর্ক করা এবং আল্লাহর জন্য সম্পর্কচ্ছেদ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব হবে মু'মিন মুসলিমদের সাথে। আর সম্পর্কচ্ছেদ ও শত্রুতা হবে কাফিরদের সাথে। আমরা দেখেছি, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পূর্ব থেকে একটি ঘোষণা দিয়ে আসছে যে, তালেবান আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। একে তো হচ্ছে সুসম্পর্ক এর উপর আবার ‘পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে’। আফগানিস্তানের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, ভারত, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ আরো কিছু দেশ। আমরা আরো দেখি, তালেবান ক্ষমতা দখলের পর মিডিয়াতে তালেবানের নেতারা চীন, রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকাসহ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিয়ে আসছে। আর তালেবান নেতারা বলছে, এটা তাদের রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তালেবান বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মত এই বিষয়টা তাদের রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত করেছে যে, তারা সকল রাষ্ট্রের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে মিডিয়াতে তালেবানের কোন নেতাকে যেকোনো রাষ্ট্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেই তারা নির্দ্বিধায় বলছে, অমুক রাষ্ট্র আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। যেমনটি বলেছে, ভারত, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে পূর্বে যে রাষ্ট্রগুলোর কথা বলা হয়েছে তারা সবাই হারবী কাফির। প্রতিটি রাষ্ট্রই মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীনের বর্বর ইতিহাস কে না জানে?! চীন তো এখনো উইঘুর মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালাচ্ছে। কিভাবে তালেবান চীনের সাথে এতো গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে? আমরা জানি যে, হারবী আসলী কাফির রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে চীনের সাথে তালেবানের সবচেয়ে বেশি ভালো সম্পর্ক রয়েছে। অথচ তালেবানের উচিৎ ছিল চীনের সাথে সর্বপ্রথম উইঘুর মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করা। আমরা আব্বাসী খিলাফাহ’র সময়ের কথা জানি যে, তারা যখন রোমের সাথে কোন চুক্তি করতেন তখন তারা কনস্টান্টিনোপলে অবস্থানরত মুসলিমদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে রাখতেন। আজ তালেবান চীনের সাথে বহুবিধ চুক্তি করছে কিন্তু নির্যাতিত নিপীড়িত উইঘুর মুসলিমদের নিরাপত্তা নিয়ে কোন আলোচনাই তালেবান করছে না। বরং এই কাপুরুষ তালেবান উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবে না—সেই বিষয়টি চীনকে জানিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও ভারত এবং রাশিয়ার ক্ষেত্রে তালেবান একই কর্মপন্থা ব্যবহার করছে। এখানে সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হচ্ছে এই সকল হারবী আসলী কাফির রাষ্ট্রের সাথে তালেবানের পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেয়া। আমেরিকা আফগানিস্তান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে যদি মুসলিমদের দেশগুলোর কোন মুরতাদ সরকার আমেরিকার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিত আমরা দেখেছি তখন আল-কায়দার শাইখরা এটাকে “মু’মিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করা” হিসেবে আখ্যায়িত করত। কিন্তু আজ তালেবান যখন মুসলিমদের নির্যাতনকারী হত্যাকারী চীন, রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও আমেরিকার সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দিয়ে তা বাস্তবায়ন করছে তখন বর্তমান আল-কায়দার শাইখরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। বরং তাদের কেউ কেউ এটাকে জায়েয করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমেরিকাই কি কেবল মুসলিমদের নির্যাতনকারী ও হত্যাকারী এবং হারবী কাফির? চীন, রাশিয়া ও ভারত কি মুসলিমদের নির্যাতনকারী, হত্যাকারী এবং হারবী কাফির নয়? নাকি হারবী কাফির

হওয়া না হওয়া তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর নির্ভর করে?

এই তো কয়েকবছর পূর্বেও ভারতীয় উপমহাদেশের আল-কায়দার সাবেক মুখপাত্র এবং বর্তমান আমীর উসামা মাহমুদ পাকিস্তানে চীনের বাণিজ্যিক বিনিয়োগের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ‘চীন বন্ধু নয়!’ শিরোনামে বই লিখেছেন। সেই বইটিতে তিনি বলেছেন পূর্ব তুর্কিস্তান তথা উইঘুর মুসলিমদের নির্যাতনকারী চীনের সাথে এই বাণিজ্যিক সম্পর্ক চীনের একটি আগ্রাসন এবং উইঘুর মুসলিমদের বাদ দিয়ে চীনের কমিউনিস্টদের সাথে বন্ধুত্ব করার নামান্তর। উসামা মাহমুদ বলেছেন, “চীনারা ভালো ভাবে জানে যে ইসলাম তাদের সংস্কৃতিকে কখনো মেনে নেবে না। তাদের নিকৃষ্ট সংস্কৃতি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের ঠিকই জানা আছে যে, একটি হলো আগুন এবং আরেকটি হলো পানির মতো।

এ দুইয়ের মাঝে সামান্য একটি বিষয়েও সামঞ্জস্যতা নেই। এই কারণেই এখন তাদের লক্ষ্য শুধু ব্যবসা নয়। এখানে তাদের সৈন্যদের অবস্থান করানো, চীনা ভাষা শিখানো, চীনা রীতিনীতির প্রচলন করা, চীনা মুভির ডাবিং করা, চীনা স্কুল-কলেজের আধিক্যতা অর্জন করা, সেবার নামে চীনা মেয়েদের চাকুরীর সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি।

মোটকথা, দেশ ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য তারা সর্বদিক দিয়ে আগ্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করছে। কোন দিকই বাদ রাখছে না। **এসকল পরিমণ্ডলে চীনাদের অনুপ্রবেশকে কেউ যদি শুধু ব্যবসা ও অর্থনীতির চোখে দেখে, তাহলে তার চক্ষু ডাক্তার দেখানো ছাড়া উপায় নেই।**

আমরা মানি বা না মানি এটা অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধে চীনাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। যেভাবে ইংরেজরা ব্যবসার (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) রূপ ধারণ করে প্রথমে দেশের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। অতঃপর দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, নিয়ম-কানুন সবকিছুই নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছ। অবশেষে তারা পুরো দেশকে নিজেদের হাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজেদের জন্য এক নতুন প্রজন্মের রূপ দিয়েছে। ঠিক একইরকম ভাবে ব্যবসা ও অর্থনীতির সাহায্য সহযোগিতার নাম

দিয়ে নতুন এক ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এখন পাক-চীন চুক্তির মাধ্যমে উন্নতি ও অগ্রগতির কোন বালাই নেই, বরং এতে উন্নতি ও অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হচ্ছে। এবং এই মহাসড়ক দিয়েই চীনা নাস্তিকতা ও নিকৃষ্ট চীনা-সংস্কৃতি চলে আসছে।

দ্বীনের ধারক-বাহকদের নেতৃত্বদানকারী সম্মানিত ওলামা মাশায়েখগণ! অবস্থা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। নিজেদের উপর অর্পিত ফরজ বিষয়গুলো অনুধাবন করুন। এটা আমাদের জাতি, ধর্ম ও সভ্যতার উপর আক্রমণ। শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে, যুদ্ধ হয় ঢাল তরবারির দ্বারা, আর তারা করছে অর্থ ও মিডিয়া দ্বারা। দেখুন এই যুদ্ধ বোঝা ও বুঝানো কোনটাই কঠিন কোন ব্যাপার নয়। **তাদের এক হাতে যেমন আছে পাকিস্তানিদের জন্য সাহায্য সহযোগিতার পতাকা তেমনি অন্য হাতে আছে বিষ-মিশ্রিত ধারালো খঞ্জর। যা তারা তুর্কীস্তানী মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।** সুতরাং আমাদের নীরবতা ভাঙ্গতে হবে। যদি আমরা নীরব থাকি তাহলে –আল্লাহ মাফ করেন– আল্লাহ তা’আলা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ইতিহাসও আমাদেরকে কখনো ছাড় দিবে না।

আর এটাও স্মরণ রাখা চাই যে মুসলমানদের জন্য ঐ সম্পদ কখনো কল্যাণ বয়ে আনবে না যার ভিত্তি হলো - আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আপনজনদের রক্ত। জেনারেলরা তাদের সৈন্য দেখিয়ে যতই আপনাকে ধোঁকা দিক না কেন, বাস্তবতা এটাই যে, চীনা অর্থনীতির এই কুমির আমাদের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে। তারা আমাদের সাহায্য করা তো বহু দূরের কথা, আজ তাদের কারণেই আমাদের অর্থনীতি এবং আগামী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্যবসায়ীরা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর মিল ফ্যাক্টরিগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চীন যদি আমাদের অর্থনীতিকে সহায়তা করে থাকে, তাহলে সেই সহায়তা এই যে, তারা আমাদের অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছ।”[90] তিনি একই বইয়ের ১৩ পৃষ্ঠার শেষের দিকে এসে বলেছেন, “আমেরিকা ও চীন উভয়েই মুসলিমদের হত্যাকারী ও

[90] চীন বন্ধু নয়! প্রকাশনায়ঃ আল-হিকমা মিডিয়া- পৃষ্ঠাঃ ১২

চরম শত্রু। এই শয়তানদের মোকাবেলায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং আল্লাহর রুজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহর শপথ! তুর্কী মুসলিমদের সাহায্যার্থে আপনি যদি শুধু আওয়াজটুকুও উঁচু করেন, তাহলেই তুর্কীতে বসবাসরত আমার মা-বোনদের কলিজা ঠাণ্ডা হবে। তাদের আবরুর হেফাজত হবে ইনশাআল্লাহ।

তারা নিজেরা নিজেদেরকে শত দুঃখ বেদনার মাঝেও মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ মনে করবে। আপনি যদি চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করেন, তাহলে শুধু তুর্কী মুসলিমদেরই উপকার হবে না! বরং এটা পাকিস্তানি মুসলিমদের ধর্ম, স্বাধীনতা ও অর্থনীতিরও হেফাজত হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের কাছে শুধু এটাই নিবেদন যে, আপনারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করুন এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করুন। এটা ঈমানের অন্যতম একটি ভিত্তি। এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন কু-ধারণা পোষণ করবেন না। আল্লাহর শপথ তিনি তার বান্দাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তিনি শক্তিশালী এবং শাস্তিদাতা। সুতরাং ঐ মহা-মহীয়ান আল্লাহর আদেশ মেনে চলুন। চীনাদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ মুসলিমদের দুঃখ কষ্টের ঘটনাগুলো এবং তাদের দ্বীনের জন্য কুরবানির বৃত্তান্তগুলো মানুষের সামনে বর্ণনা করুন। লোকদেরকে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলন। কেননা মনে রাখবেন, শত্রুকে শত্রু হিসেবে জানা-ই হলো যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ। অন্তত প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করুন। নিজের জাতি ও আগামী প্রজন্মকে এই রণাঙ্গনের জন্য প্রস্তুত করে তুলন।"

আচ্ছা বলুন তো, কী পরিবর্তন হয়েছে? চীন কি উইঘুর মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা বন্ধ করেছে? চীন কি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন বন্ধ করেছে? চীন পাকিস্তানে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করার কারণে যদি সেটা চীনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে আজ আফগানিস্তানে বাণিজ্যিক বিনিয়োগ করার কারণে কি সেটা বন্ধুত্ব হয় না?! নাকি আল-কায়দার নিকট বিষয়টি এমন যে, তালেবান যা-ই করুক না কেন, তালেবানের জন্য সবকিছুই শারীয়াহ'তে বৈধ।

সুতরাং তালেবানের পক্ষ থেকে চীন, রাশিয়া, ভারতসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পারিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সুসম্পর্ক তৈরি করা এবং পাশাপাশি আমেরিকা ও ফ্রান্সের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ার ঘোষণা দেওয়া স্পষ্ট তাওয়াল্লী তথা বন্ধুরূপে গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত যা সুস্পষ্ট কুফর। আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ؔ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

“হে মু’মিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে নিশ্চয়ই সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করেন না।”[91] আল্লাহ তা’আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّیْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِیْ سَبِيْلِیْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِیْ ٭ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ٭ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَاۤ اَخْفَيْتُمْ وَ مَاۤ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَ مَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝

“হে মু’মিনগণ!! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসুলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছো। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে সে তো সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।”[92] সা’দী রহিমাহুল্লাহ বলেন, “তোমরা

[91] সুরা মায়িদাহঃ ৫১

[92] সুরা মুমতাহিনাঃ ০১

আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও” অর্থাৎঃ তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে আত্মনিয়োগ করছো। তাই যখন বন্ধুত্ব অর্জন হয় তখন এর সাথে যুক্ত হয় সাহায্য এবং সম্পর্ক। ফলে বান্দা ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ও ঈমানদারদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।”[93]

বর্তমানে তালেবানের গায়রত নেই বললেই চলে! আমরা সকলেই জানি যে, আমেরিকা যখন ২০০১ সালে আফগানিস্তানে হামলা করেছিল তখন আমেরিকাকে মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে মুরতাদ পাকিস্তান সরকার। আমরা দেখেছি, মুজাহিদদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মুসলিমা বোন আফিয়া সিদ্দীকার মত কতশত নারী-পুরুষকে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে পাকিস্তান সরকার। মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশেষত এই তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাহায্য করার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। পাশাপাশি তালেবানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তুরস্ক ও কাতারের ভূমিকাও কম ছিল না। যাদের শারীয়াহ সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান আছে তাদের সকলের কাছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার হুকুম স্পষ্ট। হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলীসহ সকল ফিক্বহী মাজহাবের আলেমগণ একমত যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা সুস্পষ্ট কুফর এবং রিদ্দাহ। তালেবানের কাছে কি এটা অস্পষ্ট? কখনোই না। তাদের কাছেও এটা স্পষ্ট। পাকিস্তানের মত একটি রাষ্ট্র যে তার সেনাবাহিনী দিয়ে বহু মুসলিমদের হত্যা করিয়েছে, অনেক সংখ্যক মুসলিম নারী-পুরুষদের বন্দি করেছে ও আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছে এবং পাকিস্তান সরকারের আদেশে যে সেনাবাহিনী স্বয়ং তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিভাবে তালেবান আজ সেই পাকিস্তান সরকারের সাথে এতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে বিশেষত কিভাবেই বা তালেবান পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর এতো অপরাধ হজম করে তাদেরকে আপন করে নিয়েছে? আমেরিকা কি তুরস্ককে নিয়ে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি? তুরস্ক তো কিছু দিন

[93] তাফসীরে সা’দী

আগেও তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এখন কিভাবে তালেবান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানকে মুসলিম মহান নেতা ও আলেম বলে সম্বোধন করে? তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকাকে নিরঙ্কুশ সাহায্য করেছিল কাতার। আজ আমরা কাতারের সাথে তালেবানের এক অভূতপূর্ব বন্ধুত্বের বিষয়টি স্পষ্টভাবেই দেখছি। যাদের সহযোগিতা নিয়ে আমেরিকা এতো দিন অনেক মুসলিম মুজাহিদদের হত্যা করেছে বিশেষকরে এই তালেবানের অনেক সদস্য, স্ত্রী, সন্তান ও ভাইদের হত্যা করেছে এবং বন্দি করেছে তালেবান কিভাবে আজ তাদের সাথে এতো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করছে। আমরা এখানে শারীয়াহ’র দিকগুলো নিয়ে আলোচনা বাদই দিলাম। কিন্তু একজন মানুষের এতোটুকু গায়রত তো থাকার কথা যে, যার সহযোগিতা নিয়ে শত্রু এতো দিন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল কিভাবে আমি আবার তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছি! যে তালেবানকে নিয়ে একসময় আমরা গর্ব করতাম সেই তালেবান আজ এক গায়রতহীন তালেবানে পরিণত হয়েছে! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে শাইখ উসামার হত্যায় সহযোগিতাকারী পাকিস্তানের সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে যখন তালেবান বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে তখন আল-কায়দা কিভাবে এব্যাপারে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে?! তালেবানের সাথে সাথে কি এখন আল -কায়দাও গায়রতহীন হয়ে গেল???

◆ বড় ফিতনা গ্রাস করেছে তালেবানকে।

আল্লাহ ﷻ মুসলিম এবং কাফিরের মাঝে পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন। মুসলিম হচ্ছে সম্মানিত আর কাফির হচ্ছে লাঞ্ছিত অপদস্থ। ইসলাম এসেছে জাতীয়তাবাদের মূর্তি ধ্বংস করতে। মুসলিমদের যুদ্ধ-জিহাদ কখনোই কোন জাতীয়তার ভিত্তিতে হয় না আর না জাতীয়তাবাদের সীমানা বা প্রাচীরের ভিত্তিতে হয়। যখন নির্দিষ্ট সীমানা বা প্রাচীরের মধ্যে যুদ্ধ-জিহাদ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তখন সেটা আর জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থাকে না। সেটা হয়ে যায় জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ। আমরা জানি যে, তালেবান বেশ কয়েকবছর ধরেই জোরেশোরে প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে যে, তাদের যুদ্ধ কেবলমাত্র আফগানিস্তানের মাঝেই সীমাবদ্ধ। আফগানিস্তানের বাহিরে তাদের কোন পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নেই। তাদের এ বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফল দেখা গিয়েছে

আফগান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর। জবিহুল্লাহ মুজাহিদ থেকে শুরু করে সুহাইল শাহীনসহ তালেবানের বেশ কিছু কর্মকর্তা ঘোষণা দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে যে, যেহেতু আফগান স্বাধীন হয়ে গেছে তাই যুদ্ধ-জিহাদ শেষ। কিছু দিন পূর্বেও সুহাইল শাহীনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল–আফগানের বাহিরে মুসলিমদের সমস্যার ক্ষেত্রে আপনাদের করণীয় কী? সুহাইল শাহীনের উত্তর ছিল এমনঃ আমরা কিছু আইন তৈরি করছি সেই আইনের মাধ্যমে আমরা সকল সমস্যার সমাধান করব। গেল কিছুদিন পূর্বে তালেবানের কেন্দ্রীয় মুফতিদের একজন মাওলানা আব্দুর রউফ বলেছে আফগানিস্তানের বাহিরে জিহাদ করা বৈধ নয়। এছাড়াও তালেবানের ঊর্ধ্বতন ও জৈষ্ঠ্য কর্মকর্তাদের বক্তব্য ও লেখনিগুলোতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর এখন যুদ্ধ-জিহাদ শেষ হয়ে গিয়েছে। একারণে আফগানিস্তানের ভূমিতে থেকে কেউ পৃথিবীর কোন জায়গায় জিহাদ পরিচালনা করবে–তালেবান এটাও নিষিদ্ধ করে। তালেবান যে একটি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে এর বড় প্রমাণ হল আফগানিস্তানে মুসলিম, রাফিদী, হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান–সকলে আফগান জাতীয়তার কারণে অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। এই ধরনের বিবৃতি তালেবানের নেতাদের বক্তব্যে এবং তালেবানের অফিসিয়ালি সাইটের লেখনিতে প্রমাণিত।

আমরা জানি যে, আফগানিস্তানে ইসলাম ছাড়াও আরো কয়েকটি ধর্মের মানুষ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- হিন্দু, শিখ, খ্রিষ্টান ও রিদ্দায় পতিত রাফিদী। আফগানিস্তানে সকল ধর্মের লোকজন সমান। কারণ তারা আফগান নাগরিক। একজন ব্যক্তি আফগান নাগরিক হলেই সে দেশের সকল অধিকার পাবে এবং সে নিরাপত্তা পাবে। একজন মুসলিম যতটুকু অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা পাবে একজন রাফিদী, শিখ, খ্রিষ্টানও ততটুকুই সম্মান ও নিরাপত্তা পাবে। এর কারণ হল সেই রাফিদী, শিখ বা খ্রিষ্টান আফগান জাতীয়তাবাদী সীমানায় ঘেরা আফগানিস্তানের নাগরিক। তাই তো আমরা দেখি, রাফিদীদের নেতাদের সরকারী বিভিন্ন পদে নিয়োগ দিতে। আর তালেবানের এই মূলনীতি কুরআন ও সুন্নাহ’র সরাসরি বিপরীত। আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ﴾

“তবে যে মু’মিন সে কি পাপিষ্ঠের সমান? তারা সমান নয়।”[94]

বর্তমান তালেবান যে, শিরকী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এর সবচেয়ে বড় ও সুস্পষ্ট দলীল হল - তালেবান পূর্বের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক সরকারের ন্যায় খাম্বা পূজায় লিপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে ২১ ফেব্রুয়ারিতে যখন শহীদ (!) মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়, সৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয় র‍্যালি বের করা হয়, তখন বাংলাদেশ সরকারের এ কাজ শিরকী জাতীয়তাবাদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন মুহাক্কীক আলেম-ই প্রশ্ন তোলেনি। আমরা ছোটবেলা থেকে মাসজিদে, ওয়াজ-মাহফিলে, বিভিন্ন ইসলামিক অনুষ্ঠানে ও সাক্ষাৎকারে মুসলিম মুহাক্কীক আলেমদের বয়ানে শুনে আসছি যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শহীদ (!) মিনারে ফুল দেয়া, সৃতিসৌধে ফুল দেয়া এবং জাতীয়তাবাদী বিজয় দিবস পালন করা–একাজগুলো শিরকী কর্মকাণ্ড। এই ধরনের শিরকী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিমদেরকে আলেমরা সর্বদাই আহ্বান করে থাকেন। কিন্তু দুঃখ হয় যখন দেখি তালেবান এই শিরকী জাতীয়তাবাদী বিজয় দিবস পালন করছে। কিভাবে তালেবান আফগান জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করে? আর কিভাবেই বা তালেবানের সর্বোচ্চ নেতারা আফগান স্বাধীনতা দিবসে বিজয়ের সৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়? পাশাপাশি বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে এবং তালেবানের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সকল নেতা ও সৈন্যরা এই জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করে? এগুলো কি শুধু আমাদেরই বক্তব্য? না, তালেবান নিজে তাদের এই সকল শিরকী জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড গর্বভরে প্রকাশ করে। ১৯১৯ সালের ১৯ আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। ব্রিটিশদের থেকে আফগান স্বাধীন করে শাহ আমানউল্লাহ’র মত মুরতাদরা শিরকী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে। তালেবান এবার ক্ষমতায় এসে প্রতি বছর এই শিরকী জাতীয়তাবাদী দিবস সরকারীভাবে পালন করছে। সেই

[94] সুরা সাজদাঃ ১৮

বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভে মোল্লা ইয়াকুব ও মোল্লা আব্দুল গণি বারদারের মত তালেবানের বিভিন্ন মন্ত্রীরা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। তাদের এ সমস্ত কর্মের কারণ একটাই তা হল তালেবান ক্ষমতায় আসার পূর্বে আমেরিকাসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিল আজ তালেবান শিরকী জাতীয়তাবাদী উৎসব পালন ও খাম্বা পূজার মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে। কিন্তু আফসোস হয় যখন দেখি, আল-কায়দাপন্থি কিছু আলেমরা তালেবানের এই শিরকী জাতীয়তাবাদী কর্মকে জায়েয করার চেষ্টা করছে। যারা নিজেরাই এতো দিন বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে এই শিরকী জাতীয়তাবাদী উৎসব পালন না করতে এবং শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শহীদ (!) মিনারে ও স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার মত শিরকী কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করত তারাই এখন তালেবানের এই কর্মকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে জায়েয করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে। হে আহমেদ মুখতার, আবু ইমরান আর তামিম আল-আদনানী! বাংলাদেশের শিরকী জাতীয়তাবাদী বিজয়ী দিবস পালন করার মাঝে আর আফগানিস্তানের শিরকী জাতীয়তাবাদী দিবস পালন করার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? শ্রদ্ধা জানানোর জন্য বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধে ফুল দেওয়ার মাঝে আর আফগানিস্তানের স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ফুল দেওয়ার মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে? নাকি আপনাদের নেতারা যত অপকর্ম আর শিরক করবে সবগুলোই আপনাদের নিকট জায়েয? আল্লাহর নিকট কী জবাব দেবেন এর জন্য প্রস্তুত হোন!

◆ বড় ফিতনা গ্রাস করেছে তালেবানকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝

"তারা এমন যাদেরকে আমরা যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ

করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহরই জন্য।"[95] ইমাম ত্বাবারী বলেন, "অর্থাৎ যদি আমরা তাদেরকে বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা মুশরিকদের দমন করে, তাদেরকে পরাজিত করে। তারা সেখানে আল্লাহর আনুগত্য করে ফলে তারা সালাত কায়েম করে, আল্লাহ যাদেরকে যাকাতের হক্বদার বানিয়েছেন তাদেরকে যাকাত প্রদান করে। তারা মানুষকে আল্লাহর একত্ববাদ ও তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার পথে এবং মু'মিনরা যে জ্ঞান রাখেন সেই পথে আহ্বান করে।"

সায়্যিদ কুতুব ﷬ বলেন, "তারা সৎকাজের আদেশ করবে–অর্থাৎ তারা কল্যাণ ও সততার দিকে আহ্বান করবে এবং মানুষকে এর দিকেই চালিত করবে। তারা অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে–অর্থাৎ তারা অনিষ্টতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং তারা এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে। আর এটাই উম্মাতে মুসলিমার সিফাত, যে মুনকার পরিবর্তন করতে সক্ষম তা অবশিষ্ট রাখে না এবং যে ভালো কাজ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম তা থেকে বসে থাকে না।"[96]

অধিকৃত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব–এব্যাপারে কেউ ইখতিলাফ করেনি। শাইখ উসামা বিন লাদিন ﷬ তার শেষ বক্তব্য ও রিসালাগুলোতে এটার উপর জোড় দিয়েছেন। তিনি বলতেন, আমাদের এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা হবে। আর বর্তমান যামানায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার গুরত্ব অপরিসীম। যেহেতু মুসলিমদের প্রায় সবগুলো রাষ্ট্র-ই দারুল কুফরে পরিণত হয়েছে। কারণ এই সকল রাষ্ট্রের উপর চেপে বসে আছে মানবসৃষ্ট আইন দ্বারা শাসনকারী রিদ্দায় পতিত শাসকরা। আর সেই সকল রিদ্দায় পতিত শাসকদেরকে পরাজিত করতে এবং আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করতে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'য় নেমে পড়েন সত্যবাদী মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণ। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জিহাদ

---

[95] সুরা হাজ্জঃ ৪১

[96] ফী যিলালিল কুরআন

ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিপত্তি বাধে তখন, যখন কিছু অঞ্চলে সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে কতিপয় লোক নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে শুরু করে। বর্তমান তালেবান এদেরই অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকা হামলা পরবর্তী তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে তাদের পূর্বের চিত্র নিয়ে ফিরে আসেনি। আমরা দেখছি, তালেবান তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে না। আর তালেবানের পররাষ্ট্রনীতির কথা বলতে গেলে বর্তমান সময়ের আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রনীতি থেকে তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি ভিন্ন কিছু নয়। তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আসার পূর্বে তাদের অধিকৃত ভূমিগুলোতে শারীয়াহ দ্বারা বিচার-ফায়সালা করত না। তারা বিচারকার্যের জন্য আঞ্চলিক গোত্রীয় আইনগুলোকে বেছে নিয়েছিল। এই চিত্র আমরা তাদের মাধ্যমগুলো থেকেই জেনেছি। তখন কিছু কিছু ব্যক্তি দাবি করত, তালেবান পুরো আফগানিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার পর পরিপূর্ণ শারীয়াহ দ্বারা দেশ শাসন করবে। যদিও অধিকৃত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করার জন্য কাফিরদের কর্তৃক নির্ধারিত সীমানায় ঘেরা পুরো আফগানিস্তানের দখল নেওয়া শর্ত নয়। শর্ত হচ্ছে, যে ভূমিতে কুদরাহ তথা ক্ষমতা অর্জিত হবে সেই ভূমিতে শারীয়াহ'র বিধিবিধান বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা নেওয়ার পরেও তারা পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করেনি। তারা অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের সরকারের অবকাঠামোর উপর রয়েছে। কোন শহর বা ভূমি বিজয় করার পর সর্বাগ্রে যে কাজটি করা আবশ্যক তা হল মূর্তি এবং শিরকী চিহ্নসমূহ ধ্বংস করা। আর এ কাজটিই উম্মাহ'র মহান সালাফগণ করতেন।

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল حفظه الله বলেন, "মুহাম্মাদ বিন কাসীম আস-সাক্বাফী বর্তমানের করাচী বিজয় করেন এবং সামনে এগোতে থাকেন। যুদ্ধের পর যুদ্ধ; কোন শহর বিজয় করার পর তিনি প্রথম যে কাজ করতেন তা হল শিরকী মূর্তি ও শিরকী চিহ্নসমূহ ধ্বংস করা, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা এবং মাসজিদ নির্মাণ করা। অবশেষে তিনি রাজা দাহিরের মুখোমুখি হন হিজরী ৯২ বা ৯৩ সনে। তিনি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করেন এবং সেই রাজা যুদ্ধে নিহত হয়। হ্যাঁ, মুহাম্মাদ বিন কাসীম আস-সাক্বাফী প্রথম যে কাজটি করেছেন সেই একই কাজ তার

পূর্বের বিজয়ীরা করেছেন। ঠিক সেটাই করেছেন আল্লাহর রাসুল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময়। তা হল জনসম্মুখে থাকা শিরকের চিহ্নসমূহ অপসারণ করা।”

কিন্তু তালেবান মূর্তি না ভেঙ্গে ঐতিহাসিক নিদর্শনের নামে সেগুলোকে রক্ষা করার ঘোষণা দিয়েছে। আফগানিস্তানের জাদুঘরগুলোর চিত্র পূর্বের মতই রয়েছে। না তালেবান জাদুঘরের ভিতরে থাকা মূর্তি অপসারণ করেছে আর না সেই জাদুঘরগুলোতে পরিদর্শন নিষিদ্ধ করেছে। তাহলে বিজয়ের পর মূর্তি ও শিরকী চিহ্নসমূহ ধ্বংস করার ব্যাপারে শারয়ী বাধ্যবাধকতার বিধান আজ তালেবানের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমিতে কোথায় বাস্তবায়িত? মোল্লা ওমার رحمه الله ছিলেন মুহাত্ত্বিমুস-সনাম (মূর্তি ধ্বংসকারী) আর আজকের তালেবান হয়ে গেছে হাফিজুস-সনাম (মূর্তি রক্ষাকারী)। আজেকের তালেবানের লজ্জাও করে না, কিভাবে তারা মিডিয়ার সামনে এসে মূর্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়? এটাই কি অধিকৃত ভূমিতে তালেবানের শারীয়াহ বাস্তবায়ন? তালেবান না কবরের শিরক নিষিদ্ধ করেছে আর না তারা ওয়াহদাতুল ওজুদ ও হুলুলিয়্যাহ’র শিরকী আক্বীদাহ’র প্রচার-প্রসার নিষিদ্ধ করেছে। বরং তারা ক্ষমতায় এসেই উঁচু কবর ও মাজার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাহলে আল্লাহর রাসুল ﷺ কর্তৃক আলী رضي الله عنه কে দেওয়া উঁচু কবর সমান করে দেওয়ার সেই নির্দেশ তালেবানের ভূমিতে কোথায় বাস্তবায়িত হল? আচ্ছা আইসিসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যে প্রকাশ্য জুয়ার অন্তর্ভুক্ত–এটা কে না জানে? বাংলাদেশের কাওমী মাদরাসার বহুসংখ্যক আলেম জুয়ামুক্ত সাধারণ ক্রিকেট খেলাকেও হারাম মনে করেন। আর আইসিসি টুর্নামেন্ট যে জুয়াড়ি টুর্নামেন্ট–এটা কি কোন বিবেকবান লোক অস্বীকার করতে পারবে? এরপরেও তালেবান এই আইসিসি জুয়াড়ি টুর্নামেন্টকে অনুমোদন দিয়েছে। বরং তারা এক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আফগানিস্তান যখন আইসিসি টুর্নামেন্টের কোন খেলায় জিততে পারে তখন তালেবান এটিকে গর্বভরে নিজেদের বিজয় হিসেবে প্রচার করে। আমরা তো আল-কায়দার আলেমদের এমন লেখনিও পেয়েছি যেখানে তারা আইসিসি এবং ফিফার বিচার ব্যবস্থাকে কুফরি তাগুতী বিচার ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু তালেবান এই অশ্লীলতা প্রসারকারী, জাতীয়তাবাদী ও জুয়াড়ি আইসিসি টুর্নামেন্টকে নিষিদ্ধ করার

পরিবর্তে বৈধতা দিয়ে প্রচার করছে। আর তালেবানের বিচার ব্যবস্থায় শারীয়াহ’র বিধিবিধান বাস্তবায়নের কথা বলতে গেলে—তালেবান এক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করেছে। যদিও তালেবান ক্ষমতায় আসার বছর খানেক পর অফিসিয়ালিভাবে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে, বিচারকার্যে শারীয়াহ’র হদ বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র এর পুরো উল্টো। হাতে গোনা দুই একটি ব্যতীত তালেবানের সকল বিচারালয় এখনো জাহিলী আইন দিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করছে। আমরা দেখেছি, দুইটি প্রদেশ কেবলমাত্র দুই থেকে তিনবার হদ বাস্তবায়ন করেছে। আর বাকি বিচারালয়গুলো চুরির শাস্তি হিসেবে জেল-জরিমানা, চুল কেটে দেওয়াসহ বিভিন্ন শাস্তি দিচ্ছে। মাদক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে একই অবস্থা। আপনি যদি কাবুলের আদালতের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন—যেটা তালেবানের রাজধানী, সেখানেও জাহিলী আইন দিয়ে বিচার কাজ পরিচালনা করে। কেউ কেউ তালেবানের অফিসিয়ালি স্টেটমেন্ট দেখে প্রতারিত হয়ে দাবি করে যে, তালেবান তো শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছে। একটা বিষয় প্রমাণিত যে, সৌদি প্রশাসনের অফিসিয়ালি স্টেটমেন্ট রয়েছে যে, তাদের বিচারালয়গুলোতে শারীয়াহ অনুযায়ী বিচার কাজ পরিচালিত হয়। আর আমরা জানি যে, এই শতকের শুরুর দিকেও সৌদি প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রে হদ বাস্তবায়ন করত কিন্তু সৌদি প্রশাসন হদ বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে ইহুদীদের হদ বাস্তবায়নের অনুসরণ করত। অথচ আমরা জানি, এই যামানার মুহাক্কীক আলেমগণ সৌদি প্রশাসনের কুফরির মধ্যে এটাও গণ্য করতেন যে, সৌদি প্রশাসন বিচারকার্যে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে না। সুতরাং এখানে ধর্তব্য বিষয় হচ্ছে কাজে বাস্তবায়ন। তবে এখানে একটি বিষয় বলে রাখা উচিৎ যে, কেবলমাত্র কিছু জায়াগায় হুদুদ বাস্তবায়ন করার নাম-ই শারীয়াহ দ্বারা শাসন করা নয়—যদি না অন্য সবক্ষেত্রে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা হয়। স্বরাষ্ট্রনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি—উভয় ক্ষেত্রেই শারীয়াহ বাস্তবায়ন আবশ্যক। কিন্তু তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি পুরোটাই শারীয়াহ বহির্ভূত। আপনি বর্তমানে মুসলিমদের দেশগুলোর কোন একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে তালেবানের পররাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা করে দেখবেন তেমন কোন পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। তাই আপনি দেখবেন, তালেবানের যে নেতাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়—আপনারা অমুক রাষ্ট্রের

সাথে কেমন আচরণ করতে চান বা অমুক রাষ্ট্রের ব্যাপারে আপনাদের অবস্থান কী? তখন দেখবেন তালেবানের নেতারা নির্দ্বিধায় বলবে, অমুক রাষ্ট্র আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে চাই। তালেবান যেকোনো রাষ্ট্রের সাথেই সম্পর্ক করতে চায়—হোক সেটা আসলী কাফির, হারবী কাফির, আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালিদাতা এবং মুসলিমদের নির্যাতনকারী রাষ্ট্র অথবা মুরতাদ শাসকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র তা সমান। আসলী কাফির রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের কর্মপদ্ধতি কেমন, আর তালেবান কী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে! মুরতাদ শাসকদের ব্যাপারে ইসলামের বিধিবিধান তো আরো কঠোর। হানাফী মাজহাবের মতানুসারেও তো সাধারণত মুরতাদদের সাথে সন্ধি করা জায়েয নেই। আর যারা সন্ধির ব্যাপারে মত দিয়েছেন তারা এ শর্ত উল্লেখ করেছেন যে, সন্ধি চুক্তির উদ্দেশ্য থাকতে হবে মুরতাদরা যেন তাদের রিদ্দাহ থেকে ফিরে আসে যেমনটি 'বাদা'ইয়ুস সনাঈ'এর লেখক ইমাম কাসানী বলেছেন। যে পাকিস্তান সরকার মুসলিম মা-বোনদেরকে আমেরিকার হাতে তুলে দিত, বহু মুজাহিদগণকে হত্যা করেছে এবং গণতন্ত্র নামক শিরকের দিকে মুসলিমদেরকে ঠেলে দিচ্ছে সেই পাকিস্তান সরকারের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করা কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত? মুসলিমদের জাতিগত নিধন চালাচ্ছে যে চীন, সেই চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়া এবং নির্যাতিত উইঘুর মুসলিমদেরকে ঘোষণা দিয়ে বর্জন করা কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত? মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদী ভারত সরকারের চলমান নির্যাতনের মাঝেই তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক দেনদরবার কি ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত? একজন মুসলিমা নারীর নির্যাতনের প্রতিশোধ স্বরূপ তো মু'তাসিম বিল্লাহ কাফির দূর্গ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, হাজ্জাজের মত অত্যাচারী শাসক এক নির্যাতিতা মুসলিমা নারীর আর্তনাদে সাড়া দিয়ে হিন্দুস্থান বিজয়ের জন্য বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তালেবান মুসলিমদের উপর বর্বরোচিত নির্যাতনকারী কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ছে। যে কাফিররা প্রতিনিয়ত আল্লাহ ও তার রাসুলকে গালি দিচ্ছে, ইসলামকে হেয় করছে এবং মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে হত্যা করছে তালেবান তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি কিভাবে গ্রহণ করে? এই ধরনের কাফির রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক

করা নিশ্চিতভাবেই কাফিরদের সাথে ওয়ালার অন্তর্ভুক্ত। আপনি চিন্তা করুন, চীন রাশিয়া ও ভারতের মত রাষ্ট্রের সাথে তালেবান দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যু বৈঠকে যোগদান করে। এরচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে যে, যারা মুসলিমদেরকে চিরতরে নির্মূল করার চেষ্টায় লিপ্ত, যারা আজ অব্দি মুসলিমদের হত্যা করছে ও মা-বোনদের ধর্ষণ করছে এবং যারা সবদিক থেকে মুসলিমদের বেষ্টন করে তাদেরকে ইসলাম থেকে কুফরে পতিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের সাথে তালেবান নিরাপত্তা ইস্যু বৈঠকে যোগদান করে। এতো কিছুর পরেও কিভাবে বলা হয় যে, তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে? তালেবান তাদের অধিকৃত ভূমিতে না সালাত বাধ্যতামূলক করেছে আর না শারয়ী হিজাবের বিধান কার্যকর করেছে। হানাফী মাজহাবের আলেমদের মতানুসারে তো মুখমণ্ডল অনাবৃত রাখা শারয়ী হিজাবের অন্তর্ভুক্ত নয়।[97] তাহলে তালেবান কোন হানাফী মাজহাবের অনুসরণ করে? আফগানিস্তানের সুদ ভিত্তিক ব্যাংকগুলো তালেবান পুনরায় চালু করে দিয়েছে। তালেবানের রাষ্ট্র পরিচালনায় শারীয়াহ বিরোধী এতো বিষয় থাকার পরেও কিভাবে বলা হয় তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করে?

শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله বলেছেন, "যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নেই, একশ'র মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট হল এমন বিধিবিধান যেগুলোর উৎস হল ইসলামী শারীয়াহ। আর একশ'র মধ্যে দশ পার্সেন্ট হল এমন বিধিবিধান যেগুলোর উৎস হচ্ছে গঠনকৃত আইন তখন ইসলামের মাপকাঠিতে এই সংবিধানকে কুফরি সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে।"[98] শাইখ رحمه الله একই বক্তব্যে আরো বলেন, "যদি

97 হানাফী মাজহাবের আলেম মুহাম্মদ শফী উসমানী বলেছেন, "ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্য থেকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল–তিনজনই মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার মোটেই অনুমতি দেননি- তা ফিতনার আশংকা থাকুক বা না থাকুক। ইমাম আবু হানীফা ফিতনার আশংকা যদি না থাকে এই শর্তে খোলা রাখার কথা বলেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এই শর্ত পূরণ হবার নয়, তাই হানাফী ফকীহগণ গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখার অনুমতি দেননি।" [মা'আরিফুল কুরআনঃ৭/২১৪]

98 আর-রিসালাতুর রবীআহ ইলা আহলিল ইরাকী খাসসাহ ওয়াল-মুসলিমীনা আম্মাহ

মানুষ ইসলামের সকল বিধান পালন করে কেবল সুদকে হারাম করা ব্যতীত। যেমন তারা সুদী ব্যাংকসমূহের অনুমতি দেয় তাহলে এমন রাষ্ট্রের সংবিধানকে কুফরি সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হবে।” শাইখ ﷀ বলেছেন কেবলমাত্র একটি বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকলে অথবা কোন একটি হারাম বিষয়ের অনুমতি দিলে সেটাও কুফর হবে।

আমরা জানি, আবু বকর رضي الله عنه কেবলমাত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের রিদ্দাহ’র হুকুম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আর সকল সাহাবীগণের ইজমা ছিল যে, এই যুদ্ধ ছিল রিদ্দাহ’র যুদ্ধ। এটাই ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র প্রকৃত অবস্থা। কোন দল বা জামাআত যদি শারয়ী ওয়াজিব বিষয়সমূহের কোন একটি বিষয় পালনে বিরত থাকে যে অবস্থায় তাদের ক্ষমতা ও শক্তি রয়েছে তখন সেই দল বা জামাআতকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর তালেবান এরকম অনেক শারয়ী বিষয় পালন করা থেকে বিরত রয়েছে। তালেবান সর্বস্বীকৃত এক জুয়াকে অনুমোদন দিচ্ছে ও তাতে অর্থায়ন করছে, সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অনুমতি দিচ্ছে, শারয়ী হদ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকছে, ভবিষ্যতে জিহাদ না করার ঘোষণা দিয়েছে, নির্যাতিত মুসলিমদের বর্জন করে হারবী কাফিরদের সাথে মিত্রতা করছে, মুশরিক রাফিদীদের শিরকী উৎসবে পাহারা দিচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে মূর্তি রক্ষা করছে এবং যারা পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তাদের হত্যা করছে। এছাড়াও শারয়ী অনেক বিষয় থেকে তালেবান নিবৃত্ত রয়েছে। আর আমরা জানি যে, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব শাইখুল ইসলামের ক্বওল নক্বল করার পর বলেন, “আপনি তার উক্তি ও বর্ণনাটি লক্ষ্য করুন, কারণ ইমামের নিকট যাকাত আদায়ে নিবৃত্ত দলটির সাথে যুদ্ধ করা হয় এবং তাদেরকে কুফরের ও ইসলাম থেকে রিদ্দাহ’র হুকুম দেওয়া হয়, তাদের সন্তান-সন্ততিদের বন্দি করা হয় এবং তাদের সম্পদ গণিমাহ হিসেবে নেওয়া হয়। যদিও তারা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার স্বীকৃতি দিত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করত এবং যাকাত আদায় ব্যতীত ইসলামের

সকল শারয়ী বিষয়সমূহ পালন করত। এগুলো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাদেরকে কুফর রিদ্দাহ’র হুকুম দেওয়াকে বাতিল করতে পারেনি। আর এব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীগণের رضي الله عنهم ঐক্যমত প্রমাণিত হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ’লাম।”[99] তালেবান এরকম কত শারয়ী বিধান পালন করা থেকে বিরত রয়েছে!

এপর্যায়ে কিছু ব্যক্তি বলে যে, তালেবান তাদাররুজান (ক্রমান্বয়ে) পদ্ধতিতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করছে–যদিও তালেবান কখনোই এমনটা বলেনি। যারা তাদাররুজানের পক্ষে বলেছেন তারা তো এটাও বলেছেন যে, আক্বীদাহ’র সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রথম ধাপেই বাস্তবায়ন করতে হবে। আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল করার পূর্বেও বহু বছর যাবৎ তাদের অধীনে বিভিন্ন শহর ছিল সেই শহরগুলোও তালেবান শারীয়াহ দ্বারা শাসন করেনি–না বিচারকার্যে আর না অন্যান্য ক্ষেত্রে। তালেবান আফগানিস্তানের ক্ষমতা নিয়েছে দুই বছর হয়ে গেছে। দুই বছর পরেও যদি তালেবানের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার অবস্থা (!) এমন হয় তাহলে জামায়াতে ইসলাম ও ইখওয়ানপন্থিদের সুলতান তুরস্কের এরদোগান কী দোষ করেছে? তারাও তো দাবি করে, এরদোগান তাদাররুজান পদ্ধতিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করছে। অথচ আমরা জানি যে, সকল মুজাহিদ আলেমগণ এরদোগানকে তাকফীর করেছেন– শারীয়াহ দ্বারা শাসন না করার কারণে। আসলে বর্তমানে এমন কিছু ব্যক্তি বের হয়েছে যারা তালেবানের সকল অপকর্মকে বিভিন্ন অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বৈধ করার চেষ্টা করে থাকে। আল্লাহ এদের থেকে উম্মাতে মুসলিমাহ’কে হেফাজত করুন! আমীন!

এখন একটি প্রশ্ন জাগে যে, তালেবানের এই পদস্খলন কিভাবে হল? মোল্লা ওমার رحمه الله এবং তালেবানের কতিপয় মুখলিস নেতাদের মৃত্যুর পরই তালেবান আস্তে আস্তে পদস্খলিত হতে থাকে। যদিও তালেবান মোল্লা ওমার رحمه الله -এর মৃত্যুর তারিখ ২০১৩ সালের কথা বলেছে। তথাপি অনেকেই মনে করেন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله আরো কয়েকবছর আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। আর এর প্রমাণ মেলে

[99] আদ-দুরারুস সানিয়্যাহঃ ১০/১৭৯

শাইখ উসামা رحمه الله এবং আবু ইয়াহইয়া رحمه الله -এর চিঠিতে। যখন তালেবানের পক্ষ থেকে এই ধরনের বিচ্যুতি প্রকাশ পেতে থাকে তখন শাইখ উসামা رحمه الله ১৪৩১ হিজরী সনের ২৭ ই যুল-হাজ্জ মাসে রোজ শুক্রবার মোল্লা ওমার رحمه الله -এর নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন সেখানে তিনি মোল্লা ওমার رحمه الله কে অডিও বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানান। তালেবান সুকৌশলে এ সকল বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার رحمه الله -এর নামে প্রকাশ করত। তখন শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী رحمه الله ১৪৩১ হিজরী সনের ৯ ই সফর মোতাবেক ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাইখ উসামা رحمه الله -এর নিকট প্রেরিত চিঠিতে বিষয়গুলো তুলে ধরেন। আমরা শাইখের চিঠির বক্তব্যের হুবহু অনুবাদ তুলে ধরছি। তিনি বলেন, "দ্বিতীয়তঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির একটি হল, আফগানিস্তানের ইসলামী ইমারতের সাথে আমরা সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করব–আল্লাহর প্রশংসায় এটা খুবই ভালো কাজ। কিন্তু শেষ সময়গুলোতে কিছু উপলক্ষ যেমন ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে তাদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিসমূহে এমন কিছু পরিভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে যেগুলো তাদের মাঝে রীতিসিদ্ধ এবং পরিচিত ছিল না। অথচ এই বিবৃতিগুলো আমীরুল মু'মিনীন حفظه الله -এর নামে প্রকাশিত হচ্ছে। তথাপি আমি মনে করি, এই বিবৃতিগুলোর বাস্তবতা তার পদ্ধতি, তার মত ও তার ভাষা থেকে যোজন যোজন দূরে। হতে পারে মাজলিসু শুরার ক্ষমতাবলে তার নামে বিবৃতিগুলো প্রকাশ করা হয়।" এরপর শাইখ মোল্লা ওমার رحمه الله -এর সাথে যোগাযোগ ত্বরান্বিত করার মত দেন।[100]

সুতরাং তালেবানের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিগুলোর ব্যাপারে আল-কায়দার শাইখরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। আর তারা জানতেন, এই ধরনের বিচ্যুতি মোল্লা ওমার رحمه الله -এর পক্ষ থেকে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তো শাইখ উসামা মোল্লা ওমার رحمه الله -এর কণ্ঠ শোনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। আর তালেবান এই ধরনের বিচ্যুতিমূলক বিবৃতি ২০০৭ সালের শেষ থেকে প্রকাশ করা

---

[100] এই চিঠি এবোটাবাদ নথিপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আর এবোটাবাদ নথিপত্র ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী সত্যায়ন করেছেন।

শুরু করে। কেউ কেউ মনে করেন, আমেরিকা হামলা করার কয়েকবছরের মাথায় মোল্লা ওমার رحمه الله মৃত্যুবরণ করেছেন। আর আমরা জানি যে, মোল্লা ওমার رحمه الله -এর মৃত্যুর সংবাদ তালেবান প্রথমে প্রকাশ করেনি। যখন তালেবানকে বলা হয় মোল্লা ওমার رحمه الله কে প্রকাশ করতে তখন তালেবান চাপে পড়ে বিষয়টি স্বীকার করে বলে যে, ২০১৩ সালে মোল্লা ওমার رحمه الله মৃত্যুবরণ করেছেন। আমরা সকলেই একটি বিষয় জানি যে, যখন কোন হক্ব জামাআত বা দল পথভ্রষ্ট হয় তখন সেই দল ক্রমান্বয়ে ভ্রষ্টতার দিকে অগ্রসর হয়। তাই যারা ২০০৭-২০০৮ এর পরের বক্তব্য এনে দাবি করে তালেবান পরিবর্তন হয়নি, তাদের জন্য শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী رحمه الله -এর বক্তব্যই যথেষ্ট। মোল্লা ওমার رحمه الله -এর মৃত্যুর পরেই তালেবান আস্তে আস্তে পরিবর্তন হতে থাকে–যা আজ তাদেরকে কুফরের মধ্যে পতিত করেছে।

তালেবানের অনুগত আল-কায়দাও বিচ্যুতির পথে হেটেছে। শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله -এর মৃত্যুর কিছু দিন পর বিচ্যুতির পথে হাটতে শুরু করে আল-কায়দা। যদিও শুরুর দিকে মানহাজগত বিচ্যুতির মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল-কায়দার কিছু শাখার কর্মকাণ্ডে সুস্পষ্ট কুফরি পরিলক্ষিত হয়। শাইখ উসামা رحمه الله জীবিত থাকাকালীন আল-কায়দার যে শাখা কোন ভূমি বিজয় করলে তারা সেখানে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করত, হুদুদ কায়েম থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থায় শারয়ী বিধিবিধান প্রয়োগ করা, মূর্তি ও শিরকী নিদর্শনগুলো ধ্বংস করা এবং কাফির মুরতাদদের থেকে বারা ঘোষণা করা–এসবগুলো আল-কায়দার বিজিত ভূমিতে একসময় দেখা যেত। এই আনসারুশ শারীয়াহ’কেও আমরা ইয়েমেনে বিজিত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে দেখেছি। দেখেছি তাদেরকে মাজার ও উঁচু কবর ধ্বংস করতে, প্রকাশ্যে হুদুদ বাস্তবায়ন করতে, জনসম্মুখে মুরতাদদের হদ বাস্তবায়ন করতে। কিন্তু বর্তমান আল-কায়দা শাইখ উসামার আল-কায়দার নীতির অনুসরণ করে না। তাই তো আমরা দেখি, এই আনসারুশ শারীয়াহ পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্য ক্ষমতা না থাকার অজুহাতে বিজিত ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকে। জনগণের মাঝে বিরূপ প্রভাব ফেলার অজুহাতে

মাজার ও উঁচু কবর ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকে। এমনকি এই সমস্ত মাজারে কার্যক্রম চালানোও নিষিদ্ধ করে না। কেবলমাত্র দাওয়াহ, বাস্তবতা উন্মোচন ও সংশয় দূর করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। আর নিজেরাই এগুলো বলে বেড়ায়। আমরা দেখেছি, ২০১২ সালে যখন আল-কায়দা আযওয়াদ অঞ্চলের ভূমি বিজয় করে সেখানে শারীয়াহ কায়েম করে, হুদুদ প্রতিষ্ঠা করে এবং শিরকী নিদর্শন ও উঁচু কবর ভেঙ্গে ফেলে তখন আল-কায়দার বিলাদুল মাগরিব আল-ইসলামীর আমীর আবু মুসআব আব্দুল ওয়াদুদ তাদের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক একটি রিসালাহ প্রেরণ করে। তাতে সে বলে, আযওয়াদ অঞ্চলে তাদের ভুল সিয়াসাত পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তা হল, বিজিত অঞ্চলে দ্রুত শারীয়াহ বাস্তবায়ন। তাই সে তাদেরকে দ্রুত শারীয়াহ বাস্তবায়ন করা, উঁচু কবর ধ্বংস করা এবং শক্তির মাধ্যমে মুনকার পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করে। আর এগুলো করা ছাড়া তাদের বিজিত ভূমিতে যা চলমান থাকে সেটাকে তারা শারীয়াহ বাস্তবায়ন বলে প্রচার করতে থাকে। বরং যে সকল মুওয়াহহিদ মুসলিমরা অধিকৃত ভূমিতে পরিপূর্ণ শারীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করে। এক্ষেত্রে আরো নিকৃষ্ট যে কাজটি তারা করে তা হল, যে দলগুলোকে তারা পূর্বে মুরতাদ মনে করত সেই দলগুলোর সাথে তারা জোটবদ্ধ হয়ে মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তারা এই ধরনের কাজ শামে করেছে, লিবিয়াতে করেছে, ইয়েমেনে করেছে, মালিতে করেছে। যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা জাহিলী পৌত্তলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তারা লড়াই করে। পাশাপাশি সেই মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে তারা মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা তাদের অধিকৃত ভূমিতে পরিপূর্ণরূপে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে।

আল-কায়দার অবস্থা আজ এতোটাই নিচে নেমেছে যে, মুশরিক রাফিদীদের হত্যা করলে আল-কায়দা বিবৃতি প্রকাশ করে নিন্দা জানায়। যে স্থানগুলোতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা দেওয়া হয়, যে স্থানগুলোকে স্বয়ং মুশরিকরা মাসজিদ নামে আখ্যায়িত করে না আল-কায়দা ঐ শিরকী স্থানগুলোকে মাসজিদ হিসেবে উল্লেখ করে। অথচ মাসজিদ তো হল যেখানে আল্লাহর জন্য সিজদা করা হয়। যে রাফিদী

মুশরিকদের তাকফীরের ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে সেই মুশরিকদের হত্যা করার কারণে আল-কায়দা দাওলাতুল ইসলামের নিন্দা করে। অথচ এই আল -কায়দাই শাইখ উসামা -এর সময় মুশরিক রাফিদীদের উপর গাড়ি বিস্ফারণ ঘটাতো। তানযীম আল-কায়দারই অন্যতম একজন শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী ইরাকে আমভাবে মুশরিক রাফিদীদের হত্যা করার কারণে আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী -এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু বর্তমান আল-কায়দা আজ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এক ডাক্তার যাওয়াহিরী ব্যতীত আর কে রাফিদীদের হত্যা করাতে আনন্দিত হত না? আর কে রাফিদীদেরকে পৌত্তলিক মুশরিক বলে আখ্যায়িত করত না? এই আল-কায়দা পূর্বে রাফিদীদের হুসাইনিয়্যাতকে হুসাইনিয়্যাত নামে আখ্যায়িত করত। কিন্তু আজ এই আল-কায়দার কী হল যে, তারা রাফিদীদের হুসাইনিয়্যাতগুলোকে মাসজিদ নামে আখ্যায়িত করে। হে আল-কায়দার অনুসারীরা! দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকরা যখন মুশরিক রাফিদীদের উপর বিস্ফারণ ঘটায় তখন আপনাদের নেতারা এর নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেয় এবং প্রচার করতে থাকে যে, এ কাজ বৈধ নয়। আর আপনারাও নেতাদের অনুসরণ করে রাফিদীদের হত্যাকে না জায়েয মনে করেন। রাফিদীদের উপর গাড়ি বিস্ফারণ ঘটানো তো শাইখ উসামার আল-কায়দারই সুন্নাহ। আবু মুসআব থেকে শুরু করে আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী–সবাই তো রাফিদীদেরকে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে হত্যা করত। বিস্ফোরক দিয়ে রাফিদীদের হত্যা করার সুন্নাহ তো দাওলাহ-ই প্রথম শুরু করেনি। এই সুন্নাহ তো যারক্বাওয়ীর সুন্নাহ, এই সুন্নাহ শাইখ উসামার সুন্নাহ। যদি আপনারা মনে করেন, বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে রাফিদীদেরকে আমভাবে হত্যা করা দাওলাহ শুরু করেছে তাহলে আমরা বলি, আপনারা আপনাদের নেতাদের জিজ্ঞাসা করুন, ইয়েমেনে বদরুদ্দীন হুথীর জানাযায় কে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল? এক বিস্ফোরণে ১৪২ জন নিহত এবং কয়েকশ আহত হয়েছিল। আমরাই আপনাদের বলছি, ১৪৩১ হিজরীর যুল-হাজ্জ মাসে ভাই আমীন উসমানী বদরুদ্দীন হুথীর জানাযায় বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি দিয়ে রাফিদীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই হামলায় ভাই শহীদ হন (আমরা তার ব্যাপারে এমনটাই মনে করি আর আল্লাহই

তার হিসাব গ্রহণকারী) এবং ১৪২ জন নিহত ও কয়েকশ আহত হয়। আর এই পুরো অভিযানের ভিডিও ‘মালাহিম’ মিডিয়া থেকে প্রকাশ করা হয়। শুধু কি হামলা করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল? ১৪৩১ হিজরীর ১৯ ই যুল-হাজ্জ মাসে রোজ বৃহস্পতিবার আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে, তাতে আহলুস সুন্নাহ’র সন্তানদেরকে আহ্বান করা হয় তারা যেন নাবী ﷺ -এর সম্মান রক্ষার ব্যাটেলিয়নে যোগদান করে। সেই বিবৃতিতে বলা হয় শিয়া বিপদ অত্যসন্ন। এই বিবৃতির শেষের দিকে বলা হয়ঃ “আহলুস সুন্নাহ যেন জেনে রাখে, রাফিদী হুথীদের লক্ষ্যবস্তু বানানো আমাদের জন্য একটি শারয়ীসিদ্ধ বিষয়। তাই আমরা আমাদের আহলুস সুন্নাহ’র ভাইদের সতর্ক করছি তারা যেন রাফিদী হুথীদের সমাবেশ ও কাফেলাগুলো বর্জন করে। আমরা তাদের মাধ্যমে প্রতারিত ব্যক্তিদের আহ্বান করছি, সময় ফুরিয়ে যাবার আগে তারা যেন রাফিদী হুথীদের পরিত্যাগ করে। আমরা রাফিদী হুথীদের জন্য এমন বীর পুরুষ প্রস্তুত করে রেখেছি যাদের মন কখনোই শান্ত হবে না যতক্ষণ না তারা রাফিদী হুথীদের অপবিত্রতা থেকে এবং আহলুস সুন্নাহ’র বিরুদ্ধে তাদের অপরাধ থেকে যমীনকে পবিত্র করে। তারা শান্ত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয় এবং দ্বীন পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়।” রাফিদীদের ব্যাপারে এই ছিল শাইখ উসামার মানহাজ, এটাই ছিল শাইখ উসামার আল-কায়দা। কিন্তু আজ আল-কায়দা এ কী করছে?! রাফিদীদের যখন হত্যা করা হয় তখন আল-কায়দা জানায় নিন্দা আর আল-কায়দার উমারা তালেবান নেয় প্রতিশোধ। এরপরেও কি কেউ বলবে আল-কায়দা তার পূর্বের মানহাজ পরিবর্তন করেনি?

যারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে কুফরি সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র শাসন করে, জিহাদকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করে, জিহাদকে নিষিদ্ধ করে আল-কায়দা তাদেরই প্রশংসা করে। এই এক ইখওয়ান–ইখওয়ানের রিদ্দাহ’র বিষয়টি কি কোন মুওয়াহহিদ মুসলিমের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে? ইখওয়ান শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে ইখওয়ানের ব্যাপারে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু দল শাসন ক্ষমতায় যাওয়ার পরেও যখন গণতন্ত্র দ্বারা শাসন করে, মিসরী কুফরি আইন দ্বারা শাসন করাকে

শারীয়াহ দ্বারা শাসন হিসেবে গণ্য করে, মুওয়াহহিদ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, গণতন্ত্র রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং গণতন্ত্রের পথে চলার আহ্বান করে, সেই দলের রিদ্দাহ'র ব্যাপারে কি কোন মুওয়াহহিদ সন্দেহ করতে পারে?! কিভাবে আল-কায়দা এমন একটি দলের প্রশংসায় মগ্ন থাকে! বিশেষত এক মুরসীর মৃত্যুতে আল-কায়দা কত কি-ই না করল! যার সামান্য পরিমাণ তাওহীদের ইলম আছে তার নিকট মুরসী তাগুত হওয়ার ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ অস্পষ্ট থাকতে পারে? যে প্রকাশ্যে বলত চোরের হাত কাটার বিধান কোন অকাট্য বিধান নয় বরং একটি ফিক্বহী ইজতিহাদী মাসআলা, যে বলত মিসরী আইন হচ্ছে শারয়ী আইন, যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং শারীয়াহ বহির্ভূত আইন দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করত এমন এক তাগুতের মৃত্যুতে আল-কায়দা কিভাবে শোক প্রকাশ করে? আল-কায়দার বড় মাপের এক নেতা আবু উবাইদ ইউসুফ আল-আনাবীকে যখন তার ছাত্র মুরসীর প্রশংসা করা জায়েয কিনা–তা জিজ্ঞাসা করেছিল তখন ইউসুফ আল-আনাবী তাকে বলেছিল, "বরং আমরা যদি পারতাম তার পক্ষে প্রতিশোধ নিতাম।" সুবহানাল্লাহ! এটাই কি শাইখ উসামার আল-কায়দা? এই আল-কায়দার প্রতিচ্ছবি আর শাইখ উসামার আল-কায়দার প্রতিচ্ছবি কি এক ছিল? আল্লাহর কসম করে বলছি কখনোই না। হে আল-কায়দার অনুসারীরা! ইসলামের নামে যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে তাদের ব্যাপারে শাইখ উসামা رحمه الله কী বলেছেন তা ভালো করে ধারন করে রাখুন! শাইখ বলেন, "এই সকল দাজ্জালদের থেকে সতর্ক করা প্রয়োজন যারা ইসলামী জামাআত ও দলের নামে কথা বলে এবং মানুষকে এই কট্টর রিদ্দায় অংশগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করে। যদি তারা সত্যবাদী হত তাহলে দিন-রাতে তাদের একমাত্র চিন্তা হত আল্লাহ তা'আলার জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করা, মুরতাদ সরকার থেকে বারা তথা সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা এবং আমেরিকা ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। যদি তারা অক্ষম হয় তাহলে তারা যেন তাদের অন্তর দ্বারা তা অপছন্দ করে এবং মুরতাদদের প্রোগ্রামগুলোতে অংশগ্রহণ করা অথবা রিদ্দাহ'র মজলিসে বসা বর্জন করে।"[101] এই ছিল শাইখ উসামার

[101] আর-রিসালাতুর রবীআহ ইলা আহলিল ইরাকী খাসসাহ ওয়াল-মুসলিমীনা আম্মাহ

মানহাজ। যাদেরকে শাইখ উসামা দাজ্জাল বলতেন, যাদের থেকে মানুষকে সতর্ক করা প্রয়োজন মনে করতেন আজকের আল-কায়দা তাদেরকে মিত্র বলে ঘোষণা করে। এই তো আল-কায়দার এক শাখার আমীর উসামা মাহমুদ ‘দাওয়াতের পদ্ধতি ও জিহাদি মানহাজের হেফাযত’ বইতে ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক দলগুলোকে তাকফীর করার কারণে খিলাফাহ’র সমালোচনা করার পর বলেছেন, সেকুলারদের তুলনায় এই দলগুলো হচ্ছে আল-কায়দার মিত্র। তিনি তার আরেক বই ‘ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে দরদমাখা আহবান তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও’এ এই সমস্ত দলের নেতা-কর্মীদেরকে ‘দ্বীনের রক্ষক’ বলে অভিহিত করেছেন। গেল কিছুদিন পূর্বে যখন তাগুত সাইদী মৃত্যুবরণ করল তখন বাঙ্গালী আল-কায়দা কত কি-ই না করেছে! যে তাগুতী পার্লামেন্টের একজন আইন প্রণেতা ছিল তাকে আল-কায়দা কিভাবে মুসলিম উম্মাহ’র মহান আলেম হিসেবে উল্লেখ করে? সাইদীর লেখা শেষ বই ‘নন্দিত জাতির নিন্দিত গন্তব্য’ পড়লেই তো তার সর্বশেষ আক্বীদাহ-মানহাজ সম্পর্কে জানা যায়। সে তার পূর্বের চিন্তা-চেতনা থেকে কি একটুও সরেছে? না, সে তার পূর্বের অবস্থাতে অটল ছিল। এরপরেও আল -কায়দা তাকে মহান আলেম বলে প্রচার চালায়। মুজাহিদদের ব্যাপারে এই অঞ্চলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফাতাওয়া তো সাইদী-ই দিয়েছিল। এই সাইদীর ফাতাওয়াতেই জামাতুল মুজাহিদীনের আমীর শাইখ আব্দুর রহমান رحمه الله সহ কয়েকজনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল। এগুলো কি বাঙ্গালী আল-কায়দা জানে না? আসলে জনসমর্থনের পিছনে ছুটে আজ তারা নিজেদের আক্বীদাহ-মানহাজ বিসর্জন দিয়েছে। জিহাদ ও মুজাহিদদের ক্ষেত্রে এই দলগুলোর ভূমিকা সর্বদাই শত্রুতাপূর্ণ ছিল। যখনই কোন ভূমিতে মুজাহিদরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার ঘোষণা দিয়েছে তখন মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি অগ্রগামী ভূমিকা রেখেছে ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক দলগুলো। ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় মাসজিদে ইবনে তাইমিয়্যাহ’র মিম্বার থেকে শাইখ আব্দুল লতীফ মুসার নেতৃত্বে জামাআতু জুনদি আনসারিল্লাহ যখন শারীয়াহ বাস্তবায়নের ঘোষণা দেয় তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইহুদীরা করেনি। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল হামাস। সেই মুওয়াহহিদ মুসলিমদের বাড়ি-ঘরে ও মাসজিদে হামাস বোমা হামলা করেছে, আহতদেরকে ধরে হত্যা করেছে এবং

কারাগারে বন্দি করে বর্বরোচিত নির্যাতন চালিয়েছে। আমেরিকা ইরাকে হামলা করার পর যখন মুজাহিদরা দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে তখন এই ইখওয়ানপন্থি হিযবুল ইসলামী আমেরিকার সাথে মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মিসরের সিনাইতে যখন মুজাহিদরা ধারাবাহিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তখন ডাক্তার যাওয়াহিরীর ভাষ্যমতে মাজলুম নেতা (!) মুরসী নিজে সেনাবাহিনী নিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। পাকিস্তানে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামও মুজাহিদদের কম ক্ষতি করেনি।

হে বাঙ্গালী আল-কায়দার অনুসারীরা! আপনারা যদি এই অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামের অপকর্ম জানতে চান তাহলে জামাআতুল মুজাহিদীনের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করুন–তারাই জামায়াতের অপকর্ম সম্পর্কে আপনাদের বলে দিবে। জামাআতুল মুজাহিদীনের বহু সদস্যদেরকে তাগুতের কাছে ধরিয়ে দিয়েছে আপনাদের মিত্র এই জামায়াত। শাইখ আব্দুর রহমান رحمه الله কে যখন ফাঁসি দেওয়া হয় তখন খুশিতে মিষ্টি বিতরণ করেছে আপনাদের মহান (!) আলেম সাইদীর জামায়াত। আবার আপনারাই এই জামায়াতকে তাওহীদবাদী উম্মাহ বলে প্রচার করেন। কিভাবে এমন দল তাওহীদবাদী উম্মাহ হতে পারে যারা সর্বদাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে?! যারা ইসলামের নামে গণতান্ত্রিক রাজনীতি করে তাদের এ কাজ কি কুফর নয়? যারা তাদেরকে তাকফীর করে না তারা তো তাওয়ীলের অজুহাতে তাকফীর করে না। কিন্তু যাদের কাজের মূল হুকুম হচ্ছে কুফর, যাদের সামনে সকল সংশয় নিরসন করা ও বাস্তবতা উন্মোচন করার পরেও যারা এই কুফরের সাথে লেগে থাকে তারা কিভাবে তাওহীদবাদী উম্মাহ হয়? হে আল-কায়দার অনুসারীরা! নাকি আপনাদের নিকট এই সমস্ত দলের কাজের মূল হুকুমই কুফর নয়! যদি তাই হয় তাহলে নিজেদের আক্বীদাহ-মানহাজ আবার নতুন করে পরিশুদ্ধ করুন!

আপনাদের গায়রত কিভাবে আজ এতোটাই নিচে নেমেছে যে, যারা শাসন ক্ষমতায় থাকাকালীন জিহাদ ও মুজাহিদদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে, একটি জিহাদী দলকে প্রায় নিঃশেষ করার পিছনে যাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল তারাই নাকি

আপনাদের কাছে আজ তাওহীদবাদী উম্মাহ। আপনাদের তো লজ্জা করা উচিৎ, কিভাবে আপনারা শাইখ উসামার মানহাজের উপর রয়েছেন বলে দাবি করেন? শাইখ উসামা যাদেরকে দাজ্জাল বলেছেন, আপনারা আজ তাদেরকে তাওহীদবাদী উম্মাহ বলেন, মিত্র বলে ঘোষণা করেন, দ্বীনের রক্ষক বলে সম্বোধন করেন! ইসলামের নামে যত অপকর্ম আর শিরকী কুফরি কাজ করার পর কেবল ইসলামের নামের কারণে যদি আপনাদের নিকট তা কুফর সাব্যস্ত না হয় তাহলে শাইখ উসামা কেন সাইয়াফ-রব্বানীদের তাকফীর করেছিলেন? তারাও তো ইসলাম ও শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথা বলত। কিন্তু তাদের শারীয়াহ প্রতিষ্ঠার এ দাবি শাইখ উসামার কাছে কোন কাজে আসেনি। বরং আপনারা আজ জনগণের সমর্থন নেওয়ার জন্য যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছেন। তাই তো আপনারা ১৯৭১ এর শিরকী জাতীয়তাবাদী যুদ্ধকে ইসলামের জন্য যুদ্ধ বলে প্রচার করেন।[102] সেনাবাহিনীকে তার পোশাকের মর্যাদা রয়েছে বলে প্ররোচিত করেন।[103] আপনারা কোন মানহাজের অনুসরণ করছেন? তালেবানের এতো সংখ্যক শিরক কুফর আর বিচ্যুতি দেখেও নিশ্চুপ থেকে তালেবানের বাইআতে লেগে আছেন। যে কাজগুলোকে কয়েকবছর পূর্বেও আপনারা শিরক কুফর ও বিচ্যুতি বলে প্রচার করতেন তালেবান আজ সে কাজগুলো করার পর বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে সেগুলোকে বৈধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা আজ যে পথে হাটছেন সেটা উসামার আল-কায়দার পথ ছিল না। আপনারা আপনাদের মানহাজ পরিবর্তন করে ফেলেছেন। মানহাজ বিচ্যুতির ফলে আপনাদের ভিতরেও তো আজ ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে। তাই চূড়ান্ত মন্দ পরিণতিতে যাওয়ার পূর্বে আপনারা সঠিক পথে ফিরে আসুন! জনসমর্থনের যে ভুত আপনাদের মাথায় ঢুকেছে তা ঝেড়ে ফেলুন! আক্বীদাহ ও মানহাজে ছাড় দিয়ে জনসমর্থনের কোনই প্রয়োজন নেই। জনগণের মত হয়ে যাওয়ার ভ্রষ্ট মূলনীতি পরিত্যাগ করে জনগণকে নিজের মত গড়ার মূলনীতি গ্রহণ করুন! সবশেষে বলি, দলাদলি আর জাহিলিয়্যাত ছেড়ে দিয়ে খিলাফাহ’র সারিতে যোগদান করুন!

---

[102] Ummah News থেকে প্রচারিত ‘বাংলাদেশঃ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট!’ শিরোনামে ভিডিও

[103] Ummah News থেকে প্রচারিত ‘বাংলাদেশঃ ভারতের স্যাটেলাইট স্টেট!’ শিরোনামে ভিডিও

আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি কাদেরকে ফিতনা গ্রাস করেছে। আবু সুলাইমান চতুরতার সাথে বলেছে যে, প্রায় সবাইকে ফিতনা গ্রাস করেছে। শিরক এবং কুফরের ফিতনা তালেবানকে গ্রাস করেছে তাই আমরা তাদেরকে তাকফীর করেছি। সুস্পষ্ট কুফর এবং রিদ্দায় পতিত হওয়ার কারণেই আমরা তাদেরকে তাকফীর করেছি। আমরা তাদের কুফরি কর্মকাণ্ড উল্লেখ করার সাথে সাথে উক্ত কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ'র নির্দেশনা উল্লেখ করেছি। কুরআন-সুন্নাহ'র থেকে সালাফগণের বুঝগুলোকেই আমাদের পথনির্দেশনা বানিয়েছি। আমরা নতুন কোন মাসআলা বা মূলনীতি নিয়ে আসিনি বরং আমরা সালাফগণের ক্বদমে-ক্বদম রেখেই অতিক্রম করেছি–আল্লাহর অনুগ্রহে। একটি বিষয় আমরা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল- তালেবানের পক্ষ থেকে দাওলাহ'র উপর প্রথমে আক্রমণ করার পরই তালেবানকে দাওলাহ মুরতাদ বলে ফাতাওয়া দেয়নি বা সেই ২০১৩ সালে ডাক্তার সাহেব কর্তৃক খারিজি বলার পরই কিন্তু আল-কায়দার কাউকে বা আল-কায়দার কোন শাখাকে তাকফীর করেনি। সারা পৃথিবী থেকে আল-কায়দার সবাই দাওলাহ'কে খারিজি বলে চেঁচামেচি করেছে এবং শাম, ইয়েমেন, সোমালিয়া, লিবিয়া, মালি–এই সকল অঞ্চলগুলোতে দাওলাহ'কে খারিজি অপবাদ দিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে। এরপরেও কিন্তু দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করেনি। কারণ শুধুমাত্র দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই কোন রিদ্দাহ'র কারণ নয়। আমাদের মহান শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷺ -এর একটি বক্তব্যকে কাটছাঁট করে তারা প্রচার চালায় যে, দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেই আমরা তাদেরকে তাকফীর করি। আসল ব্যাপার হল - যারা নিজেরা কর্তৃত্বাধীন ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে পাশাপাশি কোন মুরতাদ গোষ্ঠীর সাথে জোটবদ্ধ না হয়ে নিজেরা দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দাওলাহ তাদেরকে বাগীর হুকুমে গণ্য করে। আর যারা দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং নিজেরা কর্তৃত্বাধীন ভূমিতে শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে না অথবা কোন সাহওয়াত বা মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয় তারা ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের মুরতাদ মনে করে। (আমাদের অপবাদ দানকারীদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করুন)। আবার দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সাথে সাথেই কিন্তু দাওলাহ আল-কায়দার উল্লেখিত শাখাগুলোকে অথবা

তালেবানকে তাকফীর করেনি। আবার যে সমস্ত দল বা শাখাগুলোকে তাকফীর করেছে ঐ সমস্ত দলগুলোকে একই সাথে ঢালাওভাবে তাকফীর করেনি বরং যখন যে দল রিদ্দাহ’মূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে দীর্ঘ সময় পার করেছে কেবলমাত্র তখনই পরিপূর্ণ বিচক্ষণতা ও ইনসাফের সাথে ঐ দলকে মুরতাদ ফাতাওয়া দিয়েছে। প্রতিটি দিন অতিক্রম করার সাথে সাথে দাওলাহ’র কথা এবং কাজের ছিদক্ব ও ছদাক্বাতের বিষয়টি উদ্ভাসিত হচ্ছে–আল্লাহর অনুগ্রহে। অপরদিকে প্রতিটি দিন অতিক্রম করার সাথে সাথে দাওলাহ’র বিরোধীদের কর্মের ভ্রষ্টতা এবং আক্বীদাহ’র কলুষতা প্রকাশ পেয়ে চলেছে। বিশেষভাবে শামে আল-কায়দা এবং তার মিত্ররা, লিবিয়ায় আল-কায়দার শাখা এবং আল-কায়দার আমীর-উমারা তালেবানের ঘৃণিত অবস্থা। এই তো কিছু দিন আগেও শামের জুলানীর পক্ষ নিয়ে অনেককে গলা ফাটাতে দেখা যেত কিন্তু বর্তমানে চিত্রটা পাল্টে গেছে। তালেবানের ব্যাপারেও অনেকেই আশায় ছিল যে, তারা আফগানটা আগে দখলে নিক তারপরে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তাদেরও আশার বেলুন চুপসে গেছে। বাংলায় বলে ‘আশার গুড়ে বালি’। এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার একনিষ্ঠ বান্দাদের জন্য তার অনুগ্রহ। আল্লাহ ﷻ বলেন, “এটা এ জন্য যে, তিনি সত্যকে সত্য ও বাতিলকে বাতিল প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীরা এটা পছন্দ করে না।”[104]

প্রিয় পাঠক! এবার আসি খারিজি প্রসঙ্গে– যুগে যুগে আহলে হক্বকে খারিজি অপবাদ দেওয়া নতুন কিছু নয়। যারা ইসলামের ইতিহাস জানে না তাদের কাছে বিষয়টা নতুন ঠেকবে এটা অস্বাভাবিক নয়। আহলুস সুন্নাহ’র অনুসারীদেরকে খারিজি হিসেবে অভিহিতকরণ এই দাওলাতুল খিলাফাহ’র ক্ষেত্রে প্রথম নয়। আহলুস সুন্নাহ’র একজন মহান ইমাম আবু হানীফা رحمه الله এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله –তাদেরকে তাদের যুগে খারিজি বলা হত। বাইতুল মাক্বদীস বিজয়ী সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী رحمه الله কেও তার যুগে খারিজি বলা হত। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله কেও খারিজি বলা হত। মুজাদ্দিদুল মিল্লাহ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله কে খারিজি বলা হত। সম্মানিত ভাই!

---

104 সুরা আনফালঃ ০৮

যুগে যুগে খারিজি অপবাদে অভিযুক্ত হওয়ার ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়! শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন রহিমাহুল্লাহ কে বলা হত খারিজি। এই ফিরিস্তির সর্বশেষ সংযোজন দাওলাতুল খিলাফাহ। আর হক্বপন্থিদের থেকে সাধারণ মুসলিমদের ফিরিয়ে রাখতেই যুগে যুগে খারিজি অপবাদের হাতিয়ার ব্যাবহার করত বাতিলপন্থিরা। বর্তমান যুগে কেনইবা হক্বপন্থিরা এর থেকে বাদ যাবে?!! একারণেই সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব ও শাইখ উসামার যোগ্য উত্তরসূরী দাওলাতুল ইসলামকেও পূর্বের মতই বাড়াবাড়ি মূলকভাবে খারিজি অপবাদ দেওয়া হচ্ছে! আপনারা জানেন যে, হক্বপন্থিদেরকে খারিজি অপবাদ দেওয়া হয়। তাহলে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, যাদেরকেই খারিজি বলা হয় তারাই হক্বপন্থি কিনা? আমরা এর জবাবে বলি, না। যাদেরকেই খারিজি বলা হয় তারা সবাই হক্বপন্থি না। কিন্তু হক্বপন্থিদেরকেও খারিজি অপবাদ দেওয়া হয় তাদের প্রকৃত অবস্থাকে বিকৃত করে উপস্থাপনের জন্য। প্রিয় পাঠক! আপনার যুগে কি আপনি সুলতান সালাহউদ্দীন রহিমাহুল্লাহ কে খারিজি বলতে শুনেছেন? আপনি কি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহিমাহুল্লাহ কে খারিজি বলতে শুনেছেন? আমার ধারণা আপনি কখনোই এমনটা শুনেন নি; কারণ বিষয়টি আমাদের অনেক পূর্বেই মীমাংসা হয়ে গেছে। ঠিক আজ যেমন দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলা হয় তেমনি একটা সময় দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলার মত লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইমাম আবু হানীফাকে যারা খারিজি বলেছিল আজ তারা হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে। তারাও হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতা থেকে যারা ইবনে তাইমিয়্যাহ’কে খারিজি বলেছে। আবু হানীফা, ইবেন তাইমিয়্যাহ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাবরা মুসলিমদের হৃদয় রাজ্যের সিংহাসনে অবস্থান করছে। দাওলাতুল খিলাফাহ’ও একদিন জায়গা করে নেবে আপামর মুসলিমদের মনের মণিকোঠায়–বি-ইযনিল্লাহ।

অনেক কথা হল, চলুন এবার খারিজিদের সম্পর্কে কিছুটা ভালোভাবে জেনে নেই। প্রথমেই আমরা জেনে নেব খারিজি কারা?

নিশ্চয়ই খারিজিরা মানুষের মধ্যে এমন এক দল যারা খলীফাতুল মুসলিমীন আলী ইবনে আবী তালিবের বিরুদ্ধে বের হয়েছিল। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-

এরাই হচ্ছে আসল, পরে হল শাখা-উপশাখা। এর উপরই আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, খারিজিরা হল মানুষের মধ্য থেকে এমন একটি দল যারা খলীফাতুল মুসলিমীন আলী ইবনে আবী তালিবের বিরুদ্ধে বের হয়েছিল।

কে তাদের নামকরণ করেছে? ঐ যুগের আলেমগণ।

কেন তাদেরকে খারিজি নামে নামকরণ করা হল?

- ১. হয়তো তাদের যুগে মুসলিমদের সর্বোত্তম ব্যক্তি আলী ইবনে আবী তালিবের বিরুদ্ধে বের হওয়ার কারণে।
- ২. অথবা আল্লাহর রাসুল ﷺ হাদিসে তাদের ব্যাপারে বলেছেন যে, তারা দ্বীন থেকে হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যাবে। তাদেরকে নামকরণ করার এটাও একটি কারণ।

খারিজিদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ -এর অনেক হাদিস আছে। কিন্তু আমরা সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে সেগুলো উল্লেখ করছি না।

খারিজিদের ব্যাপারে আলেমগণের এক দল বলেছেন, বিশেষভাবে যারা আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে তারাই খারিজি। কেননা হাদিসগুলো তাদের ক্ষেত্রেই বর্ণিত হয়েছে। আবুল হাসান আশআরী رحمه الله বলেছেন, তাদেরকে খারিজি নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছে। আর তিনি বিষয়টিকে আলী رضي الله عنه -এর সাথেই সীমাবদ্ধ করেছেন।

খারিজিদের ব্যাপারে আলেমগণের দ্বিতীয় একটি মত হল, যারাই স্থানকাল নির্বিশেষে এমন ইমামের বিরুদ্ধে বের হবে যার শারয়ী ইমামতের ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত।

আমরা মেনে নিলাম যে, যারা এমন ইমামের বিরুদ্ধে বের হবে যার ব্যাপারে মুসলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। এখানে একটি আবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে তা হল, খারিজিদের আক্বীদাহ’র ক্ষেত্রে তাদের সাথে একমত হওয়া। অর্থাৎ যারা আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তাদের আক্বীদাহ’সমূহের

ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া আবশ্যক। হাদিস থেকে এবং খারিজিরা যে সকল আক্বীদাহ পোষণ করে তা থেকে আলেমগণ খারিজিদের যে মানহাজ অনুসন্ধান করে বের করেছেন সেগুলো হল এই ফিরক্বার উসুল ও মানহাজ–যেগুলো তাদের মাঝে শরীক হওয়া প্রত্যেককে পার্থক্য করে।

খারিজিরা এমন একটি দল যারা শুধুমাত্র আলী ﵁ -এর যামানাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনেকেই তাদের সাথে যুক্ত হবে। তাই খারিজিদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য, মূলনীতি, আক্বীদাহ থাকা আবশ্যক যা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলকে অন্যান্য বাতিল ফিরক্বাসমূহ থেকে আলাদা করবে। কারণ খারিজিদের কোন একটি গুণ, মূলনীতি বা আক্বীদাহ কয়েকটি ভ্রান্ত ফিরক্বার মাঝে থাকতে পারে। আবার হাদিসে বর্ণিত কিছু সিফাত সৎলোকদের সাথে মিলে যায়। এমতাবস্থায় কী করা হবে? খারিজিদের কোন একটি গুণ, মূলনীতি বা আক্বীদাহ যদি কারো মাঝে পাওয়া যায় তাহলে কি তাকে খারিজি বলা হবে? সেই বিষয়গুলো কী যেগুলো কারো মাঝে পাওয়া গেলে তাকে খারিজি বলা হবে?

আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে একটি বিষয় ভালোভাবে বোঝা দরকার। তা হল, সিফাত, উসুল এবং আক্বীদাহ–এগুলোর মাঝে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। কোন কিছু বোঝার জন্য একটি মূলনীতি থাকা ও এর তাৎপর্য বোঝা আবশ্যক। আল্লাহর রাসুল ﷺ হাদিসে খারিজিদের অনেক গুণ বর্ণনা করেছেন। যেমন ধরুন - মাথা মুণ্ডন করা। এই গুণটি কি অন্যান্যদের থেকে খারিজিদের আলাদা করার মত কোন গুণ? আমরা বলব, আপনি একজন আলেম নিয়ে আসুন, যিনি বলে এই গুণটি খারিজিদেরকে পৃথক করার মত কোন গুণ। তবে এই গুণটি যারা আলী ﵁ -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য আবশ্যকীয় একটি গুণ ছিল। এটি একটি মুশতারাক সিফাত, যা অনেকের মাঝেই পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ না। আর মাথা মুণ্ডন করা জায়েয আছে এবং ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার জন্যও মাথা মুণ্ডন করা হয়। আসলে মাথা মুণ্ডনের উপর ভিত্তি করে খারিজি নির্ধারিত হয় না। যেমন ধরুন - আমাদের এই বাংলাদেশে কিছুদিন পূর্বেও কওমী মাদরাসাগুলোতে ব্যাপকভাবে মাথা মুণ্ডন করা হত। এখনো মেখল তর্যের মাদরাসাগুলোতে এর

অনেক ব্যাপকতা আছে। ব্যাপারটি বোঝাই যায় যে, শুধুমাত্র মাথা মুণ্ডন বা এই টাইপের কিছু বিষয় দিয়ে খারিজি সাব্যস্ত হয় না। কেননা এই ফিরক্বার আক্বীদাহ'র সাথে এই গুণটির কোন সম্পর্ক নেই–যা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

দ্বিতীয় সিফাতঃ "তোমাদের সালাত তাদের সালাতের কাছে নগণ্য মনে হবে এবং তোমাদের সিয়াম তাদের সিয়ামের কাছে নগণ্য মনে হবে।" এই কথাটি আল্লাহর রাসুল ﷺ তার সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। এখানে দুইটি বিষয় রয়েছেঃ

প্রথম বিষয়ঃ যারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল এই সিফাতটি তাদের জন্য আবশ্যক ছিল। যদি তারা তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার সাথে সাথে অনেক ইবাদাতকারী না হত তাহলে আল্লাহর রাসুল ﷺ -এর বর্ণিত এই সিফাতটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত না। মাথা মুণ্ডন করা ছাড়াও খারিজিদের আবশ্যকীয় গুণের একটি হল- তারা অধিক ইবাদাতকারী হবে। অর্থাৎ তোমাদের সালাত তাদের সালাতের কাছে নগণ্য মনে হবে। সাহাবীগণের যুগের পরে যাদেরকে খারিজি আখ্যায়িত করা হবে তাদের ক্ষেত্রে এই গুণটি আবশ্যকীয় গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। আমাদের সামনে রয়েছে ওমানের অধিবাসী ইবাদিয়্যাহ'রা। সম্ভবত তাদের ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে যে, তারা খারিজি। তারা একটি খারিজি সম্প্রদায়–তাদের মধ্যে কেউ আছে যে একেবারেই সালাত পড়ে না। আর তাদের অধিকাংশরাই অতিরিক্ত কোন ইবাদাত করে না। এই সিফাতের মাধ্যমে তাদেরকে আলাদা করা যাবে না। আর এই সিফাতটিও মাথা মুণ্ডনের সিফাতের মত একটি মুশতারাক সিফাত।

দ্বিতীয় বিষয়ঃ অধিক ইবাদাত করা গুণটি উম্মাহ'র মধ্যে যারা অধিক ইবাদাতকারী, দুনিয়াবিরাগী যেমন- আলী ইবনু যাইনুল আবেদীন, অধিক সিজদাকারী তালহা ছাড়াও অন্যান্যদের মাঝে সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়। তারা অনেক উঁচু মাপের ইবাদাতকারী ছিলেন। এটা কি তাদের খারিজি হওয়ার দলিল বহন করে? এটা এমন একটি দলের আবশ্যকীয় সিফাত যারা আক্বীদাগত দিক থেকে পদস্খলিত এবং পথভ্রষ্ট। এই সিফাতটি একটি ফিরক্বা হিসেবে খারিজির সাথে

কোন সম্পৃক্ততা নেই। একটি লক্ষ্যে নাবী ﷺ এমন লোকদের ব্যাপারে এই সিফাতটি বর্ণনা করেছেন–যারা আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه -এর যামানায় ছিলো। আর কিছু লোক এই সিফাতকে খারিজি হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে পেশ করছে! এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়!

তৃতীয় সিফাতঃ কুঁজ বিশিষ্ট হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন, "তার একটি হাত থাকবে মহিলাদের স্তনের মত।" এই সিফাতটি ছিল নাবী ﷺ -এর সময়ে আলী رضي الله عنه কে বলে দেওয়া খারিজিদের আবশ্যকীয় একটি সিফাত। তিনি খারিজিদের ব্যাপারে এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন যেন আলী তাদেরকে চিনতে পারেন। এই গুণটি তাদের পরে অন্যদের জন্য আবশ্যকীয় কোন গুণ হিসেবে ধর্তব্য হবে না। প্রিয় পাঠক! আপনিই বলুন, সুফুরিয়্যাহ, আঝারিক্বাহ, নাজদাত ও এমনিভাবে অন্যান্যদের মধ্যে কি কুঁজ বিশিষ্ট হাতের অধিকারী ব্যক্তি ছিল? তবে যদি বলা হয় যে, তাদের মাঝে কোন স্থায়ী একটি শারীরিক ত্রুটি থাকবে। এটা শর্ত নয় যে, ঐ সকল দলের প্রত্যেকের কুঁজ বিশিষ্ট হাতের অধিকারী হবে। বরং তাদের কেউ ব্যাধিগ্রস্ত হবে এমন কিছুই যথেষ্ট, যেমন এক চক্ষুহীন হওয়া অথবা হাত কাটা থাকা অথবা পা কাটা থাকা। এই সমস্ত কথা বলাটা মূলত হাদিস নিয়ে খেল-তামাশা করার শামিল। কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, দাওলাহ'র বিরোধিতা করতে গিয়ে খারিজিদের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর যথোচ্ছাই অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা কি এটা মনে করেছে যে, এই উম্মাহ'র মাঝে কোন আলেম নেই! তারা যেভাবে মন চায় সেভাবেই রাসুল ﷺ -এর হাদিসের ব্যাখ্যা করবে?

চতুর্থ সিফাতঃ "তাদের আবির্ভাব হবে পূর্ব দিক থেকে।" নিশ্চয়ই 'তাদের আবির্ভাব হবে পূর্ব দিক থেকে' এই সিফাতটিও যারা আলী رضي الله عنه -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য একটি আবশ্যকীয় সিফাত। কারণ ইতিহাসে খারিজিদের প্রসিদ্ধ দুইটি রাষ্ট্র রুস্তুমিয়্যাহ ইবাদিয়্যাহ এবং মাদারিয়্যাহ সুফুরিয়্যাহ–এগুলো কিন্তু পশ্চিমের অন্তর্ভুক্ত। এখন কোন একজন এসে বলল, যেহেতু রাসুল ﷺ বলেছেন তাদের আবির্ভাব হবে পূর্ব দিক থেকে তাই ইবাদিয়্যাহ, সুফুরিয়্যাহ–যাদের আবির্ভাব হয়েছে পশ্চিম দিক থেকে– তারা খারিজি নয়। এমনটা বলা হবে না।

কারণ যারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য এটি একটি আবশ্যকীয় সিফাত। সুতরাং আমরা বলি, প্রত্যেক এমন দল বা ব্যক্তি যারা খারিজিদের আক্বীদাহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তখন এটা বিবেচ্য বিষয় হবে না যে, সে পশ্চিম থেকে বের হয়েছে নাকি পূর্ব থেকে, উত্তর থেকে নাকি দক্ষিণ থেকে। যখন খারিজিদের আবশ্যকীয় আক্বীদাহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে তখনই খারিজি হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে।

পঞ্চম সিফাতঃ মানুষের বিভক্তির সময় তাদের আত্মপ্রকাশ হবে। আর দুই দলের মাঝে হক্বের অধিক নিকটবর্তী দল তাদেরকে হত্যা করবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিফাত যা নিয়ে অনেকেই খেল-তামাশা করে। এই সিফাতটিও যথাক্রমে যারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যামানায় তার বিরুদ্ধে বের হয়েছিল তাদের জন্য আবশ্যকীয় একটি সিফাত। কেননা তারা এমন সময় বের হয়েছিল যখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর মাঝে মতবিরোধ চলছিল। আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খারিজিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এর মাধ্যমেই হাদিসের ভাষ্যনুযায়ী আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই দলের মাঝে হক্বের অধিক নিকটবর্তী প্রমাণিত হন। আমাদের নিকট আরো কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো এই হাদিসকে সমর্থন করে। হাদিসের ভাষ্য হচ্ছে এরূপঃ "তারা আমার উম্মাহ'র মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আর আমার উম্মাহ'র সর্বোত্তম ব্যক্তিরা তাদের হত্যা করবে।" রাসুল ﷺ -এর উম্মাহ'র সর্বোত্তম ব্যক্তিরা হলেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথে থাকা সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ। আর খারিজিরা হল উম্মাহ'র সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি। কেননা তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর এই সিফাতটিও তাদের পরে অন্যদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত নয়।

প্রিয় পাঠক! এই হাদিসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় যে, খারিজিরা হবে একটি দল। তাহলে যখন কোন ব্যক্তি খারিজি হবে তখন এই সিফাত কিভাবে প্রযোজ্য হবে? আসলে খারিজি হওয়া না হওয়াটা আক্বীদাহ'র সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যারা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কি উম্মাহ'র সর্বোত্তম ব্যক্তি? না। বরং যারা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা কখনো কখনো উম্মাহ'র সবচেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। কখনো জালিম হয় অথবা কখনো কাফির হয়। কাফিররা খারিজিদের বিরুদ্ধে

শত্রুতা বশত যুদ্ধ করে। আপনি উবাইদিয়্যাহ’দের সাথে খারিজিদের যুদ্ধের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। উবাইদিয়্যাহ’রা খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাহলে তারা কি উম্মাহ’র মাঝে উত্তম হয়ে গেছে?! না বরং উবাইদিয়্যাহ’রা ছিল মুশরিক রাফিদী। প্রিয় পাঠক! খারিজিদের ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত অনেকগুলো সিফাত রয়েছে। কিন্তু আমরা এই স্থানে সবগুলো সিফাত নিয়ে আলোচনা করব না। আমরা বর্তমান সময়ে ব্যাপক প্রসিদ্ধি পাওয়া একটি সিফাত নিয়ে আলোচনা করেই খারিজিদের আক্বীদাহ’গত বিষয়ে প্রবেশ করব ইনশা’আল্লাহ। আর রব্বুল ইযযাত যদি তাওফীক্ব দান করেন তবে অন্য সময়ে আমরা খারিজিদের ব্যাপারে যতটুকু সম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করব।

বর্তমানে প্রসিদ্ধি পাওয়া সিফাতটি হলঃ তারা মুসলিমদের হত্যা করবে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দিবে। হাদিসে বর্ণিত এই সিফাতটিও আলী رَضِيَ اللهُ-এর যামানায় খারিজিদের জন্য একটি আবশ্যকীয় সিফাত। কেননা তারা মুসলিমদের হত্যা করেছে। বরং তারা মুসলিমদের মধ্য থেকে উত্তম ব্যক্তি সাহাবী এবং তাবেঈগণকে হত্যা করেছে। তারা আহলুয যিম্মাহ’র জন্য তাদের যিম্মাহ বহাল রেখেছে। যিম্মিরা নিরাপদেই তাদের পশুপাল নিয়ে ঘোরাফেরা করেছে। অথবা কোন কাফির রাখাল দেখলে বলত তাকে ছেড়ে দাও সে আহলুয যিম্মাহ’র। অতঃপর তারা যখন কোন মুসলিম ব্যক্তিকে তার স্ত্রী-সন্তানসহ পেত তখন তারা তাকে হত্যা করত এবং তার গর্ভবতী স্ত্রীর পেট চিরে ফেলত। সুতরাং হাদিসে এই সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল- তারা ঐ সকল লোক যাদের ব্যাপারে আলী رَضِيَ اللهُ কে রাসুল ﷺ সতর্ক করেছিলেন। তারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করত এবং তাদেরকে হত্যা করত আর আহলুয যিম্মাহ’ র যিম্মাহ’কে রক্ষা করত। কাফিরদের মালিকানাধীন জিনিস ছেড়ে দিত অথচ মুসলিমদের জীবন হরণ করত। যারা আলী رَضِيَ اللهُ -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের ব্যাপারে কেউ এমনটা জানে না যে, তারা কোন কাফিরকে হত্যা করেছে এবং মুসলিম ও মুসলিমদের উত্তম ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ করেছে। একারণেই এই সিফাতটি তাদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তাদের পরবর্তীতে খারিজিদের জন্য কি এটা আবশ্যকীয় কোন

সিফাত যার মাধ্যমে তাদেরকে পৃথক করা যাবে? উত্তরঃ না। খারিজিদের মধ্যে অনেকেই আছে যে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেনি। এমনকি তাদের মধ্যে এমনও আছে যে একটি মুরগীও জবাই করেনি। অথচ সে একজন খারিজি। খারিজিদের এমন ইমাম ও নেতা রয়েছে যাকে অনেকেই অনুসরণ করে অথচ সে তার জীবনে কোন মুসলিম-কাফির কাউকেই হত্যা করেনি। সুতরাং আমাদের এমন উসুল বা মূলনীতি প্রয়োজন যা খারিজিদেরকে পার্থক্য করতে এবং চিনতে সাহায্য করবে। এটা একটি আশ্চর্যজনক বিষয়, তারা পদস্খলনের কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে–যে বিষয়ে আহলুল ইলমগণের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই সে বিষয়ে তারা মতানৈক্য করে! তাই আমরা বলি, এমন অনেক খারিজি রয়েছে যারা কখনোই কাউকে হত্যা করেনি –তাদের অধিকাংশই এমন। আর তাদের কেউ কেউ বাতিনী উবাইদিয়্যাহ’দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। আর বাতিনীরা হল শীয়াদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আমাদের ধারণা অনুযায়ী আপনারা বাতিনীদের ব্যাপারে শারীয়াহ’র হুকুম জানেন। খারিজিরা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তাহলে তারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তাদের কেউ আবার মু’মিনদের সাথে সাথে কাফিরদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে। তাহলে এর সমাধান কী?

আলে-সৌদের সেনাবাহিনীর কারো ব্যাপারে জানা যায় না যে, সে একজন কাফিরকে হত্যা করেছে। তাদের হাতে নিহতদের তালিকায় শুধুমাত্র মুসলিমরাই রয়েছে!! সৌদি রাষ্ট্র মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, হত্যা করছে, নারী-শিশু অবলা বৃদ্ধা বণিতা কেউ বাদ পড়ছে না তাদের লক্ষ্যবস্তু থেকে। সৌদির সেনাবাহিনী কোন কাফিরকে হত্যা করেছে এমনটা শোনা যায় না। হ্যাঁ, আমরা মেনে নিলাম যে, তারা হুথিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা হুথিদের হত্যা করেছে এবং মুসলিম নারী-শিশুদেরও হত্যা করেছে। তাদের কাপুরুষোচিত হামলায় মুসলিমগণ মারা গেছেন এমন অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং সৌদি রাষ্ট্র মুসলিমদের হত্যা করে এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেয়। মুসলিমদের হত্যা করা এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেওয়ার তালিকায় আরো অনেক রাষ্ট্র এবং দল আছে। সংগত কারণেই এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করছি না। এই সিফাত যেটাকে কিছু লোক খারিজিদের

অন্যতম প্রধান সিফাত হিসেবে উল্লেখ করে– প্রথমেই এই হুকুমে অন্তর্ভুক্ত হবে সৌদ রাষ্ট্র, তালেবানের অনৈসলামিক ইমারাত, বাহরাইন, আরব আমিরাতসহ আরো কিছু রাষ্ট্র এবং দল। যদি কেউ দাওলাহ'র উপর এই হুকুম আরোপ করতে চায় তাহলে প্রথমে তাকে তালেবানের অনৈসলামিক ইমারতের উপর এবং উল্লেখিত অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর এই হুকুম আরোপ করতে হবে। কারণ তালেবান মুওয়াহহিদ মুসলিমদের হত্যা করে আমেরিকাকে নিরাপদ রাখতে চায় এবং আশ্বস্ত করতে চায়। এমনিভাবে মুশরিক রাফিদীদের নিরাপদ রাখতে মুওয়াহহিদদের হত্যা করে এবং পূর্বে উল্লেখিত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রযোজ্য। যদি আমরা "মুসলিমদের হত্যা করা এবং মুশরিকদের ছেড়ে দেওয়া" এই সিফাতকে খারিজি হওয়ার জন্য অন্যতম সিফাত মেনে নেই তবে পূর্বে উল্লেখিত রাষ্ট্রগুলোকে আমাদের খারিজি বলা আবশ্যক হবে। বিপরীতে দাওলাতুল ইসলাম ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করে না। তবে যাদের ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে এবং অকাট্যভাবে রিদ্দাহ প্রমাণিত হয় কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও হত্যা করে। (কখনো কখনো বাগীদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে–এব্যাপারে শারীয়াহ'র বক্তব্য স্পষ্ট)। মোদ্দাকথা হল- আলী ইবনে আবী তালিব رضي الله عنه-এর পরে অন্য খারিজিদের জন্য এটি কোন আবশ্যকীয় সিফাত নয়। তথাপি আল-কায়দা বা যারা এই সিফাতকে খারিজি হওয়ার মানদণ্ড বানিয়ে দাওলাহ'র উপর তুহমত দেয় তাদের বলি, এই গুণটি দাওলাহ'র ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য না। বরং তালেবানের অনৈসলামিক ইমারত, সৌদি রাষ্ট্র, বাহরাইন, আরব আমিরাতসহ অন্যান্য কিছু রাষ্ট্রের উপর প্রয়োগ করা অধিক উপযুক্ত। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ইখওয়ানের উপরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। কারণ তারা কোন কাফিরকে হত্যা না করলেও সিনাইতে অনেক মুজাহিদ এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে ঠিকই হত্যা করেছে।

এবার আমরা খারিজিদের আক্বীদাহ'র আলোচনায় প্রবেশ করতে চাই। সুতরাং এবার আমরা জানব খারিজিদের সমন্বিত উসুল বা মূলনীতিগুলো কী?

কোন জামাআতকে খারিজি হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য তাদের মধ্যে কোন কোন শর্ত পূরণ হওয়া আবশ্যক? খারিজিরা কোন ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত?

খারিজিরা হল আক্বীদাহ’গত ফিরক্বার অন্তর্ভুক্ত উম্মাহ’র মহান আলেমগণ যে আক্বীদাগুলোকে সমন্বিত করেছেন। তারা উল্লেখ করেছেন যে, এই ফিরক্বার কিছু আলামত এবং লক্ষণ রয়েছে। তাদের মাঝে শাখা বিশিষ্ট অনেক ইজতিহাদ এবং ফিক্বহী বক্তব্য ও মত রয়েছে। তারা তাদের নিজেদের মাঝেই অনেক দলে বিভক্ত। তথাপি এমন কিছু মূলনীতি রয়েছে যেগুলোর উপর খারিজিরা একমত। আর এগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে অন্যান্য ফিরক্বা থেকে পৃথক করা হয়। এভাবে যে, আক্বীদাগত সকল ফিরক্বার ভ্রষ্টতার ভিত্তি হচ্ছে উসুল তথা আক্বীদাগত উসুলের সাথে সম্পৃক্ত। তারা এই মূলনীতি মেনে চলে এবং এই মূলনীতিকে বাস্তবতায় প্রয়োগ করে। ফলে ফলাফল হয় ভুল।

আর যদি তাদের মূলনীতি সঠিক হয় এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু তাদের মূলনীতি সঠিক আর উসুল প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে এমতাবস্থায় অবশ্যই তারা আহলুস সুন্নাহ’র অন্তর্ভুক্ত হবে আর তাদের কর্মকে ভুল হিসেবে গণ্য করা হবে যার কারণে তারা এক আজর (পুরস্কার) পাবে তখন তারা মুজতাহিদ হবে।

উদাহরণঃ একজন ব্যক্তি মুসলিমদেরকে তাকফীর করে কারণ তারা পাপী। তাই যখন সে কোন মুসলিমকে পায় তখনই তাকে হত্যা করে। এ ব্যক্তির ভুল কোথায়? তার ভুল কি মুসলিমদের হত্যা করার মধ্যে যখন সে তাদের দেখতে পায় নাকি তার ভুল তার আক্বীদাহ’তে যে, মুসলিমরা কাফির?? তার ভুল তার আক্বীদাহ’তে যে, মুসলিমরা কাফির কারণ তারা পাপী। কিন্তু তার হত্যা করাটা ভুল উসুল থেকে বাস্তবায়িত হয়েছে। এক ভদ্রলোক মনে করল, অমুক স্থানের অধিবাসীরা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে। তাই সে তাদেরকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তির ভুল কি উসুলে নাকি প্রয়োগে? যদি সে মনে করে, তারা আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে কারণ তাদের মাঝে এমন কিছু আমল প্রকাশ পেয়েছে যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহ’র বক্তব্য এবং উম্মাহ’র গ্রহণযোগ্য আলেমগণের বক্তব্য একমত যে, এ কাজ রিদ্দাহ। কিন্তু সে এই ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করতে গিয়ে ভুল করেছে। আলেমগণ বলেছেন, যারা কবরের ইবাদাত করে তারা কাফির, মুশরিক

এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এই মত গ্রহণ করে কোন গ্রামে গেলেন আর সেই গ্রামের প্রাণকেন্দ্রে কবর আছে–এ বিষয়টি পরিচিত। তারা এ কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে এবং তারা সন্তান পাওয়ার আশায় বাড়ি-ঘর ছেড়ে গিয়ে তার নিকট সন্তান চায় যেন সে তাদেরকে একটি সন্তান দান করে, আর যে নারী গর্ভবতী হয় না সে তার নিকট গিয়ে চায় যেন সে তাকে একটি সন্তান দান করে। ফলে এক লোক বলল, এই গ্রামের অধিবাসীরা কাফির হয়ে গিয়েছে। তাই সে তাদেরকে হত্যা করেছে। এই ব্যক্তির ভুল কোন জায়গায়? এই ব্যক্তির ভুল প্রয়োগ করাতে। যদিও সে এক্ষেত্রে ভুল করেছে আর আমরা এখন এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলব না। কিন্তু আমরা বলব, সে সঠিক উসুল গ্রহণ করেছে যে ব্যাপারে আহলুল ইলমগণ আলোচনা করেছেন। একজন দ্বীন থেকে বের হয়ে যায়– এ কথাটি সঠিক ও একটি বিশুদ্ধ আক্বীদাহ। কিন্তু প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করি। অজ্ঞতার উজর গ্রহণ করা হবে নাকি হবে না। এই কাজ কি ঐ সকল মাসআলার অন্তর্ভুক্ত যেগুলোর ক্ষেত্রে অজ্ঞতার উজর গ্রহণ করা হয়? এটা এক দীর্ঘ আলোচনা। কিন্তু মুসলিমদের হত্যা করার কারণে আমরা এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলব না যে, সে খারিজিদের অন্তর্ভুক্ত। কেন? কারণ তার ভুল হয়েছে প্রয়োগে উসুলে ভুল হয়নি।

তাহলে খারিজিদের ভুল উসুলের ক্ষেত্রে। শাইখুল ইসলাম 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে বলেন, "খারিজিদের প্রথম বিদআত ছিল কুরআন ভুল বুঝা। কুরআনের বিপরীত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা কুরআন থেকে এমন বিষয় বুঝতো কুরআন যা বুঝায়নি। তাই তারা মনে করত, পাপীকে তাকফীর করা হবে। কারণ মু'মিন হবে নেককার মুত্তাকী। তারা বলে, যে নেককার মুত্তাকী হবে না সেই কাফির এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতঃপর তারা বলে, উসমান, আলী এবং যারা এই দুইজনের সাথে সম্পর্ক করেছে তারা মু'মিন নয়। কারণ তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার ফায়সালা করেছে।"

সুতরাং তাদের বিদআতের মূল বিষয় ছিল দুইটিঃ

- ১. তাদের বিদআত ছিল উসুলের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়। তাই তারা

বলে, প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে কোন কাজের মাধ্যমে কুরআনের বিপরীত করে সে কাফির। এটা আক্বীদাহ বা বিশ্বাস।

- ২. উসমান, আলী এবং যারা এ দুজনের সাথে সম্পর্ক করেছে তারা এদের মতই কাফির।

অতএব তারা এমন ব্যক্তিকে তাকফীর করেছে দ্বীন যাদের ব্যাপারে বলেছে, তারা জান্নাতী এবং তারা খাইরুল ক্বুরূন। এই ভুলের মধ্যেই খারিজিরা পতিত হয়েছিল এবং এর উপরেই তারা তাদের আক্বীদাহ প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, আপনারা কি এমন কাউকে পেয়েছেন যে বলেছে, খারিজিদের চুল হবে লম্বা অথবা খাটো অথবা তারা হবে মাথা মুণ্ডনকারী নাকি আপনারা এমন কাউকে পেয়েছেন যে বলে, তারা হবে নির্বোধ, অল্পবয়সী? এটা হল আলেমগণের উসুল ভিত্তিক আলোচনা।

ক্বাযী আবু বকর ইবনে আরাবী বলেছেন, “খারিজিরা হল দুই শ্রেণীরঃ তাদের এক শ্রেণী মনে করে, উসমান, আলী, জামাল ও সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা এবং প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে তাদের বিচার-ফায়সালাতে সন্তুষ্ট হয়েছে তারা কাফির। আরেক শ্রেণী মনে করে, প্রত্যেক কবিরাহ গুনাহকারী কাফির ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।”[105] আবু বকর ইবনে আরাবী কি বলেছেন, এই দুই শ্রেণীর মধ্যে নির্বোধ ও অল্পবয়সীরা থাকবে?

খারিজিদের সমষ্টিগত চিন্তাঃ

ইমাম আবুল হাসান আল-আশআরী رحمه الله ‘মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন’এ কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, “খারিজিদের চিন্তা হলঃ

- ১. খারিজিরা আমীরুল মু’মিনীন আলী رضي الله عنه কে কাফির আখ্যায়িত করার ব্যাপারে একমত হয়েছে। তবে তারা ইখতিলাফ করেছে তার কুফর কি শিরক নাকি শিরক নয়।

[105] ফাতহুল বারীঃ ১২/২৯৭

- ২. তারা একমত হয়েছে যে, প্রত্যেক কবিরাহ গুনাহ-ই কুফর তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।
- ৩. তারা এব্যাপারে একমত যে, আল্লাহ সুবহানাহু কবিরাহ গুনাহ সম্পাদনকারীকে সর্বদাই শাস্তি দিবেন তবে নাজদাতের খারিজিরা ব্যতীত।
- ৪. খারিজিরা বলে, কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি।
- ৫. সকল খারিজিরা আবু বকর ﵁ ও ওমার﵁-এর ইমামতকে সত্যায়ন করে এবং উসমান ﵁ -এর ইমামতকে প্রত্যাখ্যান করে। আর মুআবিয়া, আমর ইবনুল আস ও আবু মুসা আশআরীকে তারা কাফির সাব্যস্ত করে।
- ৬. তারা মনে করে, ইমামত কুরাইশ এবং অন্যদের মধ্যে হওয়া জায়েয যখন কোন যোগ্য ব্যক্তি তা সম্পন্ন করবে।
- ৭. তারা বলে, কবরে আযাব হবে না।”

এই সবগুলো তাদের আক্বীদাহ থেকে গৃহীত বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এগুলো এমন বৈশিষ্ট্য নয় যেগুলো তাদেরকে অন্যদের থেকে পার্থক্য করবে। আর যখন সবগুলো একত্রিত হবে তখন এটা আরো তাকীদযুক্ত হবে।

হাফিজ ইবনে হাজার ‘ফাতহুল বারী’তে বলেন, “তাদের মাঝে ঐক্যমত উসুলের মধ্যে রয়েছে, সাধারণভাবে হাদিসের ব্যাপারে কুরআন যা প্রমাণ করে তা গ্রহণ করা এবং এর অতিরিক্ত যা আছে তা প্রত্যাখ্যান করা। এটাও তাদের একটি উসুল বা মূলনীতি।”

ইবনে হাযম ﵀ খারিজিদের মাজহাব (মতবাদ) উল্লেখ করে কোনো ব্যক্তিকে খারিজি বৈশিষ্ট্যে আখ্যায়িত করা সঠিক হওয়ার জন্য তার মধ্যে পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া শর্তারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, “বিচারক বানানো প্রত্যাখ্যান করা, কবিরাহ গুনাহকারীদের তাকফীর করা, অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, কবিরাহ গুনাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া এবং কুরাইশী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে ইমামত জায়েয হওয়া–এই সকল বিষয়ের

ব্যাপারে যে ব্যক্তি খারিজিদের সাথে একমত হবে সে খারিজি। যদিও এগুলো ছাড়া মুসলিমরা যে বিষয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ করে সে বিষয়ের ক্ষেত্রে সে তাদের বিপরীত মত পোষণ করে। আর যদি আমাদের উল্লেখিত বিষয়ে খারিজিদের বিপরীত মত পোষণ করে তাহলে সে খারিজি হবে না।”[106]

ইমাম ইবনে হাযমের কথা থেকে স্পষ্ট হল যে, একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খারিজি সিফাত আরোপ করা সঠিক হওয়ার জন্য এই সকল বিষয়গুলো একত্রিত হওয়াকে তিনি শর্তারোপ করেছেন। এর দলিল হল- তিনি তাদের একটি আক্বীদাহ উল্লেখ করেছেন যে, কবিরাহ গুনাহকারীদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার হুকুম দেওয়া। আর এটা একটি পরিচিত বিষয় যে, এই আক্বীদাহ’টি কেবল খারিজিদের বৈশিষ্ট্যে নয়। বরং এটা মুতাযিলাদের মধ্যেও রয়েছে। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা আরো প্রমাণ করে যে, একটি বিষয়ের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে সিফাত দেওয়া যায়– তিনি এটা মনে করতেন না। কারণ কবিরাহ গুনাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী–এটা একটি যৌথ আক্বীদাহ। তাই আবশ্যক হচ্ছে তার মাঝে পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া।

সাহাবীগণকে গালি দেওয়ার আক্বীদাহ খারিজিদের মাঝে রয়েছে। আর এটা শীয়াদের মধ্যেও রয়েছে। তারা কতিপয় সাহাবীকে গালি দেয় অথবা তাদের তাকফীর করে। সুতরাং এক্ষেত্রে খারিজিদের সাথে রাফিদীরা অংশীদার হয়েছে। যদিও তারা নামের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করে। তথাপি তাদেরকে খারিজি হিসেবে গণ্য করা হয় না। আর কুরাইশী নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খিলাফাহ জায়েয মনে করার মাসআলাটি একটি শাখাগত মাসআলা। এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ’র এক দল খারিজিদের সাথে একমত হয়েছে। স্বভাবতই এক্ষেত্রে দাওলাতুল ইসলাম খারিজিদের বিপরীত মত পোষণ করে। দাওলাতুল ইসলাম কুরাইশী নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খিলাফাহ’কে জায়েয মনে করে না। কিন্তু খারিজিরা এটা জায়েয মনে করে এবং আআহলুস সুন্নাহ’র এক দল তাদের সাথে একমত হয়েছে। তাহলে ইবনে

---

106 আল-ফাসলঃ ২/১১৩

হাযম মনে করতেন পাঁচটি বিষয় একত্রিত হওয়া আবশ্যক।

তাই কোন ব্যক্তিকে তখনই খারিজি বা খারিজিদের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিশেষণ দেয়া সঠিক হবে যখন সে খারিজিদের মানহাজ গ্রহণ করবে এবং তাদের আক্বীদাহ’য় বিশ্বাসী হবে–যেগুলোর মাধ্যমে তারা অন্যান্য ফিরক্বা থেকে আলাদা ও পৃথক হয়।

খারিজিদের আক্বীদাগত উসুলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা পাই যে, অন্যান্য ফিরক্বা থেকে তাদেরকে যা পৃথক করে তা হচ্ছে দুইটি বিষয়ঃ

- কবিরাহ গুনাহকারীদেরকে তাকফীর করা।
- মুসলিমদের ইমামদের বিরুদ্ধে এবং খারিজিদের বিরোধিতাকারী সাধারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বের হওয়া

প্রকাশ থাকে যে, মুসলিমদের ইমামদের এবং সাধারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে বের হওয়ার আক্বীদাহ’টি সাধারণত তাদের (খারিজিদের) আক্বীদাহ’র সাথে সংযুক্ত; কারণ তাদের বিরোধী মুসলিম ইমামদের বিরুদ্ধে বের হওয়াটা তাদের এ আক্বীদাহ থেকে সৃষ্ট যে, মুসলিমদের ইমামগণ যা সম্পাদন করেছে সে কারণে তারা কাফির হয়ে গেছে। আর মুসলিমদের জন্য কোন কাফিরকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া জায়েয নেই। বরং ওয়াজিব হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বের হওয়া এবং তার পরিবর্তে মুসলিমদের মধ্য থেকে অন্য কাউকে প্রতিস্থাপন করা। এমনিভাবে কবিরাহ গুনাহকারী তাদের দৃষ্টিতে মুরতাদ যাকে হত্যা করা ওয়াজিব।

তাই সালিস নিয়োগের ঘটনার পর যখন খারিজিরা আলী رضي الله عنه -এর নিকট পত্র পাঠিয়েছিল তখন তারা তার উদ্দেশ্যে লিখেছিল, “... সুতরাং আপনি যদি আপনার নিজের ব্যাপারে কুফরের কথা স্বীকার করে তাওবা করেন তাহলে আমরা আমাদের উভয়ের মাঝে বিরোধ মীমাংসা করব। নতুবা আমরা আপনাকে প্রত্যাখ্যান করলাম। আর আল্লাহ খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।”

আর কবিরাহ গুনাহকারীদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাসের ব্যাপারে তাদের

বক্তব্যটি দুনিয়াতে তাকে কুফরের হুকুম দেওয়ার সাথে সংযুক্ত। এই আক্বীদাহ অর্থাৎ কবিরাহ গুনাহকারী ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাস করবে–এই আক্বীদাহ’র ক্ষেত্রে খারিজিদের সাথে মুতাযিলাদের মিল রয়েছে। অর্থাৎ মুতাযিলারা বিশ্বাস করে যে, কবিরাহ গুনাহকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে। সুতরাং এই বৈশিষ্ট্যটি এককভাবে খারিজিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবিরাহ গুনাহকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী থাকবে এই আক্বীদাহ’টি খারিজিদের একটি আক্বীদাহ এবং মুতাযিলাদেরও একটি আক্বীদাহ।

এমনিভাবে কতিপয় সাহাবীগণ رضي الله عنهم কে গালি দেয়া বা তাদের তাকফীর করার আক্বীদাহ’টিও খারিজিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এক্ষেত্রে খারিজিদের সাথে অন্যদের মিল রয়েছে– যেমন রাফিদীরা। অর্থাৎ রাফিদীরাও অনেক সাহাবীকে তাকফীর করে এবং খারিজিরাও কতক সাহাবীকে তাকফীর করে। সাহাবীগণকে রাফিদীদের এবং খারিজিদের তাকফীর করার কারণ পৃথক পৃথক হলেও তাকফীর করার ক্ষেত্রে তাদের মিল রয়েছে।

আর ক্বুরাইশী নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ইমামত জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাদের যে বক্তব্য–এটা একটি শাখাগত মাসআলা। এই মাসআলার ব্যাপারে তাদের সাথে অন্যরাও একমত পোষণ করেছে। আর খারিজিদেরকে পার্থক্যকারী উদ্দিষ্ট আক্বীদাহ অথবা যে আক্বীদাহ পোষণ করলে কোন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে খারিজি বিশেষণ দেওয়া হয় এবং ‘মাক্বালাতুল ইসলামিয়্যীন’ কিতাবে খারিজি ফিরক্বার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে উক্তি রয়েছে তা হলঃ

- কবিরাহ গুনাহকারীকে তাকফীর করা
- তাদের দৃষ্টিতে অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়া।

প্রিয় ভাই! আমরা আপনাদের খেদমতে খাওয়ারিজদের ব্যাপারে যা কিছু আলোকপাত করলাম তা থেকে স্পষ্টভাবেই একটি বিষয় বুঝতে পেরেছেন যে, উপসাগরীয় দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় আলেম বা আল-কায়দার পক্ষ থেকে দাওলাহ’কে খারিজি হিসেবে আখ্যায়িত করাটা একটি ভিত্তিহীন অপবাদ বৈ কিছু নয়।

মুহাইসিনীর মত কথিত শাইখরা উম্মাতে মুসলিমার সামনে হাদিসে নববীকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। তারা কাউকে খারিজি আখ্যায়িত করার জন্য এমন মানদণ্ড নিয়ে এসেছে যা সালাফগণের কেউ উল্লেখ করেন নি। সালাফগণ খারিজিদেরকে একটি আক্বীদাগত বাতিল ফিরক্বা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। খারিজিরা কবিরাহ গুনাহকারীকে তাকফীর করে এবং তাদের দৃষ্টিতে অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করে। আর দাওলাহ কবিরাহ গুনাহকারীকে কাফির মনে করে না। দাওলাহ’র অফিসিয়াল বক্তব্য, লেখনি এবং কর্মকাণ্ড এব্যাপারে সুদৃঢ় প্রমাণ বহন করে। দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়ালি প্রকাশনী ‘মাকতাবাতুল হিম্মাহ’ থেকে প্রকাশিত ‘এই আমাদের আক্বীদাহ এবং এই আমাদের মানহাজ’ শীর্ষক আর্টিকেলের ০৩ নং পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ “ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি গুনাহের কারণে আমরা মুসলিমদের ক্বিবলাহ’র দিকে সালাত আদায়কারী কোন মুওয়াহহিদকে তাকফীর করি না, যতক্ষণ না সে এই বিষয়গুলোকে হালাল মনে করে। ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান চরমপন্থি খাওয়ারিজ এবং শিথিলতাপন্থী মুরজিয়াদের অবস্থানের মধ্যবর্তী।”

আর শাইখ তুর্কী বিন মুবারাক আল-বান’আলী ﷾ বলেন, “আমি এই উসুল তথা মূলনীতিসমূহ বর্ণনা করছি যেগুলো উঁচুমাপের আহলুল ইলমগণ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি বলি, খারিজিদের মূলনীতিসমূহের প্রথম মূলনীতি হল- তারা কবিরাহ গুনাহ, পাপ এবং প্রত্যেক অপরাধের কারণে তাকফীর করে। ফলে তারা মদপানকারী, যিনাকারী, চোর এবং অপরাধীকে তাকফীর করে। তারা পিতা-মাতার অবাধ্য, মিথ্যাবাদী, চোগলখোর এমনিভাবে অপহরণকারীকে তাকফীর করে। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা কবিরাহ গুনাহের কারণে তাকফীর করি না। তাই তাদের (অপবাদ আরোপকারীদের) বক্তব্য আমাদের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান নয়।

খারিজিদের মূলনীতিসমূহের দ্বিতীয় মূলনীতি হল- তারা আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফীর করে। তাই শাসক যখন তাদের নিকট কাফির হয়ে যায় তখন উপস্থিত অনুপস্থিত জনগণও কাফির হয়ে যায় এমনিভাবে মুসাফিরও কাফির হয়ে যায়। আর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আমরা আম তথা ব্যাপকভাবে তাকফীর করি না,

আর না নিন্দাযোগ্য কুৎসার কারণে বা বিতাড়িত ধারনার কারণে তাকফীর করি।

খারিজিদের মূলনীতিসমূহের তৃতীয় মূলনীতি হল- তারা অত্যাচারী মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করে যখন সে পাপ সম্পাদন করে। আর আমরা মুসলিম মুওয়াহহিদ শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে বৈধ মনে করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহর সাথে শিরক করেন অথবা সমকক্ষ স্থির করেন। সুতরাং এই হল এক্ষেত্রে সারকথা এবং সঠিক বক্তব্য। তাই যার মধ্যে এই উসুল বা মূলনীতিগুলো একত্রিত হবে সেই হল পরিত্যক্ত খারিজি। আর যদি এগুলো না থাকে তাহলে সে খারিজি হবে না। ওয়াল্লাহু আ'লাম।"

অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বের হওয়াকে দাওলাহ বৈধ মনে করে না। দাওলাহ মনে করে সুস্পষ্ট কুফর প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইমামের আনুগত্য চালিয়ে যেতে হবে। এবং দাওলাহ'র আমীর-উমারা ও সৈনিকগণ কোন বৈধ ইমামের বিরুদ্ধে বেরও হননি। দাওলাহ কবিরাহ গুনাহকারীকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী মনে করে না। কারণ শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি কুফরে আকবার বা শিরকে আকবার সম্পাদনের কারণেই চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। এজন্যই তো দাওলাহ বিবাহিত যিনাকারীদের উপর হদ বাস্তবায়নের পরে জানাযা পড়ে এবং মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করে। প্রিয় পাঠক! আপনারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, দাওলাহ সাহাবীদের মধ্য থেকে আলী ﵁ এবং মুআবিয়া ﵁ সহ অন্য কোন সাহাবীগণকে তাকফীর করে না। তাকফীর করার তো প্রশ্নই আসে না যেখানে তারা সাহাবীগণের হুরমত রক্ষায় নিজেদের জান উৎসর্গ করছে। দাওলাহ কুরাইশী ব্যতীত অন্য কারো খলীফাহ হওয়া বৈধ মনে করে না। এব্যাপারটি কথায় এবং কাজে প্রমাণিত। সুতরাং কোনো দিক থেকেই দাওলাহ'কে খারিজিদের সাথে তুলনা করা যায় না। বরং দাওলাতুল ইসলাম খারিজিদের একেবারে বিপরীত আক্বীদাহ পোষণ করে। তাই যে বা যারাই দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলবে অবশ্যই তারা দাওলাতুল ইসলামের উপর ভিত্তিহীন একটি অপবাদ আরোপ করবে– যে ব্যাপারে তারা আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর অপবাদ দানকারীরা সেই দিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। কারণ তোমাদের এই খারিজি অপবাদ দেওয়ার কারণে অনেক নিরপরাধ

মুসলিমের রক্ত ঝরেছে। আমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে বিচার দিয়ে রাখলাম।

এখন আমাদের কথার বিরোধিতা করতে গিয়ে কোন নির্বোধ বলতে পারে যে, হাদিসে তো খারিজিদের ব্যাপারে অমুক অমুক সিফাত উল্লেখ আছে। আমরা আলোচনার শুরুর দিকে বলেছিলাম যে, উক্ত সিফাতগুলো আলী ﵁ -এর যামানায় খারিজিদের জন্য আবশ্যকীয় সিফাত ছিল। আর আপনিও সালাফগণের কাউকে পাবেন না, যিনি খারিজি হওয়ার জন্য হাদিসে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া আবশ্যক বলেছেন। এ বিষয়টি আমরাও আপনাদের সামনে ভালোভাবে তুলে ধরেছি। তথাপি দাওলাতুল ইসলাম হাদিসে বর্ণিত নেতিবাচক কোন একটি গুণেও গুণান্বিত না। তারপরেও কারো কারো মনে আল-কায়দার তৈরিকৃত এই প্রশ্ন 'মুসলিমদের হত্যা করবে মুশরিকদের ছেড়ে দিবে' ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই একটু খোলাসা করে বলি। প্রথমত, দাওলাতুল ইসলাম কোন মুসলিমকে ক্বিসাস এবং হদ ব্যতীত হত্যা করে না। কেবলমাত্র তাকেই হত্যা করে যার রিদ্দাহ অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, যদি কখনো সঠিক উসুল বা মূলনীতির ভুল প্রয়োগও হয়ে যায় তাহলে এই ভুল প্রয়োগের কারণে দাওলাহ'কে খারিজি বলার কোন সুযোগ নাই। যেমন আমরা জানি যে, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ। আর ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র রিদ্দাহ'র ব্যাপারে সাহাবীগণের ইজমা রয়েছে। সুতরাং মুসলিমদের কোন দল যদি ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দাওলাহ সেই দলকে ত্বইফাতুল মুমতানিআহ গণ্য করে মুরতাদ ফাতাওয়া দিয়ে যুদ্ধ করে, পাশাপাশি কেউ যদি ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র অন্তর্ভুক্ত উক্ত দলকে মুসলিম মনে করে এবং দাওলাহ ঐ দলকে তাকফীর করার কারণে দাওলাহ'কে খারিজি মনে করে তাহলে সেটা হবে নিরেট স্বেচ্ছাচারিতা ও বাড়াবাড়ি। কেননা এখানে মূলনীতি সঠিক যে ব্যাপারে সালাফগণ আলোচনা করেছেন–তা হল, ত্বইফাতুল মুমতানিআহ'র হুকুম হচ্ছে রিদ্দাহ যেমনটি বলেছেন ইবনে তাইমিয়্যাহসহ অন্যরা। এখানে সঠিক মূলনীতির (কারো মতে) ভুল প্রয়োগ হলে কাউকে খারিজি বলা বৈধ হবে না। কারণ মূলনীতি সঠিক তা হল-

ত্বইফাতুল মুমতানিআহ’কে রিদ্দাহ’র হুকুম দেওয়া হবে। আর যদি সঠিক উসুল বা মূলনীতি প্রয়োগ করে শামের সাহওয়াত এবং তালেবান ও তালেবানের অনুগত আল -কায়দার কয়েকটি শাখাকে তাকফীর করার কারণে দাওলাহ খারিজি হয় তাহলে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ﷺ সহ নজদী দাওয়াহ’র ইমামগণ খারিজি সাব্যস্ত হওয়া অধিকতর সঠিক হয়ে যাবে। কারণ নজদী দাওয়াহ’র ইমামগণ উসমানীদের তাকফীর করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। বরং যারা এই যুদ্ধে উসমানীদের সাহায্য করেছে তাদের কুফরের ব্যাপারে নজদী দাওয়াহ’র ইমামগণ কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। যদিও কতিপয় জাহিলরা এই কারণে নজদী দাওয়াহ’র ইমামগণকে এখনো খারিজি আখ্যায়িত করে। কিন্তু আমরা জানি যে, আল-কায়দা সহ অনেক মুজাহিদ শাইখ উসমানী খিলাফাহ’কে খিলাফাহ হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এবং উসমানী শাসকদের তাকফীর করেন না, পাশাপাশি তারা নজদী দাওয়াহ’র ইমামগণকেও খারিজি মনে করেন না বরং তারা তাদেরকে এই উম্মাহ’র জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি মনে করেন। সুতরাং কোন সুরতেই দাওলাতুল ইসলামকে খারিজি বলা বৈধ হবে না। আর দাওলাতুল ইসলাম যে সমস্ত দলকে তাকফীর করেছে সেই সব দলগুলো দ্বীন ত্যাগের মত একাধিক কর্ম সম্পাদন করেছে এবং সেগুলোর উপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছে। সুতরাং দাওলাতুল ইসলামের উপর খারিজি অপবাদ দেওয়াটা চরম বাড়াবাড়িমূলক কাজ।

চিঠির বক্তব্যঃ “এর থেকে স্ববিরোধী কথা আর কি হতে পারে যে, তয়িফাতুল মানসুরার একদল মুরতাদ আর একদল খারেজি? আমরা নিজেরা নিজেদেরকে সর্বাধিক হকপ্রাপ্ত মনে করে আমাদের ছাড়া বাকিদের অথবা আমাদের বিরোধিতাকারী বা সমালোচনা কারীদের হয় মুরতাদ বা খারেজি মনে করছি। সুবহানাল্লাহ!”

প্রিয় ভাই! দীর্ঘ আলোচনার পর আবার আমরা আবু সুলাইমানের বক্তব্যে ফিরে এলাম। আবু সুলাইমান তার কল্পনার জগতে কুরআন এবং সুন্নাহ’কে এক পাশে রেখে একটি কাল্পনিক ত্বইফাতুল মানসুরা তৈরি করেছে। আর একারণেই সে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। আর আমরা আপনাদেরকে তালেবানের সুস্পষ্ট রিদ্দাহ’

র প্রমাণ দিয়েছি এবং আল-কায়দার কয়েকটি শাখার দ্বীন ত্যাগের মত অপরাধের বিবরণ দিয়েছি ও বাকিদের চরম ভ্রষ্টতা তুলে ধরেছি–আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং রিদ্দাহ'র বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশকারী তালেবান কখনোই ত্বইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেউ প্রমাণ করে দেখাক যে, পূর্বে উল্লেখিত রিদ্দায় লিপ্ত তালেবান ত্বইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভুক্ত। কেউ তালেবানকে মুসলিম মনে করলে অবশ্যই তার এই মনে করাটা ভুল হবে কিন্তু ত্বইফাতুল মানসুরা হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। এমনিভাবে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক মুরতাদ দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হওয়া, মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুওয়াহহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, মুশরিক রাফিদীদের হত্যাকারীদের নিন্দা জ্ঞাপনকারী, রাফিদীদের উপাসনালয় - যেগুলোতে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়–সেগুলোকে মাসজিদ হিসেবে আখ্যায়িতকারী এবং কর্তৃত্বাধীন ভূমিতে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা না করা আল-কায়দাও ত্বইফাতুল মানসুরার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেহেতু আমরা পূর্বে তালেবান ও আল-কায়দার ব্যাপারে মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছিলাম তাই আর তাকরার করছি না। জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

আমরা পূর্বেই প্রমাণ করেছি যে, দাওলাহ'র মাঝে খারিজিদের কোন আক্বীদাহ নেই। আর আমরা আহলুস সুন্নাহ'র অনুসারী। মুরাজিয়াদের মত ছাড়াছাড়ি এবং খারিজিদের মত বাড়াবাড়ির আক্বীদাহ বা মানহাজ অনুসরণ করি না। তাই যে দাওলাহ'কে খারিজি বলে সে অবশ্যই তুহমতদানকারী। দাওলাহ'র বিরুদ্ধে তাদের এই বিরোধিতা কোন কাজে আসবে না–বি-ইযনিল্লাহ।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট হল যে, ত্বইফাতুল মানসুরার কেউ মুরতাদ না এবং ত্বইফাতুল মানসুরার কোন দল খারিজিও না। অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে যার রিদ্দাহ অকাট্যভাবে প্রমাণিত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে আল-কায়দা দাওলাহ'কে খারিজি মনে করে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যারাই দাওলাহ'কে বাইআত দেয় তাদেরকে খারিজি মনে করে, এমনকি যারা দাওলাহ'র অধিকৃত ভূমিতে বসবাস করে তাদেরকেও খারিজি মনে করে। এমনও তথ্য আছে যে, হারাকাতুশ শাবাব অনেক সাধারণ মুসলিমকে জেলে ভরেছে শুধুমাত্র দাওলাহ'র ভিডিও দেখার

কারণে। কোন রকম বিরোধিতা এবং সমালোচনা হলেই অনেক বেশি সহিংসতার প্রমাণ দিয়েছে আল-কায়দা। আল-কায়দা এখন দাওলাহ'র বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণাকেই মূল এজেন্ডা হিসেবে নিয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বিভিন্ন প্রকাশনাগুলোতে এবং বিশেষভাবে AQIS এর আমীর উসামা মাহমুদের বক্তব্যে ও লেখনিতে। এর বিপরীতে আমরা আমাদের বিরোধিতা করলেই কাউকে মুরতাদ বলি না। যেমন- আল-কায়দার ইয়েমেন শাখা খিলাফাহ ঘোষণার পর থেকেই বিরোধিতা শুরু করে এবং দাওলাহ'কে খারিজি ফাতাওয়া দেয় কিন্তু দাওলাহ তাদেরকে তাকফীর করেছে ২০২০ সালে। সোমালিয়া, মালিতে একই অবস্থা। সেই ২০১৪ সাল থেকেই তো বিরোধিতা করে আসছে এবং খারিজি আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু তাকফীর করেছে মালী শাখাকে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আর সোমালিয়া শাখাকে তাকফীর করেছে ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে। অথচ খিলাফাহ'কে বাইআত দেওয়ার কারণে আশ-শাবাব অনেককে গুপ্ত হত্যা ও আলোচনার কথা বলে বিশ্বাসঘাতকতা মূলকভাবে হত্যা করেছে। এতো কিছুর পরেও কি দাওলাহ তাদের তাকফীর করেছে? কখন তাকফীর করেছে? ২০২০ সালে তাকফীর করেছে। এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে যে, বিরোধিতা করলেই দাওলাহ কাউকে তাকফীর করে না। আমাদের এই অঞ্চলেই এর একটি উজ্জ্বল উপমা রয়েছে। জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (বর্তমান নাম জামাআতুল মুজাহিদীন) এই সংগঠনটিকে কখনো তাকফীর করা হয়নি। অথচ এর আমীর সালাহউদ্দীন সালেহীন দাওলাহ'র সমালোচনা করেছেন এবং বিরোধিতা করেছেন।[107] আর এই সংগঠনটির অন্যান্যরাও দাওলাহ'র সমালোচনায় মোটামুটি সরব। এসব কারণেই কিন্তু তাদেরকে তাকফীর করা হয়নি। আবু সুলাইমানের বক্তব্য ভুল প্রমাণ করার জন্য এর থেকে বড় দলিলের প্রয়োজন নেই। আবু সুলাইমান বুঝানোর চেষ্টা করেছে যে, দাওলাহ'র সমালোচনা বা বিরোধিতা করলেই আমরা তাকে মুরতাদ মনে করি–এটা একটা চরম মিথ্যাচার; কারণ সে নিজেই দাওলাহ'র বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো ও

[107] ৪ জুলাই ২০১৭ সালে সাহম আল-হিন্দ মিডিয়া থেকে প্রকাশিত সালাহউদ্দীন সালেহীনের বিশেষ সাক্ষাৎকার।

সমালোচনা করার কারণেই আমরা তাকে মুরতাদ বা এমন কোন কিছু বলি নাই। এটাই তার মিথ্যাচারের উপর একটি চপেটাঘাত।

চিঠির বক্তব্যঃ “শাইখ উসামা বিন লাদিন কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? তিনি কি বলেন নি যে, মহান আল্লাহর নামে শপথ করছি যিনি আসমানকে কোন খুঁটি ছাড়াই সমুন্নত রেখেছেন। আমেরিকা ও তার অধিবাসীরা নিরাপত্তার স্বপ্নও দেখতে পারবে না, যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে নিরাপদভাবে জীবন যাপন করতে পারি এবং যতক্ষণ না সকল কাফের সৈন্য মুহাম্মাদ (সঃ) এর ভূমি থেকে বের হয়ে যায়। শাইখ উসামা তার জীবনের শেষ পর্যন্ত এ কথার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে গেছেন।”

শাইখ উসামা رحمه الله কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, তার হাতে গড়া সংগঠন আল-কায়দা বা অন্য মুজাহিদগণকে আফগান থেকে বের করে দেওয়া বা নির্মূল করার ব্যাপারে আমেরিকার সাথে চুক্তি করা হবে। শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, ইরাক, শাম, ইয়েমেন, ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ইহুদী-খ্রিষ্টানরা এবং তাদের দালালরা দখলদারিত্ব চালিয়ে যাবে, নির্যাতন-নিপীড়ন অব্যাহত রাখবে আর আমেরিকা ও তার দোসরদের সাথে শান্তিচুক্তি করা হবে? শাইখ رحمه الله কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, আমাদের বোন ড. আফিয়া সিদ্দীকাসহ হাজার হাজার মুসলিম ভাই-বোন আমেরিকা ও তার দোসরদের কারাগারগুলোতে নির্যাতিত হতে থাকবে আর তালেবান আমেরিকার নিরাপত্তা বিধান করেই যাবে এবং যারা আমেরিকার ত্রাস বা হুমকির কারণ হবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? শাইখ رحمه الله কি আফগানিস্তানের অধিবাসী হওয়ার ভিত্তিতে ওয়ালা করার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ কি জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক স্বাধীনতা সৌধে ফুল দেওয়ার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ উসামা رحمه الله কি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বা জাতীয়তাবাদী দলগুলোর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন? শাইখ কি এই মানহাজের দিকে আহ্বান করেছিলেন যে, উইঘুরে মুসলিমগণ নির্যাতিত নিষ্পেষিত হতে থাকার পরেও

চীনের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা হবে? ধিক্কার জানাই শত ধিক্কার জানাই লাঞ্ছিত অপদস্থ এই তালেবানকে! আল্লাহর কসম! ফিলিস্তিনে মুসলিমগণ এখনো নির্যাতিত নিপীড়িত বরং বিগত দিনগুলো থেকে ক্রমান্বয়ে তা বেড়েই চলেছে। এ সত্ত্বেও আমেরিকা নিরাপত্তা পায় তালেবানের কাছে!! এটাই কি চাওয়া পাওয়া ছিল শাইখ উসামার!! আহ আফসোস! তিনি চেয়েছিলেন কী আর এখন তালেবান এবং শাইখের কথিত উত্তরসূরীরা করছেটা কী?

তিনি চেয়েছিলেন পৃথিবীর সব জায়গাতেই কুফফারদের জন্য ত্রাসের সৃষ্টি করা হবে। বর্তমানে দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া অন্য কেউ কি আমেরিকা ও তার দোসরসহ সকল কুফফারদের বিরুদ্ধে ত্রাসের সঞ্চার করছে? প্রিয় পাঠক! সকল কুফফার কি জাযিরাতুল আরব থেকে বের হয়ে গেছে? সকল কুফফার কি মুহাম্মাদ ﷺ -এর উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে গেছে? তাহলে আমেরিকা কী কারণে নিরাপত্তা পেল তালেবানের পক্ষ থেকে? কী সেই কারণ? এখানে বদলে গেছে কে? আমেরিকা নাকি তালেবান? আমেরিকা ও তার দোসরদের সাথে তালেবানের রিদ্দামূলক গর্হিত এই শান্তিচুক্তিকে কিভাবে এই প্রজন্মের আল-কায়দা ফাতহে মুবীন বলতে পারে? ফাতহে মুবীন কি এটাই যে, আমেরিকা আফগান ছেড়ে চলে গেছে? তাহলে শাইখ উসামা رحمه الله টুইনটাওয়ারে হামলা চালিয়েছেন কেন? তখন তো আমেরিকা আফগানিস্তানে হামলা চালায়নি, তবে কেন শাইখ এই হামলা পরিচালনা করলেন? শাইখ চেয়েছিলেন আমেরিকাকে যুদ্ধের ময়দানে টেনে আনতে যাতে আমেরিকার পরিচালিত কুফরি বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস করতে পারেন। আমেরিকার পরিচালিত বিশ্ব ব্যবস্থা তো এখনো ধ্বংস হয়নি। তাহলে কোথায় ফাতহে মুবীন? আমেরিকা চাইছিলো যেন আফগানিস্তান থেকে বিশ্বব্যাপী কোন জিহাদের কার্যক্রম চলতে না পারে। তালেবান যেন আগের মত কোন মুহাজিরকে আফগানিস্তানে ঠাঁই না দেয়—যারা আমেরিকা ও তার মিত্রদের জন্য হুমকি হতে পারে। আর তালেবান সেই সুযোগটাই করে দিল—এই মানহাজের দিকেই কি শাইখ উসামা رحمه الله আহ্বান করেছিলেন? তিনি তার জীবনভর মুসলিমদের ভূমিগুলো থেকে দখলদার কুফফার এবং কুফফারদের এজেন্ট মুরতাদ শাসকদের উৎখাত করা এবং পুরো পৃথিবীতে

আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। মুসলিমরা নিরাপদ না হলে কুফফাররা কোথাও নিরাপত্তা পাবে না। শাইখের এ কথারই বাস্তবায়ন করে চলেছে তার প্রকৃত উত্তরসূরী দাওলাতুল ইসলামের আমীর-উমারা এবং এর সন্তানগণ– আলহামদুলিল্লাহ।

আরেকটি বিষয় সংযুক্ত করছি, আবু সুলাইমান যদি বিচক্ষণ হত তবে তার প্রোপাগান্ডামূলক এই চিঠিতে শাইখের বক্তব্যের উল্লেখিত অংশটুকু নিয়ে আসত না। কারণ শাইখের উল্লেখিত বক্তব্যের পুরোটাই তালেবান ও পরিবর্তিত আল-কায়দার বিপরীতে যায় এবং দাওলাতুল ইসলামের পক্ষে যায়। এই উল্লেখিত বক্তব্যটুকু দাওলাতুল ইসলামের মানহাজের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে এবং তালেবান ও আল-কায়দার মানহাজের পদস্খলনের প্রমাণ বহন করে।

শাইখ উসামা বিন মুহাম্মাদ বিন লাদিন ﷺ -এর ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ও তার অধিবাসীরা নিরাপত্তার স্বপ্নও দেখতে পারবে না। বর্তমানে শুধুমাত্র দাওলাতুল ইসলামই আমেরিকা এবং সকল কুফফারদের নিরাপত্তাকে ত্রাসে পরিণত করেছে। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়াসহ পুরো পৃথিবীজুড়েই খিলাফাহ'র সিংহরা কুফফারদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে–যে ব্যাপারে শত্রু-মিত্র সবারই জানা আছে। এভাবেই দাওলাতুল খিলাফাহ শাইখের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে যাচ্ছে। যদিও ডাক্তার সাহেবের আল-কায়দা কুফফারদের দোরগোড়ায় সংঘটিত হামলাগুলো নিয়ে সমালোচনা করেছে। তাদের সমালোচনার কারণ ছিল, এগুলোর মাধ্যমে রাজনৈতিক কোন ফলাফল অর্জন হয়নি। তাদের দাবি হল- বেসামরিক আমেরিকানদের হত্যা করাটা তেমন কোন ফায়দাজনক কাজ না। আসলে শাইখ উসামা ﷺ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন বেসামরিক কুফফারদের হত্যার মাধ্যমে। 'নাইনইলেভেন' এর বরকতময় হামলায় কয়েক হাজার আমেরিকার বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে। আর শাইখ উসামা ﷺ -এর ইচ্ছা ছিল আমেরিকা ও তার অধিবাসী অর্থাৎ আমেরিকার সামরিক এবং বেসামরিক কেউ যেন নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখতে না পারে। শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করা হবে এবং বেসামরিক সবাই নিরাপদে থাকবে এমনটা শাইখের ইচ্ছা ছিল না। এটা তার

বক্তব্য দ্বারাই একেবারে স্পষ্ট। আর দাওলাতুল ইসলামও সে কাজটা করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে দাওলাতুল ইসলামই ইরাক, শাম, খোরাসান, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, সোমালিয়া এবং ফিলিপিনের ফ্রন্টগুলোতে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ে গেছে এবং ফ্রন্ট লাইন ছাড়াও আমেরিকাসহ সকল কুফফারদের নিজ দেশে তাদেরকে বিভীষিকাময় মৃত্যু উপহার দিয়ে যাচ্ছে। শাইখ উসামা رحمه الله-ও চেয়েছিলেন যুদ্ধের জ্বলন্ত শিখা যেন তাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এব্যাপারে শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল-লিব্বী رحمه الله বলেন, "পশ্চিমারা সর্বদা চায়, তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আমাদের দেশে অবস্থান করে। এর দ্বারা বুঝা যায়, এই যুদ্ধের ঘ্রাণ যদি তাদের দেশে পৌঁছে, তাহলে তাদের কি অবস্থা হতে পারে!

পশ্চিমারা দুটি পয়েন্টে কাজ করেঃ

- প্রথমত, আমাদের দেশগুলিতে এবং আমাদের ইসলামিক ভূমিগুলির অভ্যন্তরে সামরিক ক্রিয়াকলাপে আমাদেরকে ব্যস্ত রাখা। এমনকি এই সামরিক ক্রিয়াকলাপ পশ্চিমাদের বাহিনী বা এজেন্টদের বাহিনীর বিরুদ্ধে হলেও।
- দ্বিতীয়ত, পশ্চিমারা তাদের জনগনের সামনে তাদের ও তাদের দেশগুলিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ হিসাবে দেখাতে চায়। তারা (নিজদের) দেশগুলিকে নিরাপত্তার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে রাখতে চায়।

সুতরাং আমাদের এই দূষিত রাজনীতিটিকে সফল হতে দেওয়া উচিত হবে না। তাই যুদ্ধ তাদের দেশগুলির গভীরে স্থানান্তরিত করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এমনকি নিয়মিত বিরতিতে বিক্ষিপ্ত অপারেশন আকারে হলেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

তাদের দেশে একটি শক্তিশালী এবং নিখুত অপারেশন, আমাদের দেশে তাদের বাহিনী বা তাদের এজেন্টদের বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক ডজন অপারেশনের সমান।

আমাদের উচিত নয় যে, সমস্ত কাজকর্মে ফুটবল মাঠের ডিফেন্ডারের মত সীমান্তে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে সীমাবদ্ধ থাকব (ফুটবল মাঠের ডিফেন্ডারের মূল কাজ হচ্ছে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বিশেষ করে স্ট্রাইকারকে থামানো, গোল করা থেকে বিরত রাখা) আর আমদের শত্রুরা পুরো ময়দানকে তাদের বিচরণক্ষেত্র বানিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾
“অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।”

এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল-কায়দার সাথে যুক্ত সকলে যেন পশ্চিমা দেশগুলিতে, বিশেষত আমেরিকার অভ্যন্তরে সামরিক বা দুর্বিষহকারী অপারেশন চালানোর জন্য চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো বা অস্থিরতার প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল - সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পদক্ষেপগুলিকে মজবুত করা। তারপরে সফল বাস্তবায়ন। আল্লাহ-ই বিশ্বস্তদের অভিভাবক।”[108]

এর বিপরীতে আল-কায়দার আমীর ডাক্তার আইমান যাওয়াহিরী শাইখ উসামা رحمه الله আমেরিকা ও অন্যান্য কুফফারদের জন্য ফাঁদ স্বরূপ যে ফ্রন্টগুলো বিস্তৃত করেছিলেন সেগুলোকে তিনি অনেকটাই গুটিয়ে ফেলেছেন বিভিন্ন মাসলাহার অজুহাতে। যে ফাঁদ শাইখ উসামা পেতেছিলেন কাফিরদের জন্য তা ডাক্তার সাহেব নষ্ট করে দিলেন। আল-কায়দার খোরাসান শাখা বিলুপ্তির মাধ্যমে আমেরিকাকে আঘাত করার বড় সুযোগটি নষ্ট করে ফেললেন। সংগঠনের নিজস্ব অবকাঠামো না থাকলে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে কাজ করা যায় না। আর এভাবেই তিনি শাইখ উসামা বিন লাদিন رحمه الله -এর ইচ্ছাকে পায়ে ঠেলে দিলেন।

চিঠির বক্তব্যঃ “কিন্তু আমরা আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছি। আমেরিকা, তার পশ্চিমা মিত্র ও নামধারী মুসলিম দেশের তাগুত সমূহের পরিবর্তে

108 বিক্ষিপ্ত ভাবনাঃ পৃষ্ঠা ১৪-১৫

আজ আমাদের মূল টার্গেট হল আমাদের বিরোধী মুজাহিদগণ। আমাদের প্রতিদিনের অভিযান সমূহের মধ্যে এরকম বিবৃতি প্রায়ই দেখা যায় যে, -মুরতাদ তানযীমুল কায়িদার এত জন সদস্য/যোদ্ধা হালাক। -সন্ত্রাসী/খারেজী দায়েশের এতজন আটক বা নিহত। কিন্তু এরকম বিবৃতি দেখা যায় না বললেই চলে যে, ওমুক স্থানে এতজন আমেরিকান ক্রুসেডার মুজাহিদদের হামলায় নিহত।”

সম্মানিত ভাই! আবু সুলাইমানের এই বক্তব্য -আমরা আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছি- একদিক থেকে পুরোপুরি সঠিক। কারণ সে নিজেই বলেছে যে, সে খলীফাহ’র বাইআত প্রত্যাহার(!) করেছে। সাথে সাথে সে প্রোপাগান্ডামূলক বক্তব্য ছড়িয়েছে এবং খিলাফাহ’র বিরোধিতাকারীদের কাতারে শামিল হয়েছে। সে বা তারা কয়েকজন অবশ্যই টার্গেট পরিবর্তন করেছে বিধায় বাইআত ভঙ্গ করেছে। সে টার্গেট পরিবর্তন করেছে–সে শারয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে যতটুকু দোষী হওয়ার কথা অবশ্যই ততটুকু দোষী হবে। কিন্তু সে তার টার্গেট পরিবর্তনকে সবার উপর চাপিয়ে দেবার কে? আবু সুলাইমান নিজের অজান্তেই তার সত্য অভিব্যক্তিটা বলে ফেলেছে। এটা হল তার ব্যক্তির ব্যাপারে আর যদি বলি, দাওলাহ’র বিরোধীরা টার্গেট পরিবর্তন করেছে–এটাও সঠিক। কারণ বিরোধিতাকারীরা অনেকেই টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছে, যেমন তালেবান এবং আল-কায়দা। আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জুলানী বলেছে যে, ডাক্তার তাকে সিরিয়ায় আমেরিকার লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে নিষেধ করেছে। তাহলে টার্গেট পরিবর্তন করেছে আল-কায়দা এবং তালেবান। এছাড়াও পূর্বে গত হওয়া আমাদের আলোচনা থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা। আর যদি আবু সুলাইমান আল-কায়দা, তালেবান এবং দাওলাহ’কে উদ্দেশ্য করে বলে থাকে তাহলে আমরা বলব, তালেবান আগে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে আর এখন তারা আমেরিকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নিজ দেশে কাজ করছে। শুধু তাই নয়, বরং আফগানিস্তানে সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা সালাফী মতাদর্শের তাদের অনেককে হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখেছে। সালাফী মাদারিসগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ আক্বীদাহ’র মুসলিমরা সেখানে অনিরাপদ। কিন্তু মুশরিক রাফিদীরা, শিখরা, খ্রিষ্টানরা সেখানে নিরাপদ।

সাহাবীদের তাকফীর করা, লা'নত করা এবং আম্মাজান আয়িশা ﵂ কে অপবাদ দেওয়ার মত জঘন্য কাজ করার পরেও তারা তাদের শিরকী রীতিনীতি পালনের জন্য নিরাপত্তা পায় আর সালাফী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ তালেবানের টার্গেট পরিবর্তন হয়ে গেছে। মুসলিমদের হত্যা করছে আর কাফিরদের ছেড়ে দিচ্ছে। আর তালেবানের অনুসারী আল-কায়দাও টার্গেট পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণকে খারিজি অপবাদ দিয়ে অন্যান্য আসলী কুফফার এবং মুরতাদ শাসক ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে যুদ্ধ করার থেকে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছে, কারণ তারা মুরতাদদের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যেমন- শাম, লিবিয়া এবং অন্যান্য স্থানে। আল-কায়দা টার্গেট পরিবর্তন করেছে; তারা আরব বসন্ত পরবর্তী তাগুত সরকারগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রিয় ভাই! আপনি বিষয়টি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন! আবু সুলাইমানের চিঠিতে উল্লেখিত টার্গেটগুলোর মধ্যে নামধারী মুসলিম দেশগুলোর শাসকদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করা উচিৎ ছিল আল-কায়দার। কিন্তু আল-কায়দা তাদের টার্গেট বদলে ফেলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে। তারা শুধু মুখেই আমেরিকাকে টার্গেট বানানোর কথা বলে কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন কথা বলে। যেমন - জুলানীকে বলে দিয়েছে যেন আমেরিকাকে লক্ষ্যবস্তু না বানায়। আসলে এইসবই তাদের দ্বিমুখী নীতি। আল-কায়দা তাদের বক্তব্য আর সারগর্ভহীন বিবৃতির মধ্যেই আমেরিকাকে টার্গেট বানানো সীমাবদ্ধ রেখেছে। আল-কায়দার বোকা সমর্থকরা বিষয়টি অনুধাবনের ক্ষমতাও রাখে না (আল্লাহ তাদের সঠিক বুঝ দান করুন)।

দাওলাতুল ইসলাম তার টার্গেট পরিবর্তন করেনি–আল্লাহর অনুগ্রহে। দাওলাতুল খিলাফাহ এগিয়ে চলছে সুলতান মাহমুদ গজনবী এবং সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, মূর্তি সংহারক মাহমুদ গজনবী ﵀ -এর হিন্দুস্থান আক্রমণের পূর্বে নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত দাবিকারী মুশরিক কারামাতীয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা (যারা বাতেনী রাফিদী)। আরো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বাইতুল মাক্বদীস বিজয়ী

সালাহউদ্দীন আইউবী রহিমাহুল্লাহ -এর কর্মপদ্ধতি। তিনি ফিলিস্তিনে খ্রিষ্টানদের আক্রমণের পূর্বে কুফফারদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী নামধারী মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের নির্মূল করে তারপরই তিনি বাইতুল মাক্বদীসের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। বারাবরই মুসলিমদের মধ্য থেকে যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে তারা কাফিরদের রক্ষা করার জন্য মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে গেছে। এর ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বিদ্যমান। এজন্যই দাওলাতুল খিলাফাহ -**أعزها الله**- সালাহউদ্দীন আইউবী রহিমাহুল্লাহ-এর কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছে যে, আমাদের প্রধান টার্গেট হল আসলী কুফফার তথা ইহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি কুফফাররা। আর যারাই এদের পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদের জন্য বাধা সৃষ্টি করবে মুসলিমদের মধ্য থেকে–তাদেরকেও টার্গেট করা হবে। তাদেরকেও টার্গেট করা হবে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন সালাহউদ্দীন আইউবীর কর্মপন্থা অনুসরণ করা ছাড়া ফিলিস্তিন মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

তিনি বলেন, “সালাহউদ্দীন শাসকদের এবং তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যারা ক্রুসেডারদের সাথে কাঁধে কাধঁ মিলিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। যদিও তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলত। কারণ সালাহউদ্দীন জানতেন যে, এই ব্যক্তিরা তাদের এই কর্মের মাধ্যমে এই মহান কালিমার বিপরীত করেছে। আর এটা একটা জানা বিষয় যে, এই সমস্ত সরকার ও দলের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত ফিলিস্তিনে পৌঁছা সম্ভব নয়–যারা ইহুদীদেরকে বেষ্টন করে আছে এবং আমাদের মাঝে ও ইহুদীদের মাঝে অন্তরায় হয়ে আছে। এ মুহূর্তে অনেক মানুষ চেঁচামেচি করে বলে যে, আপনারা কিভাবে এমন ব্যক্তিদের হত্যা করেন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে। যদি এই ধরনের ব্যক্তিদের জন্য সালাহউদ্দীনের যামানার ন্যায় ক্ষমতা ও শক্তি থাকত তাহলে তারা অবশ্যই তার মাঝে এবং কুদস মুক্ত করার কার্যকরী পদক্ষেপের মাঝে অন্তরায় হত। তারা এমন লোক যারা বেশ কিছু বিষয়ের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, তারা তাদের দ্বীনের বিষয় বুঝে না। সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম যাকাত দিতে বাধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একমত

হয়েছেন অথচ তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিত এবং ইসলামের বাকি আরকানগুলো পালন করত।"

আমরা দাওলাতুল খিলাফাহ'র সন্তানেরা আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করিনি। এর প্রমাণ হল, একমাত্র দাওলাতুল ইসলামই এখনো নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকে আছে। একমাত্র দাওলাহ'র সৈন্যরাই তাদের ঘুম হারাম করে চলছে আজও পর্যন্ত। নুসাইরীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দাবিদার সেই দলগুলো এখন কোথায়? আজ তারা নেই। সুতরাং দাওলাতুল ইসলাম টার্গেট পরিবর্তন করেনি। তবে যারা আমাদের এবং ক্রুসেডারদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত আমরা এগিয়ে যাবো কিভাবে? আমরা কুফফারদের সাথে যুদ্ধ করার পূর্বে জিহাদের দাবিদার সাহওয়াতদের সাথে যুদ্ধ করতে খুব আগ্রহী না। কিন্তু বিভিন্ন ময়দানে সাহওয়াতরা আমাদের মাঝে এবং কাফির মুরতাদদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেই যাচ্ছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অনেক ফোকাস দিতে হচ্ছে। তারা যদি আমাদের থেকে বিরত থাকে তাহলে আমরাও বিরত থাকব। এব্যাপারে আমীরুল মু'মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী ﷾ -এর এ বক্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি সাহওয়াতদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আপনারা আপনাদের হিসাব পুনরায় কষে নিন এবং আপনাদের রবের নিকট তাওবা করুন। আপনারা তো আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে আক্রমণ করেছেন এবং পিছন থেকে গাদ্দারি করে আমাদের আঘাত করেছেন যখন অল্পসংখ্যক ছাড়া আমাদের সকল সৈন্য ময়দানে ও রিবাতে ছিল। এরপরেও আপনারা আমাদের অল্প শক্তি দেখেছেন এবং আজকের ও অতীতের মাঝে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আর আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পূর্বে নিরাপদে ঘুরাফেরা করতেন এবং নিশ্চিন্তে ঘুমাতেন। কিন্তু আপনারা যে ভয় আর আতঙ্ক তৈরি করেছেন এর জন্য আপনারা রাত্রি জেগে থাকবেন এবং পাহারা বসাবেন। সুতরাং এই দাওলাহ আপনাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে যেন আপনারা এর থেক দূরে থাকেন। তাহলে দাওলাহও আপনাদের থেকে দূরে থাকবে যেন আমরা সকলে রাফিদী নুসাইরীদের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি। তবে এটা জেনে রাখুন! এই দাওলাহ'র এমন পুরুষ রয়েছে যারা বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে

থাকে না যাদেরকে দূরের কাছের সকলেই চিনে।"

আমাদের শাইখের বক্তব্যই আমাদের উদারতা ও মহানুভবতার প্রমাণ বহন করে এবং সাথে সাথে আমরা যে আমাদের টার্গেট পরিবর্তন করিনি এরও প্রমাণ বহন করে। এছাড়াও শাইখ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷀ সাহওয়াতদেরকে আমাদের এবং ক্রুসেডার ও তার দালালদের মাঝ থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পথভ্রষ্টতার অনেক গভীরে পৌঁছানোর পরেও তাদেরকে দাওলাহ'র সামনে বাধা না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর বিপরীতে আল-কায়দা মালিতে দাওলাহ'র নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদেরও লক্ষ্যবস্তু বানায়। এমন ঘটনার বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সাধারণ মুসলিমদের রক্ত নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে তাদেরকে শায়েস্তা করা দাওলাহ'র কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সাধারণ মুসলিমদের রক্তের প্রতিশোধ হিসেবে দাওলাহ'র বীর সৈনিকেরা আল-কায়দার উপর বেশ কয়েকটি বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করেছেন–আলহামদুলিল্লাহ। এই হামলাগুলো আমাদের টার্গেট পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ নয়। আমাদের কর্মই এর বড় প্রমাণ। আমরা শুধু আল-কায়দার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করি ব্যাপারটা কিন্তু তেমন নয়। দাওলাহ অন্যান্য কাফির মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল-কায়দার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করে। আর কাফির মুরতাদরা যখন দাওলাহ'র উপর বিমান হামলা চালায় তখনই সাথে সাথে আল-কায়দার মুরতাদ সেনারাও অতর্কিতে পিছন হতে হামলা চালায়। তাদের এহেন ন্যক্কারজনক কর্মের পরে কী খাইরের আশা করা যায়! দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন নিচু পন্থাই বাদ রাখেনি আল-কায়দা। মিডিয়াতেও দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যত ধরনের অপবাদ দেওয়া যায় সব ধরনের অপবাদই তারা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কি আমরা হাত ঘুঁটিয়ে বসে থাকব যেন তারা আমাদেরকে তাদের ইচ্ছামত হত্যা করতে পারে? তারা কতইনা মন্দ ফায়সালা করে!!

আরেকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করছি, তা হল - আমেরিকাই ইসলামের একমাত্র শত্রু নয়। বরং ইসলামের প্রধান কয়েকটি শত্রুর মধ্যে আমেরিকাও একটি। তাই আমাদের উচিৎ এই বিষয়টি উপলব্ধি করা। আমেরিকা আমাদের প্রধান শত্রু

বলে যারা বক্তৃতার মঞ্চ কাঁপায় এবং নিজেদের অনেক পণ্ডিত হিসেবে জাহির করে ২০২১ এর তালেবান ক্ষমতা নেওয়ার কয়েকদিন পরেই কাবুল বিমানবন্দরে হামলা তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। সেই হামলার পর আমেরিকা জানিয়েছে ২০১০ সালের পর আমেরিকান সেনাদের উপর এটিই বড় হামলা। চিন্তা করে দেখেছেন! দীর্ঘ দশ বছরে তালেবানের বীর(???) যোদ্ধারা আমেরিকার উপর এর থেকে বড় হামলা পরিচালনা করতে সক্ষম হয়নি। আরো অনেকেই তো ছিল কিন্তু এর থেকে বড় হামলা কেউ পরিচালনা করতে পারেনি। আমেরিকা প্রধান শত্রু এটা একটা চটকদার স্লোগান ছাড়া এর কিছুই বাকি থাকেনি।

চিঠির বক্তব্যঃ “আল্লাহ শাইখ উসামার প্রতি রহম করুন। মুজাহিদদের এ ভয়ংকর ও বিভৎস চেহারা তাকে দেখে যেতে হয় নি। তিনি থাকলে হয়তো এরকম দৃশ্য নাও আসতে পারত!! আল্লাহু আ’লাম।”

হে শাইখ! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! যে আমেরিকাকে আপনি টেনে এনেছিলেন আফগানিস্তানের পাহাড়ি উপত্যকায়, যে আমেরিকা লাখ লাখ মুসলিমদের হত্যা করেছে, যে আমেরিকা আমাদের ইজ্জত আব্রুর উপর আঘাত হেনেছে, ধর্ষণ করেছে হাজারো মা-বোনদের, সেই আমেরিকার সৈন্যদেরকে তালেবান কাবুলের রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে—এরকম লাঞ্ছনাদায়ক জঘন্য দৃশ্য আপনাকে দেখে যেতে হয়নি। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! সাহাবীগণকে তাকফীর করার এবং আয়িশা رضي الله عنها কে গালি দেওয়ার মজলিসগুলোর নিরাপত্তা দিচ্ছে তালেবান—এমন ভয়ঙ্কর ও জঘন্য দৃশ্য দেখে যেতে হয়নি আপনাকে। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! শিরকের ঐতিহাসিক নিদর্শন মূর্তিগুলো রক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছে তালেবান—এমন দৃশ্যও আপনাকে দেখে যেতে হয়নি। এমন হাজারো কুৎসিত দৃশ্য আছে যা আপনাকে দেখে যেতে হয়নি—আলহামদুলিল্লাহ।

শাইখ رحمه الله তার জীবনভর যারা নিজেদের আমীরের আনুগত্য ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছে তাদেরকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেননি। তিনি তাদেরকে আমীরের আনুগত্যে লেগে থাকতে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বলেছেন। দুই নদীর দেশে তানজীম আল-কায়দা নিজেদেরকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে ইরাকে দাওলাতুল ইরাক

আল-ইসলামিয়্যাহ’র সাথে একীভূত হওয়া–এই প্রমাণ বহন করে যে, শাইখ ঐক্যবদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিতেন। শাইখ উসামা ﷺ বিচ্ছিন্নতাকে কোন রকম প্রশ্রয় দেননি। যে দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থে শাইখ দুই নদীর দেশে আল-কায়দার শাখা বিলুপ্ত করে দিয়েছেন সেই দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ’র অধীনে থাকা কারো বাইআত গ্রহণ করে উম্মাহ’র মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন–এটা কল্পনাও করা যায় না। তাই বলাই যায় যে, তিনি থাকলে হয়তো এরকম দৃশ্য দেখতে হত না–আল্লাহু আ’লাম।

আবু সুলাইমান বলেছে ‘তিনি থাকলে হয়তো এরকম দৃশ্য নাও আসতে পারত!! আল্লাহু আ’লাম।’ এই বক্তব্যের মাধ্যমে আবু সুলাইমানও বিভক্তি ও সৃষ্ট রক্তপাতের জন্য ডাক্তার সাহেবকে দায়ী করেছে। আবু সুলাইমান মনে করেছে শাইখ উসামা ﷺ থাকলে হয়তো এমন পরিস্থিতি তৈরি হত না। আর যেহেতু শাইখ নেই এবং তার স্থানে আছে ডাক্তার, তাই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। প্রিয় পাঠক! আপনিও দেখলেন যে, আবু সুলাইমানও তার বক্তব্যের ইঙ্গিত দ্বারা আমাদের এই কথা ‘ডাক্তার আইমানই উম্মাহ’র মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করেছেন’–এর স্বীকারোক্তি দিলো।

চিঠির বক্তব্যঃ “কিন্তু আমি আল্লাহ’র ওয়াদা থেকে হতাশ নই। তার রাসুলের (সঃ) বাণী মিথ্যা হওয়ার নয়। তিনি (সঃ) আমাদেরকে ফিতনার পর শান্তির, বিভক্তির পর ঐক্যের এবং জোর জবস্তিমূলক শাসন ব্যবস্থার পর খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’র ওয়াদা দিয়েছেন। যতদিন এই ফিতনার অবসান ঘটিয়ে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ’র আগমন না ঘটে, ততদিন আমি আমার বাইআত (বাইআতে কুবরা) স্থগিত রাখলাম। এবং সমস্ত রকমের তাআসসুব (দলীয় সংকীর্ণতা) থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সবরকমের দলাদলি থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করলাম, সেই দল তামযীম, জামাআহ বা ইমারাহ বা দাওলাহ যেই নামেই হোক না কেন।”

আবু সুলাইমান হক্ব উপলব্ধি করার মত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কুরআন এবং সুন্নাহ’র নিকট অবস্থান না করে প্রবৃত্তির পিছনে যারা দৌঁড়ায় তাদের ব্যাপারে এর

থেকে ভাল পরিণতি আশা করা যায় না। অন্তর চক্ষু হারিয়ে ফেললে আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবায়ন কিভাবে দেখবে! প্রিয় ভাই! আল্লাহর ওয়াদা আজ বাস্তবায়িত। তিনি বলেছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِهِمۡ ۪ وَ لَیُمَکِّنَنَّ لَهُمۡ دِیۡنَهُمُ الَّذِی ارۡتَضٰی لَهُمۡ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ اَمۡنًا ؕ یَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا ؕ وَ مَنۡ کَفَرَ بَعۡدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿۵۵﴾

“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক্ব।[109] আজ আল্লাহর ওয়াদা আমাদের মাঝে প্রতিফলিত। আমাদের প্রাণ প্রিয় রাসুল ﷺ -فداه أبي وأمي- এর বাণী মিথ্যা হওয়ার কল্পনাও কোন মু’মিন করতে পারে না। তিনি বলেছেন, “আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন তোমাদের মাঝে নবুওয়াত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা তুলে নেবেন, তারপর আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ থাকবে, অতঃপর তাও উঠিয়ে নেবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে হানাহানির রাজত্ব, আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা যতদিন থাকার থাকবে, পরে তাও উঠিয়ে নেবেন। অতঃপর চেপে বসবে জবরদস্তী রাজতন্ত্র। আল্লাহর ইচ্ছা যতদিন থাকার থাকবে, পরে তাও তুলে নেবেন। তারপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ। এ পর্যন্ত বলার পর আল্লাহর রাসুল ﷺ নীরব হয়ে গেলেন।”[110] আল্লাহর রাসুলের দেওয়া ওয়াদা পুনরায় নবুওয়াতের আদলে

[109] সুরা নুরঃ ৫৫

[110] আহমাদ

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে তা বাস্তবায়িত দেখছি আমরা–আল্লাহর অনুগ্রহে।

কোন ব্যক্তির হক্ব এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফুরক্বান থাকা আবশ্যক। যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তাকে ফুরক্বান দিবেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করবে না সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফুরক্বানও পাবে না। একারণেই সে হক্বকে হক্ব হিসেবে চিনতে পারবে না। আবু সুলাইমানের দ্বারা সংঘটিত এমন কিছু বিষয়ের সংবাদ আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যা তার আল্লাহকে ভয় করার পরিপন্থি হিসেবে প্রমাণিত হয়–(ভাইদের নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আমরা তা বিস্তারিত উল্লেখ করতে অপারগ)। যেদিন থেকেই পরিপূর্ণরূপে আল্লাহকে ভয় করা পরিত্যাগ করেছে সেদিন থেকে ফুরক্বানও হারিয়ে ফেলেছে। সাথে সাথে সে আজ যে অবস্থানে আছে সেই অবস্থানের দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হয়েছে। আরো মন্দ পরিণতি থেকে আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন!

সম্মানিত ভাই! আল্লাহর রাসুলের ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে। নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–আলহামদুলিল্লাহ। এই দাওলাতুল খিলাফাহ শারয়ী দিক থেকে বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। কোন মানুষের মনগড়া বক্তব্য দ্বারা শারয়ী কোন বিষয় প্রত্যাখ্যাত হবে না। আমরা বর্তমান যুগের দাওলাতুল খিলাফাহ শারয়ীসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ সহকারে স্বল্প বিস্তর আলোচনা করেছি। এবং প্রমাণিত করেছি যে, এই খিলাফাহ বৈধ খিলাফাহ। আপনারা পূর্বে আলোচিত অংশটুকু থেকে জানতে পেরেছেন যে, আলী ইবনে আবী তালিব ﵁ -এর বিরোধিতাকারীদের মধ্যে আয়িশা সিদ্দীকা ﵂, মুআবিয়া ﵁ সহ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত কেউ কেউ ছিলেন। তথাপি তার খিলাফাহ সঠিক ছিল এবং নবুওয়াতের আদলে খিলাফাহ ছিল।

শেষ যামানা ফিতনার যামানা। এই সময়ে ঈমানের উপর টিকে থাকা অনেক কঠিন। রাসুল ﷺ বলেন,“মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন তার পক্ষে দ্বীনের উপর ধৈর্যধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো

কঠিন হবে।"[111] তিনি আরো বলেন, "অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিতনা আগমনের পূর্বেই তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। ঐ সময় যে ব্যক্তি সকাল বেলায় মু'মিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় মু' মিন থাকবে সে সকালে কাফির হয়ে যাবে। মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রয় করে দিবে।"[112] আবু সুলাইমানের বক্তব্য 'এই ফিতনার অবসান ঘটিয়ে' দ্বারা সে যা বুঝাতে চেয়েছে হাদিসে সেগুলোর কথা বলা হয়নি। হাদিসে যে ফিতনার ব্যাপারে বলা হয়েছে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠার পর তা থাকবে না–এমন কোন ইঙ্গিত কুরআন এবং সুন্নাহ'তে পাওয়া যায় না। বরং ঈসা عليه السلام-এর সময়ে পৃথিবীতে কোন কাফির বাকি থাকবে না, শূকর হত্যা করা হবে। পৃথিবীতে শুধুমাত্র মুসলিমরাই থাকবে।

আমরা হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারি, শেষ যামানা ফিতনার যামানা। যেহেতু শেষ যামানায় অনেক ফিতনা হবে। হাদিসে এসেছে ফিতনা হবে বৃষ্টির ফোটার মত–অর্থাৎ ফিতনা অনেক ব্যাপক হবে। আর এমন ফিতনার ব্যাপকতার সময়ে আমাদের করণীয় কী হবে তা রাসুল ﷺ বলে যাবেন না এমনটা হতে পারে না। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "আমি বললাম, ঐ কল্যাণের পর আর অনিষ্টতা আছে কি? রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, জাহান্নামের দরজাসমূহে দণ্ডায়মান আহবানকারী (আহ্বান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করবে। আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই? তিনি বললেন, মুসলিমদের জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম, কিন্তু যদি তাদের কোন জামাআত ও ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে;

[111] তিরমযী- সনদ সহীহ

[112] সহীহ মুসলিম

যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।"[113] এই হাদিস থেকে আমরা কী নির্দেশনা পাই? হাদিস থেকে শিক্ষা হল- ফিতনার যুগে মুসলিমদের জামাআত এবং খলীফাহ'কে আঁকড়ে ধরতে হবে। বিচ্ছিন্ন হওয়া, আনুগত্য পরিত্যাগ করা এর সমাধান নয়। এমনটাই জানা যায় রাসুল ﷺ -এর বাণী থেকে। আবু সুলাইমান আল্লাহর রাসুলের বর্ণিত সমাধানের পথে না হেটে সে তার প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেওয়াকেই সমাধান মনে করার মাধ্যমে সে নিজেই ফিতনাগ্রস্ত হয়েছে। রাসুল ﷺ ফিতনার সমাধান দিলেন একটা আর সে ফিতনাকেই সমাধান বানালো। যদি আবু সুলাইমান দাওলাতুল খিলাফাহ'কে খিলাফাহ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলে আমরা দেখি রাসুল ﷺ -এর যামানায় মুনাফিক্বরা আল্লাহর রাসুলের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার ব্যাপারে বলেছিল,

﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ﴾

"তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ (বলে) জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।"[114] বর্তমান যুগেও অনেকেই আমাদের এই চলমান জিহাদ এবং ক্বিতালকে বৈধ জিহাদা বা ক্বিতাল মনে করে না। তাহলে তাদের এই বৈধ মনে না করার কারণে কি কুফফারদের বিরুদ্ধে আমাদের এই জিহাদ এবং এই ক্বিতাল অবৈধ হবে? আর যে এই অজুহাতে -'এটা কুরআন এবং সুন্নাহ'এ বর্ণিত জিহাদ না' - জিহাদ থেকে বসে থাকবে সে কি পাকড়াও হবে না? অবশ্যই হবে। তার পাকড়াও হওয়ার কারণ হল - কুরআন এবং সুন্নাহ'র দলিল বিদ্যমান থাকার পরে কে কী মনে করে বসে থাকল সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রিয় ভাই! আল্লাহর রাসুল ﷺ স্বয়ং যে যুদ্ধগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকেও কিছু লোক ছিল যারা জিহাদ এবং ক্বিতাল হিসেবে মেনে নিত না। তাহলে বর্তমান যুগের খিলাফাহ'কে সবাই মেনে নিবে এবং এর আনুগত্য করবে ব্যাপারটা আকাশ-কুসুম স্বপ্নের মত। যে খিলাফাহ'র আনুগত্য

---

[113] বুখারি মুসলিম

[114] সুরা আলে-ইমরানঃ ১৬৭

থেকে বেড়িয়ে যাবে তার মন্দ পরিণতির ব্যাপারে রাসুল ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়্যাতের উপর।"[115] তিনি ﷺ আরো বলেন, "যে বাইআত বিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করল।" আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه বলেন, "তোমাদের অবশ্যই উচিৎ আনুগত্য বজায় রাখা এবং জামাআতের সাথে থাকা। কারণ এটাই আল্লাহর সেই রজ্জু যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত জামাআতের মধ্যে তোমরা যা অপছন্দ কর তা বিভক্ত থেকে তোমরা যা পছন্দ করবে তার চেয়ে উত্তম।"[116]

মোদ্দাকথা হল- খলীফাহ'র বাইআত প্রত্যাহার করার কোন সুযোগ নেই। যদি কেউ বাইআত প্রত্যাহার করে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে এবং ওয়াদা ভঙ্গকারী হবে তবে যদি খলীফাহ'র মধ্যে সুস্পষ্ট কোন কুফর দেখতে পায়। সুস্পষ্ট কুফর না পাওয়া গেলে কোন অবস্থাতেই আনুগত্য বা বাইআত বর্জন করা যাবে না।

আবু সুলাইমান বাইআত দিয়েছিল এই মর্মে যে, সুস্পষ্ট কুফর না পাওয়া পর্যন্ত আনুগত্য করবে। যেহেতু সে বাইআত প্রত্যাহার করেছে তাই আমরা জানতে চাই, সে খলীফাহ'র মাঝে কী কুফর দেখতে পেয়েছে? যদি কোন কুফর দেখতে না পায় তবে সে তার ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। আর আল্লাহ খিয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না। খলীফাহ'র আনুগত্য করা 'তাআসসুব' এর মধ্যে পড়ে না। জামাআতুল কুবরা তথা খিলাফাহ'র সারিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তাআসসুব নয়। খিলাফাহ'কে পরিত্যাগ করাটা একটি দুর্ভাগ্য এবং সংকীর্ণতা। খলীফাহ'র বাইআত থেকে মুক্ত হওয়া একধরনের জাহালত।

'সবরকমের তাআসসুব (দলীয় সংকীর্ণতা)'–এই সম্বোধনের মাধ্যমে জিহাদের দাবিদার সব দলগুলোকেই আসাবিয়্যাতের আওতাভুক্ত করে ফেলল। অর্থাৎ আল-কায়দা, জেএমবি, দাওলাতুল খিলাফাহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই

115 বুখারি ও মুসলিম

116 ইবনে বাত্তালঃ আল-ইবানাত আল-কুবারা

তাআসসুবের মধ্যে রয়েছে। প্রিয় পাঠক! জিহাদ একটি ইজতিমায়ী ইবাদাত। তাহলে কারো সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত আবু সুলাইমান কিভাবে জিহাদের পথে চলবে?

আবু সুলাইমান দাওলাহ (রাষ্ট্র) কে একটি দল হিসেবে উল্লেখ করেছে। একটি রাষ্ট্র কি কখনো দল হতে পারে? সে হয়তো এতোটাই বিবেকশূন্য হয়ে গেছে যে, দাওলাহ, তানজীম, খিলাফাহ –এগুলোর মাঝে যোজন যোজন পার্থক্য থাকার পরেও সে পার্থক্য করতে ভুলে গেছে। খলীফাহ'র বাইআত উড্রো করার মাধ্যমে আবু সুলাইমান ফিসক্বের মধ্যে লিপ্ত হল। এর সাথে সাথে যদি দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছাড়াতে থাকে তবে তার অপরাধ আরো বৃদ্ধি পাবে।

চিঠির বক্তব্যঃ “তবে আমি একা নই। আহলুস সুন্নাহ'র প্রতিটি জামাআতের প্রতিটি ভাল ও কল্যাণকর কাজে আমি তাদের সাথেই আছি ও থাকব ইনশাআল্লাহ। বিশেষকরে আমি ঐ সকল শাইখদের দাওয়া ও মানহাজের সাথেই আছি যারা এই ফিতনার অবস্থাতেও নিজেদেরকে সমস্ত রকমের তাআসসুব থেকে মুক্ত রেখেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শাইখ আল ফাদিল আসীম আল-বারক্বাবী। যাকে সবাই আবু মুহাম্মাদ আল মাকদীসী নামে চিনে। বর্তমানে যদিও অনেকেই মনে করেন যে, তিনি উলামায়ে সূ- এর অন্তর্ভুক্ত।”

আবু সুলাইমান পুরো চিঠি জুড়েই সাধারণ মুসলিমদেরকে প্রতারিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিকৃত বক্তব্য দিয়েছে। সে তার এই চিঠিতে যে বক্তব্যসমূহ এনেছে সেগুলো তার ভ্রষ্টতার তুলনায় নিতান্তই কম। এপর্যায়ে এসে আবু সুলাইমান নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করেছে। সে তার খিয়ানত এবং বাইআত ভঙ্গের বিষয়টি আড়াল করতেই সে একা নয়, সে আহলুস সুন্নাহ'র সবার ভাল ও কল্যাণকর কাজের সাথে আছে বলে সবার সহমর্মিতা অর্জনের চেষ্টা করেছে। প্রকৃতপক্ষে সে একা হয়ে গেছে - যদিও তারা সংখ্যায় অনেক হয় - কারণ সে মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আল্লাহর নাবী মুহাম্মাদ ﷺ

ফিতনার[117] সময় যে কাজ করতে আদেশ করেছেন তার বিপরীত কাজ করার মাধ্যমে সে ফিতনাগ্রস্ত হয়েছে এবং একা হয়ে গেছে। দুনিয়াতে তার লাঞ্ছনার জীবন শুরু এখান থেকেই। আল্লাহ ﷻ তার অপকর্মগুলো অবশ্যই স্পষ্ট করে দিবেন– যদিও আমরা তার কুকীর্তিগুলো উল্লেখ করতে পারছি না কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে। তথাপি আহলে হক্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে মহাপরাক্রমশালী রব অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করবেন - যেমন আবু সুলাইমানের পূর্বে অনেককে করেছেন। এমন এক প্রেক্ষাপটে এসে আবু সুলাইমান বাতিলের পক্ষাবলম্বন করলো যখন বাতিল পূর্ব থেকে বেশি কদর্যতাপূর্ণ অবস্থা নিয়ে মানুষের সামনে স্পষ্ট। সে এমন এক প্রেক্ষাপটে এসে তালেবান এবং আল-কায়দার পক্ষাবলম্বন করল যখন তাদের ভ্রষ্টতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আবু সুলাইমান দাবি করেছে যে, ‘যারা নিজেদেরকে তাআসসুব থেকে মুক্ত রেখেছেন’। আসলে আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসী এবং আবু কাতাদাহ আল-ফিলিস্তিনীদের অবস্থান কখনোই নিরপেক্ষ ছিল না বা তাআসসুবের বাইরে ছিল না। বরং তারাই ছিল তাআসসুবের উৎপত্তিস্থল। তারাই এই নিকৃষ্ট দলাদলির মূল ক্রিয়নক। আবু সুলাইমান লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে কিভাবে এমন একটা মিথ্যাচার করল ভাবতেও আমাদের অবাক লাগে! সাফাহাত যখন কাউকে পেয়ে বসে তখন বুঝি আকল বুদ্ধি এভাবেই লোপ পায়। পরিপূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত কথা-বার্তা বলাটা অবশ্য তারই একার সমস্যা নয় বরং তার নব্য অনুসরণীয় শাইখ(!!)রা প্রতিনিয়তই তা করে থাকে। আবু সুলাইমান এর ছোট্ট একটি ঝলক দেখিয়েছে মাত্র। প্রিয় পাঠক! আপনারা কিন্তু অবাক হবেন না তার এই চরম মিথ্যাচার–এ। সে কেবল মাক্বদিসী এবং ফিলিস্তিনী প্রমুখদের দাওয়াহ এবং মানহাজের অনুসরণ করছে। মাক্বদিসী ছিল দাওলাহ’র বিরোধিতাকারীদের প্রথম সারির একজন। দলীয় সংকীর্ণতাকেই তারা বৈধ বানিয়েছে। দলীয় সংকীর্ণতার মূল হোতা তারাই। আহ আবু সুলাইমান! আহ! আমেরিকা ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে এবং মুজাহিদগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

117 এই ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হাদিসে বর্ণিত শেষ যামানার ফিতনা। আবু সুলাইমানের ধারণা প্রসূত ফিতনা নয়

করেছে। সেই ইরাক জিহাদ সম্পর্কেও আগেই সমালোচনা করেছে মাকৃদিসী। সেই ভুল ছোট ছিল বিধায় মুজাহিদগণ ক্ষমাসূলভ দৃষ্টিতে দেখেছেন। শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﷺ মাকৃদিসীকে উদ্দেশ্য করে তখন বলেছিলেন, “বরং দুঃখজনক বিষয় হল - আপনি এই নসীহা দেওয়ার সাক্ষাৎকারে ইনসাফ করেন নি এবং তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আপনি যথার্থরূপে স্বাধীন ছিলেন না। হে আবু মুহাম্মাদ আপনি জেনে রাখুন, আপনার উল্লেখ করা অধিকাংশ ভ্রান্ত যুক্তির বিবরণ দিতে আমি সক্ষম আর আমার এক্ষেত্রে শক্তি রয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, কঠোরতা ও অনমনীয়তা আমি এই দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সঞ্চয় করছি আমার ভাইদের বিরুদ্ধে নয়। আর এব্যাপারে আমাদের রব আমাদের আদেশ করেছেনঃ

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।”[118]

মাকৃদিসী এবং ফিলিস্তিনী মূলত কারাগার থেকে বের হয়েছেই দাওলাহ’র বিরোধিতা করার জন্য। জর্ডান আরব জোটের অন্যতম সদস্য এবং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্রুসেডারদের সক্রিয় সেবাদাতা। এমন একটি রাষ্ট্র কেন মাকৃদিসীর মত সালাফী জিহাদের মতাদর্শের(!!) লোককে মুক্তি দিবে? এমন একজনকে কেন জেল থেকে বের করবে যার সবচেয়ে কাছের ছাত্র দাওলাতুল ইসলামের একজন উল্লেখযোগ্য মুফতী? জর্ডান আরব জোটের পক্ষ থেকে শামের সাহওয়াতদের টাকা-পয়সা এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত। যুদ্ধের সামরিক দিক থেকে তারা দাওলাহ’র বিরুদ্ধে তেমন সফলতা পাচ্ছিল না। এবার তারা আদর্শিক দিক থেকে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে ফিলিস্তিনী এবং মাকৃদিসীকে মুক্তি দিল। আর এক্ষেত্রে তারা কিছুটা সফল হল। প্রথমে জেল থেকে দাওলাহ’কে গুলাত বলে তাগুতদেরকে আশ্বস্ত করেছে এবং বের হওয়ার পর মুজাহিদদেরকে গুলাত, বাগী ও মিথ্যাবাদী বলে অপবাদ দিয়েছে। আবু কাতাদাহ ফিলিস্তিনীর খারিজি এবং কিলাবু আহলিন-

[118] সুরা ফাতহঃ ২৯

নার ফাতাওয়ার মাধ্যমে সাহওয়াত দলগুলো নবউদ্যমে মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উলামায়ে সূ'দের ফাতাওয়াগুলো যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিমান এবং ট্যাংকের গোলাবর্ষণের থেকেও বেশি ক্ষতির কারণ হল। দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মাক্বদিসী সকলকে আহ্বান করেছে। ফিলিস্তিনী, মাক্বদিসীসহ নয়জন ফাতাওয়া লিখেছে যে, দাওলাহ হল দখলদার শত্রু তাই সবাই মিলে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। এভাবেই উল্লেখিত উলামায়ে সূ'রা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বাল'আমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই সমস্ত উলামায়ে সূ'রাই বর্তমান যামানার বাল'আম। মাক্বদিসীরা কাফিরদের বিরুদ্ধে ততোটা কঠোর নয় যতটা কঠোর মুসলিমদের বিরুদ্ধে। যার প্রমাণ মেলে জাবহাতুন নুসরাহ কর্তৃক জাতিসংঘের কিছু সেনাসদস্য আটক হওয়ার পর মাক্বদিসী তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে এবং ছেড়ে দেওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছে।[119] তারা যা ফায়সালা করে তা কতইনা মন্দ! একদিকে মুসলিমদেরকে দখলদার হিসেবে ফাতাওয়া দিয়ে সবাইকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করা অপরদিকে জাতিসংঘের কিছু সেনাসদস্য ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া দেওয়া–এসব বিষয় কি আমাদের সামনে সবকিছুকে স্পষ্ট করে দেয় না যে, কে কার জন্য কাজ করছে! একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, মুদুনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইকারী সবাইকে মুজাহিদ হিসেবে আখ্যায়িত করাও একটি দোষণীয় কাজ, অন্যদিকে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদরত মুজাহিদগণকে খারিজি, দখলদার, গুলাত, বাগী ও মিথ্যাবাদী–এমন আরো অনেক বিশেষণে সম্বোধিত করার মাধ্যমে জঘন্য, গর্হিত কাজ সম্পন্ন করেছে।

প্রিয় পাঠক! আপনাকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আবু সুলাইমান কিন্তু মাক্বদিসী এবং ফিলিস্তিনীদের দাওয়াহ এবং মানহাজের সাথেই আছে। মাক্বদিসী এবং ফিলিস্তিনীকে কেন কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছে তা বোঝার জন্য অনেক পাণ্ডিত্য অর্জন করার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র তার লেখনি এবং বক্তব্য পর্যালোচনা করলেই বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাদের লেখনি এবং বক্তব্যসমূহ হক্বপন্থি মুজাহিদদের নিন্দা করা এবং অপবাদ দেওয়া দ্বারা পরিপূর্ণ।

[119] এই ঘটনার পুরো ভিডিও জাবহাতুন নুসরাহ'র আল-মানার মিডিয়া থেকে প্রকাশ করা হয়।

তারা আবার সেকুলার এরদোগানকেও গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বিজয়ের পর মোবারকবাদ জানিয়েছে। কতটা হীনতা, কতটা নিচুতা!! আল-কায়দাও তো এরদোগানকে তাগুত হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু ফিলিস্তিনী ও মাক্বদিসীর হলটা কী? আর আবু সুলাইমান কিন্তু তাদের মানহাজের অনুসারী! মাক্বদিসী এবং ফিলিস্তিনী নাকি সালাফী জিহাদের প্রবক্তা! এগুলো কোন সালাফী আদর্শ? কোন সালাফগণের কাজ তাদের মত ছিল? মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব رحمه الله -এর দাওয়াতুস সালাফিয়্যাহ তাদের কর্মকাণ্ড থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। ফিলিস্তিনী, মাক্বদিসীরা তাদের নিজেদের ভ্রষ্ট আক্বীদাহগুলোকে প্রচার করে মুসলিমদের সামনে সালাফদের রেখে যাওয়া মানহাজকে কলুষিত করছে। হে আসমান ও যমীনের প্রতিপালক! আপনি মুসলিমদেরকে তাদের এই ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করুন! হে আল্লাহ! তারা আমাদের উপর যে অপবাদ আরোপ করে সে ব্যাপারে আপনিই আমাদের পক্ষ থেকে তাদের জন্য যথেষ্ট। হে দয়ালু রব! আপনার কাছেই তাদের ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলাম। আর আপনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক!

সম্মানিত পাঠক! তারা যদি তাদের কথায় সত্যবাদী হত যেমনটা তারা দাবি করে যে, তারা সালাফী জিহাদের প্রবক্তা তাহলে তারা জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করত। তারা জিহাদের কথা বলে অথচ তারা তা করছে না! আল্লাহ তা’আলা বলেন,

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

“তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়।”[120] আমি জানি নব্য আল-কায়দার অনুসারীরা এই কথার তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাবে, তাই তাদের মুখে কুলুপ এঁটে দেওয়ার জন্য আমরা একজন শাইখের বক্তব্য নিয়ে আসছি। শাইখ ইবরাহীম আর-রুবাইশ رحمه الله বলেছেন আলেমগণের শুধুমাত্র কোন মাকতাবাহ’র অধীনে ফাতাওয়া এবং দিকনির্দেশনা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা। এব্যাপারে শাইখ বলেন, “সত্যবাদী আলেমগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত প্রত্যাশী হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে। কিন্তু

120 সুরা সফঃ ০৩

জিহাদ আলেমগণের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকবে–এটা কাম্য নয়। জিহাদের ক্ষেত্রে আলেমগণের ভূমিকা কেবল মাকতাবাহ'র অধীনে ফাতাওয়া ও দিকনির্দেশনা দেওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আর না শুধুমাত্র জিহাদে উদ্বুদ্ধ করণ এবং দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং আবশ্যক হচ্ছে যুদ্ধের ময়দানে নেতৃত্ব দেওয়া এবং জিহাদের (পথের) অপছন্দনীয় বিষয়গুলো যেমন ভয়, ক্ষুধা এবং শত্রুর ধাওয়া–এগুলোর স্বাদ আস্বাদন করা।" স্বয়ং আল-কায়দার একজন শাইখ বলেছেন যে, দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমেই তাদের দায়িত্ব শেষ নয়। অবশ্যই তাদেরকে ময়দানের স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। তাই আমরা দৃঢ় কণ্ঠে বলি, যদি মাক্বদিসী, ফিলিস্তিনী প্রকৃতপক্ষে তাদের কথায় সত্যবাদী হত তবে অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে যেত। যে বা যারা কোন দিন যুদ্ধের ময়দান স্বচক্ষে দেখেনি তারাই কিনা আজ আবু সুলাইমানের অনুসরণীয় ব্যক্তি!

প্রিয় পাঠক! আপনি তো জানেন যে, যখন মানুষের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয় তখন আমাদের কী করা উচিৎ বা কাদের অনুসরণ করা উচিৎ। তথাপি উল্লেখ করছি, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক رحمه الله বলেন, "যখন মানুষের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তখন আপনারা লক্ষ্য করবেন যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখ সারিতে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গ কোন বিষয়ের উপর রয়েছে।" অর্থাৎ সম্মুখ সারির ব্যক্তিদের মতকে সঠিক বলে গণ্য করেছেন তিনি। কারণ সম্মুখ সারির যোদ্ধা তথা মুজাহিদগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"আর যারা আমাদের পথে জিহাদ করে, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।" সালাফগণের মানহাজ হল মতবিরোধের সময় সম্মুখ সারির ব্যক্তিবর্গকে অনুসরণ করা আর আবু সুলাইমানের মানহাজ হল মতবিরোধের সময় যারা একদিনের জন্যও জিহাদের ময়দানে যায়নি তাদেরকে অনুসরণীয় বানানো। আবু সুলাইমানের কর্মপদ্ধতি সালাফগণের মানহাজ থেকে বিচ্যুত কিনা তা আমার বলার অপেক্ষা রাখে না। সালাফগণের পথনির্দেশনা একটা আর আবু সুলাইমান করল ঠিক তার

উল্টোটা। পুরোপুরি পদস্খলনের আলামত। মাক্বদিসী আর ফিলিস্তিনীর মানহাজের অনুসরণের মানে হল- তারা জিহাদ না করে বসে বসে দূর থেকে মুজাহিদদের ব্যাপারে না-হক্ব মন্তব্য করে, অপবাদ আরোপ করে এবং ভ্রষ্টতামূলক ফাতাওয়া প্রদান করে–ঠিক তেমনই জিহাদ থেকে বিরত থেকে মুজাহিদদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা এবং জিহাদের সুশীল সাজার ভান করা, জিহাদ এবং মুজাহিদগণ এমন সুশীল থেকে মুক্ত।

আবু সুলাইমান দাবি করেছে যে, সে মাক্বদিসী, ফিলিস্তিনীদের মানহাজের অনুসরণ করছে। কিন্তু সে চিঠিতে বলেছে, ‘একদল মুজাহিদীন খিলাফাহ ঘোষণা করলেন’। আবু সুলাইমান এখানে দাওলাহ’র সবাইকে ‘মুজাহিদীন’ হিসেবে আখ্যায়িত করল। অথচ তার নব্য অনুসরণীয় শাইখ(!)রা দাওলাহ’কে মুজাহিদ বলতে নিষেধ করেছে। আসলে আবু সুলাইমান মাক্বদিসী, ফিলিস্তিনীদের অনুসরণের নামেও ভণ্ডামি করছে।

প্রিয় পাঠক! প্রকৃতপক্ষেই মাক্বদিসী, ফিলিস্তিনী উলামায়ে সূ’এর অন্তর্ভুক্ত। আবু সুলাইমান যতই এই সমস্ত উলামায়ে সূ’দের কর্মকাণ্ডকে সুসজ্জিত করার চেষ্টা করুক না কেন তার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে–বি-ইযনিল্লাহ। মাক্বদিসী মুওয়াহহিদ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে গিয়ে সেকুলার, গণতন্ত্রপন্থি ও মুরতাদদের পক্ষ নিয়েছে। সবাইকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফাতাওয়া দিয়েছে। দুর্বল মুসলিমদের সাহায্যার্থে যারা নুসাইরী ও অন্যান্য মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করে এবং দখলকৃত ভূমিতে আল্লাহর শারীয়াহ বাস্তবায়ন করে তাদেরকে আগ্রাসী শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শারয়ী ওয়াজিব খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার কারণে মুওয়াহহিদদের বিদ্রূপ করেছে। সে তাগুত শাসকদের অনুষ্ঠানে গিয়ে মুওয়াহহিদদেরকে অপবাদ দিয়ে দোষারোপ করেছে। মাক্বদিসী দাবি করে, সে সালাফী জিহাদের একজন প্রবক্তা(!!) যেহেতু সে একজন সালাফী জিহাদের প্রবক্তা(!) তাহলে কোথায় তার জিহাদ? কোথায় তার রিবাত-ক্বিতাল? ইলম অনুযায়ী তার আমল কোথায়? দূর থেকে বসে বসে শুধুমাত্র ফাতাওয়া দেওয়া ও দিকনির্দেশনা দেওয়াই আলেমদের একমাত্র কাজ নয়। আগ্রাসী কাফিরদের হামলাসমূহ তো মোকাবেলা করেই নি

উল্টো মুজাহিদদের নিন্দা করেছে। মাক্বদিসীরা তাগুতদের সন্তুষ্টি কামনায় শারীয়াহ ও দ্বীনের নামে তাগুতদের লাঠিতে পরিণত হয়েছে। এ সকল কারণেই তাকে উলামায়ে সূ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যদি তার ইলমের কারণে সে উলামায়ে সূ' না হয়ে থাকে তাহলে আমি বলব, বাল'আমও অনেক ইলমের অধিকারী ছিল তথাপি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র দু'আ করার মাধ্যমে কাফিরদের সাহায্য করেছে–আর একারণে তার ব্যাপারে কুরআনে আমাদের রব কী বলেছেন? তা সবারই জানা আছে। বাল'আমের পাণ্ডিত্য কোন কাজে আসেনি। ইলম অর্জন করা এবং পাণ্ডিত্য অর্জন করা মূল বিষয় নয়। মূল বিষয় হল ইলম অনুযায়ী আমল করা। সুতরাং মাক্বদিসী এবং ফিলিস্তিনীরা উলামায়ে সূ'এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের ইলমই তাদের বিরুদ্ধে দলিল হবে–ইনশা'আল্লাহ।

সম্মানিত ভাই! আমরা আপনাদের সামনে একটা বিষয় বারংবার স্পষ্ট করেছি যে, আবু সুলাইমান তার প্রোপাগান্ডামূলক এই চিঠিতে অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে। বাস্তবতা বিবর্জিত অনেক কথা বলেছে। তার ভ্রষ্টতা এবং কুকর্ম যেন মুসলিমদের সামনে পরিপূর্ণ স্পষ্ট না হয় এর জন্য সে বিংশ শতাব্দীর জিহাদের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বর্তমান ক্রুসেডের বর্বর হামলা রুখে দেওয়ার অগ্রনায়ক আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী رحمه الله -এর একটি বক্তব্যের পূর্ব পর কাটছাঁট করা একটি অংশ নিয়ে এসেছে। আল-কায়দার কোন একটি লেখনিতে আবু সুলাইমান শাইখ আবু মুসআব যারক্বাওয়ী رحمه الله -এর আংশিক বক্তব্যটুকু পেয়েছে অথবা যাদের কাছে তার বিবেক, জ্ঞান-বুদ্ধি ইজারা দিয়েছে তারা তাকে তা দেখিয়ে দিয়েছে। আর আবু সুলাইমান আগ-পিছ কিছু না ভেবেই এটাকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছে। অন্য কোন বইয়ে কাটছাঁট করা বক্তব্য উল্লেখ করাটা আবু সুলাইমানের দেউলিয়া হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এবং বক্তব্যের উক্ত অংশটুকু উল্লেখ করার মাধ্যমে তার ভণ্ডামি আরো নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। ইরাক যুদ্ধের শুরুর দিকে মাক্বদিসী আল-জাজিরা চ্যানেলকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে মাক্বদিসী আমীরুল ইস্তিশহাদিয়্যীন আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী رحمه الله সহ অন্যান্য মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। পৃথিবীর মুসলিমদের সামনে ইরাকের জিহাদকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন

করেছে। মাক্বদিসী তার সাক্ষাৎকারে মুসলিম যুবকদেরকে ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার আহ্বান করেছিলো এবং বলেছিল অচিরেই ইরাক মুজাহিদদের জন্য স্বশাসনে পরিণত হবে। অথচ মুজাহিদ শাইখরা ইরাক জিহাদের ব্যাপারে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি শাইখ উসামা ﷀ কসম করে বলেছিলেন যদি তিনি ইরাকে যাওয়ার সুযোগ পেতেন তাহলে ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। আল-জাজিরা চ্যানেলকে দেওয়া ঐ সাক্ষাৎকারে মাক্বদিসী এই ধরনের আরো অনেক অপপ্রচার চালিয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের অপবাদ আরোপ করেছে তৎকালীন জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর। মাক্বদিসীর এই সাক্ষাৎকারে সেকুলাররা, সাহওয়াতরা অনেক খুশি হয়েছিল। আর শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﷀ তার উক্ত বক্তব্যের প্রতিউত্তর হিসেবে একটি সংশয় নিরসনমূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন ২০০৫ সালের ১২ ই জুলাই। আবু সুলাইমান সেই বক্তব্যের পূর্ব-পর কাটছাঁট করা একটু অংশ উল্লেখ করেছে। উক্ত অংশটুকু উল্লেখ করার মাধ্যমে বুঝাতে চেষ্টা করেছে যে, তার নব্য অনুসরণীয় শাইখ(!) মাক্বদিসী অনেক ভালো লোক। যেখানে শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﷀ উক্ত বক্তব্যই দিয়েছেন মাক্বদিসীর বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য। আর সেই বক্তব্যটাই তাকে হক্ব সাব্যস্ত করার জন্য নিয়ে আসাটাই আবু সুলাইমানের বোকামি হয়েছে। যাইহোক এবার চলুন শাইখ যারক্বাওয়ী ﷀ-এর বক্তব্যের কয়েকটি অংশ উল্লেখ করি–যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেন আপনারা সবাই বুঝতে পারেন যে, শাইখ যারক্বাওয়ী ﷀ কী বুঝাতে চেয়েছেন।

প্রিয় ভাই! তাগুতদের চ্যানেলগুলোতে মাক্বদিসীর দেয়া সাক্ষাৎকারসমূহ কখনোই মুসলিমদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনি। বরং এই সাক্ষাৎকারগুলো মুসলিমদের জন্য নানাবিধ ক্ষতির কারণ হয়েছে। শুধু যে ২০১৫ সালে জর্ডানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারের কথা বলছি এমন নয়। ২০১৫ সালে যেমনিভাবে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকমের মিথ্যাচার করেছে এবং দাওলাহ’র উমারাগণকে ও দাওলাহ’কে বিকৃতভাবে মিডিয়ার সামনে উপস্থাপন করেছে, ঠিক একই কাজ করেছিল এর থেকে আরো দশ বছর পূর্বে যখন ইরাকের জিহাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন

আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী ﷺ - তখন ইরাকের জিহাদ এবং এর উমারাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করার কারণে যারক্বাওয়ী ﷺ বলেছিলেন, "হে শাইখ আল-ফাদিল! এই সাক্ষাৎকারটি আমার ততোটা ক্ষতি করেনি যতটা ক্ষতি করেছে এই জিহাদের।" শাইখ যারক্বাওয়ীর এই বক্তব্য দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, মাক্বদিসীর মাধ্যমে শুরুর দিকেই ইরাক জিহাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সেই সময়ে ইরাকে মুজাহিদদের বিরোধীরা মানুষদেরকে জিহাদের সারিতে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য মাক্বদিসীর এই সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে। কত মিল পাওয়া যায় সেই সময়ের মাঝে আর বর্তমান সময়ের মাঝে! আজ থেকে অনেক বছর পূর্বে মাক্বদিসীর বক্তব্যকে মুজাহিদদের সারিতে যোগদানে বিরত রাখার জন্য ব্যবহার করেছিল সাহওয়াতরা, মুরতাদরা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এমনকি রাফিদীরাও। ঠিক বর্তমানেও আবার সেই মাক্বদিসীর বক্তব্যকে দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা হিসেবে ব্যবহার করেছে পথভ্রষ্টরা, সাহওয়াতরা, মুরতাদরা এমনকি জর্ডানের তাগুত শাসকসহ অন্যান্যরাও। তারা মাক্বদিসীর বক্তব্য ব্যবহার করছে আদর্শিক যুদ্ধের অংশ হিসেবে। সুতরাং আমরা সবাইকে জানাচ্ছি যে, মাক্বদিসী পূর্বেও এমন বক্তব্য দিয়েছে যা কুফফারদের, সাহওয়াতদের এবং মুরতাদদের খুশি করেছে। আমাদের শাইখ যারক্বাওয়ী বলেন, "হে আবু মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে সুসংবাদ জানাতে চাই যে, ক্রুসেডাররা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা, রাফিদীরা, হিযবুল ইসলামী এবং ইরাকের জাহমিয়্যাহ ও মুরজিয়ারা এই 'সাহায্যমূলক সাক্ষাৎকার' মানুষের মাঝে বিতরণ করছে, যাতে তারা মানুষদেরকে মুজাহিদদের কাফেলায় যোগদান করা থেকে বিরত রাখতে পারে।" বর্তমানে আমরা দেখছি যে, মাক্বদিসীর ফাতাওয়া নিয়েই অনেকে দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। মুজাহিদদের সারি বিভক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তার ফাতাওয়ার প্রভাবও রয়েছে। এই বিষয়টা ২০১৫ সালে প্রথম হয়েছে ব্যাপারটা এমন নয়। অনেক আগেই এই রোগের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। এজন্যই যারক্বাওয়ী ﷺ তাকে মুজাহিদদের সারি বিভক্ত করার কারণ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। যারক্বাওয়ী ﷺ বলেন, "আপনি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন। নচেৎ আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। তাই হে শাইখ! আপনি আল্লাহর শত্রুদের চক্রান্ত থেকে সতর্ক থাকুন এবং

তারা আপনাকে মুজাহিদদের সারি বিভক্ত করার জন্য ক্রমান্বয়ে নিয়ে আসা থেকে সতর্ক থাকুন!” দূরদর্শী আবু মুসআব ঠিকই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, শত্রুরা মাক্বদিসীকে ব্যবহার করতে পারে। তাই তিনি তাকে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু মাক্বদিসী সেই কাজগুলোই করছে যে ব্যাপারে ২০০৫ সালে শাইখ আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ী সতর্ক করেছিলেন। আফসোস মাক্বদিসীর জন্য তিনি সংশোধন না হয়ে মন্দ পরিণতির দিকেই আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন।

ইরাকের মুজাহিদদের ব্যাপারে বক্তব্য দিতে গিয়ে মাক্বদিসী কখনোই ইনসাফের সাথে কথা বলেনি। আবু মুসআব আয-যারক্বাওয়ীর আমল থেকে নিয়ে দাওলাতুল খিলাফাহ পর্যন্ত সবসময়ই সে মুজাহিদদের ব্যাপারে বাড়াবাড়িমূলক কথা বলে গেছে, মিথ্যাচার করেছে। মাক্বদিসী আল-জাজিরা চ্যানেলের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুজাহিদদের নাসীহা করেছে! মুজাহিদদের নাসীহা করার কি এটাই ত্বরিক্বা? এভাবে নাসীহা করার দ্বারা কি মুসলিমরা উপকৃত হয়েছে? নাকি কাফির মুরতাদরা উপকৃত হয়েছে? নাসীহার নামে দেয়া মাক্বদিসীর বক্তব্যগুলো মুসলিমদের হৃদয় বিদীর্ণ করেছিল। নাসীহার নামে ও সাহায্যের নামে মাক্বদিসী যে বক্তব্যগুলো দিয়েছিল তা ইনসাফপূর্ণ ছিল না। এমনটাই বলেছেন শাইখ যারক্বাওয়ী। তিনি বলেন, “বরং দুঃখজনক বিষয় হল আপনি নাসীহা দেওয়ার সাক্ষাৎকারে ইনসাফ করেন নি এবং তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আপনি যথার্থরূপে স্বাধীন ছিলেন না। হে আবু মুহাম্মাদ আপনি জেনে রাখুন, আপনার উল্লেখ করা অধিকাংশ ভ্রান্ত যুক্তির বিবরণ দিতে আমি সক্ষম আর এক্ষেত্রে আমার শক্তি রয়েছে। কিন্তু এই শক্তি, কঠোরতা ও অনমনীয়তা আমি এই দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে সঞ্চয় করছি আমার ভাইদের বিরুদ্ধে নয়। আর এব্যাপারে আমাদের রব আমাদের আদেশ করেছেনঃ

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ﴾

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল; আর তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, তাদের

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[121] জর্ডানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বর্তমান দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে মাক্বদিসীর মিথ্যাচার করা এবং প্রোপাগান্ডা চালানো দেখে অনেকে অবাক হলেও প্রকৃতপক্ষে যারা তার ব্যাপারে জানেন তারা অবাক হননি। কারণ এর পূর্বে মাক্বদিসী আমাদের মহান অগ্রজ, যামানার সালাহউদ্দীন আইউবী শাইখ আবু মুসআব ﷾ -এর সাথে এমনই করেছিল। আমরা চাইলে মাক্বদিসীর বক্তব্য রদ করার জন্য লিখতে পারি কিন্তু আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে তা কুফফারদের জন্য সঞ্চয় করছি। আর এটা মাক্বদিসীর বক্তব্যের খণ্ডন করার স্থান নয়। (সুযোগ পেলে তার ব্যাপারে বিস্তারিত লিখবো ইনশা'আল্লাহ)।

চলুন এখন আবু সুলাইমানের উল্লেখ করা অংশটুকুর আলোচনায় প্রবেশ করি। সে শাইখ যারক্বাওয়ী ﷾ -এর বক্তব্যের এই লাইন 'কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে আপনার প্রতি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে আমি নই' উল্লেখ করেছে কিন্তু এর সাথেই যে আরো বক্তব্য আছে তা উল্লেখ করেনি। এই গোঁজামিল কেন? আগে পরের এবং মাঝের লাইনগুলো বাদ দিয়ে সে কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়? আবু সুলাইমানের চিঠিতে উল্লেখিত 'পরিশেষে বলতে চাই'–এর পূর্বে একটি বাক্য ছিল, যা আবু সুলাইমান বাদ দিয়েছে। বাদ দেওয়া বাক্যটি হল- 'কেন আপনি আপনার ভাইদের বিরুদ্ধে শত্রুদের জন্য পথ তৈরি করে দিলেন?' আবু সুলাইমান এই বাক্যটি বাদ দিয়েছে যেন সে কাঙ্ক্ষিত প্রোপাগান্ডা চালাতে পারে। এক্ষেত্রে সে তার নব্য অনুসরণীয় শাইখ(!) মাক্বদিসীর অনুসরণ করেছে। তাদের (تابع এবং متبوع) কাজই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থাকে গোপন করে বিকৃত অবস্থা মানুষের সামনে প্রকাশ করা। এ যাত্রায় আবু সুলাইমান চরমভাবে ফেঁসে গেছে–ওয়ালিল্লাহিল হামদু ওয়াল-মিন্নাহ। এখানেই শেষ নয়, আবু সুলাইমান চিঠিতে যে অংশটুকু নিয়েছে তা হল শাইখ যারক্বাওয়ী ﷾-এর বক্তব্যের একেবারে শেষাংশ। সে শাইখ যারক্বাওয়ীর বক্তব্যের শেষের একটি বাক্য বাদ দিয়েছে। তা হল- 'শাইখ যা বলেছেন তা যদি গুরুতর না হত এবং এর কারণে জিহাদ ও মুজাহিদদের উপর ধারাবাহিক মন্দ প্রভাব না পড়ত

[121] সুরা ফাতহঃ ২৯

তাহলে এই প্রতিউত্তর দেওয়া হত না'।

আবু সুলাইমান যে বাক্যগুলো বাদ দিয়েছে সেগুলো বাদ না দিয়ে উল্লেখ করলেই তার গোমর ফাস হয়ে যেত। একজন মানুষ কতটা দেউলিয়া হলে এক উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্যকে আগে-পরে এবং মাঝে কাটছাঁট করে বিপরীত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য নিয়ে আসতে পারে! কতটা হীনতা! কতটা নিচুতা! আফসোস আবু সুলাইমানের জন্য! আবু সুলাইমান তার ভ্রষ্টতাকে যে বক্তব্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে সেই বক্তব্যটুকু কতটা বিকৃত করেছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এই কাজের মাধ্যমে আজ যেমন সে লজ্জিত হচ্ছে ঠিক তেমনই আল্লাহর কাছে ক্ষমা না চাইলে ক্বিয়ামত দিবসেও এর থেকে অনেক বেশি লজ্জিত হবে। আমরা এই সমস্ত উলামায়ে সূ' ও তাদের অনুসারী–যারা মুসলিমদেরকে কথা ও কাজের মাধ্যমে কষ্ট দেয় তাদের বিরুদ্ধে পরাক্রমশালী মহান রবের দরবারে বিচার দায়ের করে রাখলাম। আল্লাহ আপনিই এদের ব্যাপারে আমাদের জন্য যথেষ্ট। পরিশেষে বলি, কার সূচনা কেমন হলো সেটা বিবেচ্য বিষয় নয় বরং কিভাবে তার সমাপ্তি ঘটলো, শেষ পর্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিল কিনা এবং দ্বীনের উপর অটল ছিলো কিনা–সেটাই হলো বিবেচ্য বিষয়।

আমরা জিহাদের এই দীর্ঘ পথে অনেককেই দেখেছি যাদের শুরুর অবস্থা ভালো ছিল কিন্তু যখন তাদের উপর ভ্রষ্টতা জেঁকে বসেছে তখন তারা ধীরে ধীরে হক্বের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এইতো সাইয়াফ–যার অধীনে আব্দুল্লাহ আযযামের মত মহান শাইখ আফগানে জিহাদ করেছেন, যাকে আব্দুল্লাহ আযযাম 'আমীরুল জিহাদ' উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন সেই সাইয়াফের অবস্থা পরবর্তীতে কী–হয়েছে তা আমাদের সকলেরই জানা। বুরহান উদ্দীন রব্বানী–ইলম ও জিহাদে যার দাড়ি শুভ্র হয়েছে তার ব্যাপারেও তো শাইখ উসামা رحمه الله রিদ্দাহ'র হুকুম দিয়েছেন। আর আমরা আল-কায়দার সদস্যদেরকেও দেখেছি, তারা ভ্রষ্টতার প্রতীক হিসেবে আবু হাফস আল-মরুতানীকে উল্লেখ করতে ভুল করে না। আপনি কি জানেন, এই আবু হাফস আল-মরুতানী কে? সে আল-কায়দার কেন্দ্রীয় শুরা বোর্ডের একজন সদস্য ছিল, ছিল আল-কায়দার শারয়ী বোর্ডের প্রধান। কিন্তু তার

অবস্থা পরবর্তীতে কী হয়েছে? ভ্রষ্টতার প্রতীক হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যাদের অবস্থা এক সময় ভালো ছিল, পরবর্তীতে তারা পদস্খলিত হয়েছে। মাক্বদিসী তো জিহাদের ময়দানে কোন দিন মুজাহিদদের সাথে শামিল হয়নি, আর না ময়দানের ফিতনা দ্বারা কোন দিন পরীক্ষিত হয়েছে। বরং যাদের নেতৃত্বে ময়দানে জিহাদ চলত, এক সময় শত্রু যাদের কারণে পালিয়ে বেড়াতো তাদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ পরবর্তীতে হক্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাই শুরুর অবস্থা দ্বারা কোন ব্যক্তিকে মূল্যায়ন করাটা কেবলই বোকামি। বরং মূল্যায়ন হবে ব্যক্তির শেষ অবস্থা দ্বারা।

চিঠির বক্তব্যঃ আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, “যে আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না.... সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”

আমরা পূর্বেও বলেছি আবু সুলাইমান তার নিজের হীন উদ্দেশ্য আড়াল করার জন্য বক্তব্যের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে সাধারণ মুসলিমদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এক্ষেত্রে আবু সুলাইমান রাসুল ﷺ -এর হাদিসকেও ছাড় দেয়নি। হাদিসের মূল দু’টি অংশের একটি উল্লেখ করে বাস্তবতাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেছে। ডাক্তারকে পৃথিবীর সকল মুজাহিদগণ জিহাদের অগ্রগামী নেতা মনে করতেন। ধরেই নিলাম ডাক্তার সাহেব বড়, কিন্তু হাদিসে রাসুল ﷺ তো বলেছেন, “যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং যে আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।” তাহলে রাসুল ﷺ বলেছেন, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না সেও আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর আমরা জানি ডাক্তার যাওয়াহিরী এবং আল-কায়দা প্রথমে দাওলাহ’র উপর জুলুম করেছে। ডাক্তার যাওয়াহিরী-ই প্রথম দাওলাহ’কে খারিজি বলেছে। যখন যাওয়াহিরী দাওলাহ’কে খারিজি বলেছে তখনও দাওলাহ যাওয়াহিরীকে সম্মান-শ্রদ্ধা দিয়ে কথা বলেছে—যা শাইখ আদনানী رحمه الله -এর "عذرا أمير القاعدة" শিরোনামে বক্তব্যই বড় প্রমাণ। আর যে শুরু করে সে-ই অধিক জুলুমকারী। মাক্বদিসী তো কারাগারে থেকেই দাওলাহ’কে গুলাত (সীমালঙ্ঘনকারী) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। শাইখ তুর্কী বান’আলী رحمه الله অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধা দিয়ে মাক্বদিসীকে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু

মাক্বদিসী মূল বাস্তবতা না জেনে কারাগারে থাকা অবস্থায় দাওলাহ’র উপর জুলুম করেছে। আবু সুলাইমান তো তাদের অনুসারী হয়ে গেছে যারা ছোটদের উপর জুলুম করে। আবু সুলাইমান তো তাদের অনুসারী হয়ে গেছে যাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন , “যে ব্যক্তি কুরাইশদেরকে অপদস্ত করার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাকে অপদস্ত করবেন।”[122] নাবী ﷺ আরো বলেন, “যে ব্যক্তি কুরাইশদের অপমান করবে আল্লাহ তাকে অপমান করবেন।”[123] আমরা জানি যে, আমীরুল মু’মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী হাফিযাহুল্লাহ ছিলেন কুরাইশী, তার শুরার বোর্ডের প্রায় ৩ জন ছিলেন কুরাইশী। আর যারা কুরাইশীদের অপমান করেছে এবং এখনো করছে আবু সুলাইমান তাদেরই অনুসারী হয়ে গেছে। হে আবু সুলাইমান! হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওয়া থেকে সতর্ক হোন!

চিঠির বক্তব্যঃ “আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা জিহাদ, হিজরত, রিবাতে, আমর বিল মা’রুফ ও নাহি আনিল মুনকারে অগ্রপথিকদের নাম দিয়েছিলো সাফিহুল উম্মাহ, আল আহমাকুল মুতা’ অথবা উলামায়ে সু।”

আল্লাহ আবু সুলাইমানকে ক্ষমা করুন! সে তাদের অনুগামী হয়ে গেছে যারা জিহাদ থেকে বসে থেকে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া দেয়। আল্লাহ আবু সুলাইমানকে ক্ষমা করুন! সে তাদের অনুসারী হয়ে গছে যারা রাসুল ﷺ -এর নাতীকে অপমান করেছে। আল্লাহ আবু সুলাইমানকে ক্ষমা করুন! সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যারা কুরাইশী খলীফাহ’কে খারিজি, সীমালঙ্ঘনকারী ও আগ্রাসী শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে। আবু সুলাইমানকে আল্লাহ ক্ষমা করুন! সে ঐ ব্যক্তিদের অনুসারী হয়েছে যাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, “যতদিন কুরাইশরা দ্বীন কায়েম করবে ততদিন খিলাফাহ ও শাসন ক্ষমতা কুরাইশদের হাতেই থাকবে। এ বিষয়ে যে-ই তাদের সাথে শত্রুতা করবে আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে

---

122 মিশকাত ৫৯৮৮ সনদঃ সহীহ

123 আহমাদ

নিক্ষেপ করবেন।" আল্লাহ আবু সুলাইমানকে ক্ষমা করুন! সে তাদের অনুসারী হয়ে গেছে যারা এমন ব্যক্তিদেরকে খারিজি ও পথভ্রষ্ট অপবাদ দিয়েছে যাদের ব্যাপারে শাইখ উসামা رحمه الله বলেছিলেন, "মানুষের মাঝে তারাই হচ্ছে হক্বের অধিক নিকটবর্তী।"[124] আবু সুলাইমানকে আল্লাহ ক্ষমা করুন! সে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে যাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (বৈধ শাসকের) আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না।" আল্লাহ আবু সুলাইমানকে ক্ষমা করুন! সে একজন বৈধ খলীফাহ'র বাইআত ভঙ্গ করে একজন স্বীকৃত 'সাফীহ' এর অনুসারী হয়ে গেছে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে উত্তম প্রতিদান দান করুন যিনি ডাক্তার যাওয়াহিরীর অসংখ্য সাফাহাতের দরুন তাকে 'সাফীহুল উম্মাহ' ভূষণে ভূষিত করেছেন। এটা কি যাওয়াহিরীর সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত নয় যে, জুলানী তার আমীর বাগদাদীর বাইআত ভঙ্গ করা ও তার সাথে গাদ্দারী করার পর যখন যাওয়াহিরীকে বাইআত দিল তখন সানন্দে যাওয়াহিরী তার বাইআত গ্রহণ করে নিল, কিন্তু দিন কয়েক পর যখন জুলানী যাওয়াহিরীকে পদাঘাত করে তার বাইআত ভঙ্গ করল তখন ডাক্তার যাওয়াহিরী বলতে লাগল জুলানী খিয়ানতকারী এবং বাইআত ভঙ্গ করা কবিরাহ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইতোপূর্বে জুলানী যখন তার আমীর আবু বকর আল-বাগদাদীর বাইআত ভঙ্গ করেছিল তখন সেটা যাওয়াহিরীর নিকট কবিরাহ গুনাহ ও খিয়ানত ছিল না, কিন্তু এই জুলানী-ই যখন তার বাইআত ভঙ্গ করল তখন সেটা কবিরাহ গুনাহ ও খিয়ানত হয়ে গেল—এ কেমন দ্বিমুখিতা?!

ডাক্তার যাওয়াহিরীর সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত কি এটা নয় যে, একটি স্বাধীন দাওলাহ তথা রাষ্ট্রকে নিজের অধীনস্থ ঘোষণা করা, অথচ ডাক্তার যাওয়াহিরী নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ, ইমারাতে আফগানিস্তান আল-ইসলামিয়্যাহ এবং আমি এই দু'টির সাথে ক্বাওকাযের ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ'কে যুক্ত করছি—এই ইসলামী ইমারাতগুলো একজন শাসকের অধীনস্থ নয়। আশা করা যাচ্ছে অতি দ্রুতই খিলাফাহ'র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে

124 আস-সাবীল লি-আহবাতিল মুআমারাত

যে রাষ্ট্র এই তিন ইমারাহ'কে এবং সকল মুসলিমদেরকে একত্রিত করবে।"[125] ডাক্তার যাওয়াহিরী একই সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "মোল্লা মুহাম্মাদ ওমার (হাফিঃ) হলেন আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়্যাহ'র আমীর। আর মুজাহিদদের মধ্য থেকে যে এই ইমারাতের সাথে যুক্ত হয় সে এবং শাইখ উসামা বিন লাদিন (হাফিঃ) মোল্লা উমারের একজন সৈনিক।"[126] ডাক্তার যাওয়াহিরীর বক্তব্য থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হল - তিনটি ইসলামী ইমারাত রয়েছে, যেগুলো কোন একজন শাসকের অধীনস্থ নয়। আর শাইখ উসামা رحمه الله মোল্লা ওমার رحمه الله -এর একজন সৈনিক। তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, না মোল্লা ওমার এবং না শাইখ উসামা দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আমীর ছিলেন। হঠাৎ করে কিভাবে ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র আমীর দাবি করে বলল, দাওলাহ'র মূল আমীর হচ্ছে মোল্লা ওমার! এর চেয়ে বড় সাফাহত আর কী হতে পারে—যার পূর্বের এবং পরের বক্তব্য সাংঘর্ষিক?!

এমন ব্যক্তি কি সাফীহ নয়, যে নিজের সৈনিকদের হত্যাকারীর বিপদাপদ দূর হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করে।

ঐ ব্যক্তি তো অবশ্যই সাফীহ, যে একটি সেকুলার দলকে সরকার গঠন করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে নিজের সৈনিকদেরকে আদেশ করে। তিউনিসিয়ায় আল-কায়দা বিলুপ্ত হওয়ার দায় কেবলই ডাক্তার যাওয়াহিরীর। আন-নাহদা পার্টি যখন ক্ষমতায় আসে যাওয়াহিরী তখন আল-কায়দার তিউনিসিয়া শাখাকে কোন ধরনের হামলা না করার আদেশ করে। পাশাপাশি সরকার গঠনের জন্য আন-নাহদা পার্টিকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আদেশ করে। আন-নাহদা পার্টি যে একটি সেকুলার সংগঠন সেটা স্বয়ং ডাক্তার যাওয়াহিরী স্বীকার করেছেন। আর তিউনিসিয়ার আমীর আবু ইয়াদ সৈনিকদেরকে নাহদা পার্টির হাতে তুলে দিয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লিবিয়াতে পালিয়ে যায়। যাওয়াহিরীর

---

125 লিক্বা আল-মাফতূহঃ আল-হালাক্বাতুস সানিয়াহ

126 লিক্বা আল-মাফতূহঃ আল-হালাক্বাতুস সানিয়াহ

এই সাফাহতমূলক আদেশের পরে তিউনিসিয়ায় আল-কায়দা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এটা তো অবশ্যই সাফাহাতের অন্তর্ভুক্ত যে, জাতীয়তাবাদী ও সেকুলার দলগুলোর সাথে জোট করে সরকার গঠনের আদেশ করা। যাওয়াহিরী এই কাজটি-ই করেছে লিবিয়াতে, শামে, মালিতে এবং তিউনিসিয়ায়। যাদের লড়াইয়ের ভিত্তি-ই হচ্ছে একটি জাতীয়তাবাদী বা সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের সাথে কিভাবে আল-কায়দা জোট গঠন করে? শাইখ উসামা ﷺ -এর জীবদ্দশায় আল-কায়দার কোন শাখাকেই এমন করতে দেখা যায়নি। এটা শাইখ উসামার মানহাজও ছিল না। কারণ শাইখ উসামা জোট করতেন ঈমান ও আক্বীদাহ’র ভিত্তিতে যাওয়াহিরীর সাফাহাত প্রসূত মাসলাহার ভিত্তিতে নয়। ডাক্তার যাওয়াহিরীর এই সাফাহাতের কারণেই আজ শামে আল-কায়দা নিশ্চিহ্নের পথে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে লিবিয়া থেকে, হয়েছে তিউনিসিয়ায়। আল-কায়দার এ সমস্ত অপকর্মের পিছনে একটি উক্তি সবসময়-ই লক্ষ্য করা যায় তা হল- এগুলো করা হয়েছে ডাক্তার যাওয়াহিরীর আদেশে বা দিকনির্দেশনায়।

ডাক্তার যাওয়াহিরীর উল্লেখযোগ্য সাফাহাতের একটি হল- ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাতুল ইসলামের মাঝে বাথ পার্টির সাবেক কিছু অফিসার -যারা শাইখ যারক্বাওয়ী এবং শাইখ আবু আনাস আশ-শামীর কাছে পূর্বের কুফর থেকে তাওবা করেছে - তারা থাকার কারণে দাওলাহ’র নেতৃত্ব শারয়ীসিদ্ধ ও খিলাফাহ শারয়ীসিদ্ধ না হওয়ার অভিযোগ তুলেছে। অথচ স্বয়ং যাওয়াহিরীর শুরাতেই সাইফ আল-আদেলের মত সাবেক মিসরী আর্মির অফিসার রয়েছে। বাথ পার্টির সাবেক অফিসার দাওলাহ’র মাঝে থাকার কারণে যদি যাওয়াহিরীর নিকট দাওলাহ’র নেতৃত্ব শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ হয় তাহলে ডাক্তারের প্রণীত উসুলের (?) আলোকে তার শুরাতে সাইফ আল-আদেল থাকার কারণে তার শুরাও শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। এমনকি শাইখ আবু সুফিয়ান সাইদ আশ-শেহরী যিনি আলে সৌদের এলিট ফোর্সের একজন সদস্য ছিলেন, তিনি আল-কায়দার ইয়েমেন শাখার নেতৃত্বে থাকার কারণে উসুলে যাওয়াহিরীর আলোকে ইয়েমেন আল-কায়দার নেতৃত্বও শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ ছিল। বাঙ্গালী আল-কায়দার নেতৃত্বে বাংলাদেশ

তাগুত সেনাবাহিনীর সাবেক অফিসার মেজর জিয়া থাকার কারণে উসুলে যাওয়াহিরী অনুযায়ী আনসার আল-ইসলামের নেতৃত্ব শারয়ী দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা জানি যে, মেজর জিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত আনসার আল-ইসলামের সামরিক শাখার প্রধান ছিলেন। আর তার অধীনেই বাংলাদেশে আনসার আল-ইসলামের সামরিক কাজ হয়েছে। উসুলে যাওয়াহিরী অনুযায়ী এই অঞ্চলে আল-কায়দার সামরিক কাজগুলো একজন শারীয়াহ বহির্ভূত নেতার অধীনে হয়েছে। এই ধরনের মূলনীতি (?) কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি তার সাফাহাতের দরুন-ই বলতে পারে।

ডাক্তার যাওয়াহিরীর উপর হিকমতের চেয়ে সাফাহাত প্রাধান্য পাওয়ার কারণেই দাওলাতুল ইসলামের বিরোধিতায় যাওয়াহিরী আত্মনিয়োগ করেছে। শামের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য যখন দাওলাতুল ইসলাম শামে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তখন এই ডাক্তার যাওয়াহিরী দাওলাহ’র অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দিয়ে দাওলাহ’কে ইরাকে ফিরে আসার আহ্বান করেছে। আর দাওলাহ তার এই অযৌক্তিক আহ্বানে সাড়া না দেওয়ার কারণে যাওয়াহিরী দাওলাহ’র বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে। ডাক্তার যাওয়াহিরীর এই সাফাহতমূলক অযৌক্তিক বক্তব্যের জবাব দিয়েছিলেন শাইখ আব্দুল মাজীদ আল-হাতারী আর-রিমী[127] ﷺ - তিনি যাওয়াহিরীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, “কেন বাকি সংগঠনগুলো ছাড়া কেবল দাওলাহ’কে ইরাকে ফিরে যেতে হবে এবং কেন অন্যান্য সংগঠনের জন্য নিজ দেশে ফিরে যাওয়া আবশ্যক নয়? আপনার এই নাসীহা কেন দাওলাহ ব্যতীত অন্যান্য জিহাদী সংগঠনকে উদ্দেশ্য করে না–যে সংগঠনগুলো হয়তো গণতন্ত্রের শাসনে পথ চলার মনস্থ করে নতুবা উপসাগরীয় সংস্থার সাথে মিত্রতা করে? আর কেনইবা এই সকল সংগঠন যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে না?”

শামে সাহওয়াতদের মধ্যে বিভিন্ন মতের ও চিন্তার লোক ছিল। কেউ সেকুলার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, কেউ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অথবা

127 আব্দুল মাজীদ আল-হাতারী আর-রিমী হলেন ইয়েমেনের একজন প্রসিদ্ধ সালাফী আলেম। যিনি শাইখ আহমাদ মুসা জিবরীল (হাফিঃ) -এর শিক্ষক এবং তার পিতার বন্ধু।

কেউ নাগরিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লড়াই করছিল, এরা সকলেই দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কিন্তু যাওয়াহিরী এই ধরনের দলের সাথেও হাত মিলিয়ে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। দাওলাহ যখন খিলাফাহ ঘোষণা করল তখন সাফাহাতের দরুন যাওয়াহিরী একজন মৃত ব্যক্তির বাইআত নবায়ন করে বিরোধিতা করতে লাগল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যখন সত্যবাদী মুওয়াহহিদগণ খলীফাতুল মুসলিমীনকে বাইআত প্রদান করলেন তখন যাওয়াহিরী খারিজি দমনের স্লোগান তুলে প্রতিটি অঞ্চলে দাওলাহ’র বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল। কিন্তু আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা এই মাজলুম দাওলাহ’কে আল্লাহ-ই সাহায্য করেছেন। তাই তো এই দাওলাহ আজ অব্দি টিকে আছে নববী মানহাজের উপর। এই দাওলাহ টিকে আছে উসামা, আবু মুসআব আর আবু ওমারের মানহাজের উপর।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! প্রত্যেক যামানাতেই হক্বপন্থিদেরকে বিভিন্ন প্রকারের অমূলক অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এটা কালের পরিক্রমায় সব যুগেই লক্ষ্য করা যায়; হক্বপন্থিদের সাথে ঘটা এক অবধারিত রীতি। এই অপরিবর্তিত রীতিরই সত্যায়ন পাওয়া যায় ওরাকা ইবনে নাওফেলের বাণী থেকে যা তিনি নাবী কারীম ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, “আপনি যা নিয়ে এসেছেন –এর অনুরূপ যে ব্যক্তিই নিয়ে এসেছে তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে।” এভাবেই যুগের পরিবর্তন হয়। নাবী রাসুলগণের পরে তাদের উম্মাতের মধ্যে যারা তাদের প্রকৃত অনুসারী তাদের ক্ষেত্রেও অপবাদ আরোপ এবং প্রোপাগান্ডামূলক প্রচারণার মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। ইরাকে দাওলাতুল ইসলাম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কুফফার, মুরতাদরা এবং কিছু মুসলিমরাও দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ’র ব্যাপারে অহেতুক অভিযোগ তুলতে থাকে ও একে অপবাদ দিতে থাকে। পরবর্তীতে আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে অপবাদ ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। কুফফার জোট দাওলাতুল খিলাফাহ’র বিরুদ্ধে আদর্শিক যুদ্ধে উলামায়ে সূ’দের ব্যবহার করে থাকে। এই সকল উলামায়ে সূ’রা কুরআন-সুন্নাহ’র বক্তব্যকে আংশিক বা বিকৃতভাবে তাগুতদের

মিডিয়াসমূহে উপস্থাপন করে দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সংশয়-সন্দেহ ছড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়ে থাকে। আর তাদের এই কাজের মাধ্যমে তারা শারীয়াহ সম্মত বৈধ খিলাফাহ'কে মুসলিম সর্বসাধারণের নিকট সংশয়যুক্ত করতে চায়। আবু সুলাইমানও তাদের নোংরা পদাঙ্ক অনুসরণ করে খুবই চতুরতার সাথে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্তমান দাওলাতুল খিলাফাহ'কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে সে মিথ্যা ও ছলচতুরতার আশ্রয় নিতেও পিছপা হয়নি। আমরাও আবু সুলাইমানের প্রোপাগান্ডামূলক চিঠির ব্যাপারে লিখতে গিয়ে দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে আরোপিত অনেক অপবাদের জবাব দিয়েছি। সততার সাথে প্রকৃত অবস্থাকে চিত্রায়িত করেছি কলমের কালির মাধ্যমে। শারয়ী দালিলিক বিষয়াদিকে কুরআন-সুন্নাহ'র কষ্টিপাথরে পরখ করে উপস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। আমরা প্রমাণভিত্তিক আবু সুলাইমানের বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছি– আলহামদুলিল্লাহ। পরিশেষে বলতে চাই, এই দাওলাতুল খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যতই পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র এবং অপবাদ রটাও তা এর কোনই ক্ষতি করবে না–বি-ইযনিল্লাহ। والله خير الماكرين

দাওলাতুল ইসলাম কুফফার জাতিসমূহের ভিতে কম্পন সৃষ্টি করেছে। ত্রাসের সঞ্চার করেছে তাদের অন্তরসমূহে। এ কারণেই আরব-আযমের সকল তাগুতরাই এর ভয়ে ভীত। বর্তমানে চলমান যুদ্ধের ময়দানে পৌত্তলিক ও জাহিলিয়্যাতের মনিবদের হৈইচৈই এবং চেঁচামেচি সত্ত্বেও দাওলাতুল খিলাফাহ টিকে আছে, মিথ্যাবাদী এবং পথভ্রষ্টদের মুখোশ উন্মোচন করে চলছে। দাওলাতুল ইসলাম স্বীয় পন্থায় দৃঢ় বিশ্বাসী, সুদৃঢ় অভিপ্রায়ে এগিয়ে চলছে সম্মুখপানে। রবের সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চিত থেকে নিজ পথেই অবিচল রয়েছে। কুফরের সকল জাতিগোষ্ঠী মিলে একে দুর্বল করতে পারেনি। আল্লাহর প্রশংসায় দৃঢ় থেকেছে যেদিন প্রত্যেক নিন্দিত ব্যক্তি ও দুর্বল চিত্তের অধিকারী নিস্তেজ হয়ে গেছে। কথায় এবং কাজে তাওহীদের দাওয়াহ আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা'র ঘোষণা দিয়েছে যেদিন অজ্ঞতার গোলকধাঁধায় হতভাগাদের অধঃপতন হয়েছে। ফলে দাওলাতুল ইসলামই এককভাবে বর্তমান যুদ্ধের অগ্রদূত এবং পরিচালক। দাওলাতুল ইসলামের

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে এর ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং কুরবানির বিবরণ দিতে বিস্ময়াভিভূত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে এর মানহাজ এবং পথচলায় দৃঢ় রয়েছে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যতদিন অতিবাহিত হয়েছে খিলাফাহ’র সন্তানেরা সুউচ্চ লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলছে। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর বিরোধিতাকারীরা ও সাহায্য বর্জনকারীরা এর কোন ক্ষতি করতে পারেনি–বি-ইযনিল্লাহ। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এর নিকৃষ্ট শত্রুরা ভ্রুকুঁচকে এর প্রকৃত সম্প্রসারণ এবং টিকে থাকার স্বীকৃতি দিচ্ছে। দাওলাতুল খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সত্যবাদী মুওয়াহহিদ মুজাহিদগণের দলসমূহ তাদের বাইআতের উপর অবিচল রয়েছে, জামাআতকে আঁকড়ে ধরেছে এবং আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নার্থে ঐক্যবদ্ধ থেকেছে।

সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন হে আহলুস সুন্নাহ! আল্লাহর অনুগ্রহে আপনাদের সন্তান খিলাফাহ’র সৈনিকগণ লড়াই বন্ধ করেন নি, ক্লান্ত হননি, বশ্যতা স্বীকার করেন নি। আল্লাহর রাস্তায় চলার পথে তাদের নিকট যে বিপদাপদ পৌঁছে–এর কারণে তারা অক্ষম হয়ে যাননি এবং দুর্বলও হননি।

হে আসমান যমীনের রব! আপনি এই দাওলাতুল খিলাফাহ’কে নববী মানহাজের উপর অবিচল রাখুন! আপনি একে হক্কের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন! আপনি একে বরকতময় সুস্পষ্ট বিজয় দান করুন! হে আল্লাহ! সকল কুফফার জাতিগোষ্ঠীর অনিষ্টতা থেকে আপনি আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের দাওলাহ’কে রক্ষা করুন! হে আল্লাহ আপনি এই দাওলাতুত তাওহীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান! হে আল্লাহ সকল প্রশংসা আপনারই জন্য আর আমরা আপনারাই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমরা আল্লাহর কাছে বিনয়াবনত হয়ে বলি, হে আল্লাহ! যে ইসলাম ও মুসলিমদের কষ্ট দিতে চায় আপনি তাকে কঠিনভাবে পাকড়াও করুন! হে আল্লাহ! যে মুজাহিদদের ব্যাপারে মিথ্যা ছড়ায় আপনি তাকে প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে লাঞ্ছিত

করুন! হে আল্লাহ! যে খিলাফাহ'র ব্যাপারে অপবাদ রটায় আপনি তার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিন! হে রব! যে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপনি তার চক্রান্ত তার দিকেই ফিরিয়ে দিন এবং তার চক্রান্ত্রেই তাকে ধ্বংস করে দিন! আর আপনি এক্ষেত্রে সক্ষম–আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন!

সবশেষে আবু সুলাইমান ও তার মত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করে বলছি–

وإن عدتم عدنا، والقادم أدهى وأمرّ بإذن الله.

والحمد لله رب العالمين